"ভক্তি"

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

(১৫শ বর্ষ)

(১৩২৩ ভাদ্র হইতে ১৩২৪ শ্রাবণ পর্য্যন্ত।)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

সম্পাদক
শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি।

হাওড়া, পোঃ—আন্দুলমৌড়ী,
ঝোড়হাট "ভক্তি" নিকেতন
হইতে
ভক্তমণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ দেড় টাকা।
নমুনা ৵০ তিন আনা।

দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসুবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

পঞ্চদশ বর্ষের সূচীপত্র।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

ভক্তি।

(পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৩।)

(শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।)

—:০:—

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তিভক্ত্যাঃপরং পদম্॥

—:০:—

মঙ্গলাচরণম্।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥১॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্তরেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্॥২॥

অদ্বৈত প্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ো
নিত্যানন্দসখা সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃদ্‌কেতনঃ।
লক্ষ্মীপ্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ সপার্ষদঃ সদয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ॥৩॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥৪॥

প্রাণের কথা।

—:০:—

নামৈব তব গোবিন্দ কলৌত্বত্তঃ শতাধিকং
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাঙ্গ যোগতঃ।
বিচিন্ত্যানি বিচেয়ানি বিচার্য্যাণি পুনঃ পুনঃ
কৃপণস্য ধনানীব ত্বন্নামানি ভবন্তু মে॥

দয়াময় শ্রীগোবিন্দ! এই ঘোর কলিযুগে কলি-কলুষিত দুর্ব্বল জীবের জন্য তুমি নানাভাবে তোমার মহিমা প্রকাশ করিয়াছ। তোমা হইতেও যে, তোমার ভুবন-মঙ্গল নাম বড়, তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ তুমি দেখাইয়াছ। তোমার প্রতি যাহার শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, তোমার প্রতি যাহার ভালবাসা নাই, সেই সকল অপ্রেমিকজনগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তোমার নাম করিতে, পাপী, তাপী, আচণ্ডাল আদি করিয়া সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছ। তুমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছ যে, নাম-বলে সর্ব্বপ্রকার পাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, নামে হৃদয়ের দুর্ব্বাসনা কুটিল কপটতাদি দূর হইয়া যায় ও যাবতীয় অন্ধকার বিনাসপ্রাপ্ত হয়। আবার নাম বলেই তোমাকে লাভ করিয়া তোমার সচ্চিদানন্দঘন নবকৈশোর-নটবর মোহন মুরতি দর্শন করিয়া তোমার প্রেমধনে ধনী হইতে পারে। তুমি দয়া করিয়া এত শক্তি নামে দিয়াছ কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, তোমাতেতো ভালবাসা হইলই না, অধিকন্তু তোমার এমন নামেও বিশ্বাস জন্মিল না। দয়াময় গোবিন্দ! আমি এই ভাবেই কি থাকিব? দীনদয়াল! এই অধম দীনহীনকে যদি দয়া না কর তবে যে তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক হইবে? প্রভো! তোমার ভুবন-মঙ্গল অমীয়া-মধুর নামে রুচি দাও, আর তোমার নাম লইয়া যেসকল মহাত্মা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবার, তাঁহাদিগের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিবার উপযুক্ত শক্তি ও বিশ্বাস দাও। সময় সময় যদিও প্রাণে প্রাণে যেন বলিয়া দেয় যে, "জীব তোমার নিজ শক্তিতে কোন কার্য্যই হইবে না, সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছা" তথাপি যেন কি এক মোহে পড়িয়া সকল ভুলিয়া যাই, তোমার সে অমোঘ তত্ত্ববাণী শুনি না।

দীননাথ! আজ তোমারই মঙ্গল ইচ্ছায় তোমারই চির-সেবিকা "ভক্তি" পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, আমাকে প্রাণে প্রাণে শিখাইয়া দাও যে, তোমার সেবা পূজার, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা পরিপূরণের উপযোগী কি ভাব, এবং কি ভাবে কি ভাষাতেইবা তোমাকে ডাকিব, তুমি না শিখাইলে আমাকে আর কে শিখাইবে। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, আমিতো তাহা কিছুই জানিনা;—

কি ব'লে ডাকিব ডাকিতে জানিনা কি ব'লে ডাকিলে পাইবে শুনিতে।
(আমি) ডাকিবার মত ডাকিতাম যদি দেখা দিতে তুমি হাসিতে হাসিতে॥

ডাকিবার মত যে তোমারে ডাকে,
তারে তুমি দেখা দিয়ে থাক ডেকে,
(আমি) ডাকিতে জানিনা ব'লে কি হে নাথ, পাব না তোমার শ্রীপদ-হেরিতে॥

কি ব'লে ডাকিলে শুনিবারে পাও,
প্রাণে প্রাণে আমায় ডাকিতে শিখাও,
(আমি) তাই ব'লে ডাকি ওহে কমলাখি যা ব'লে আমারে শিখাবে ডাকিতে॥

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আশীষ।

—:০:—

উষার আলোক যবে ফুটে ধীরে ধীরে,
নীলাকাশ গিরি সিন্ধু তটিনীর নীরে,
দেখি যত সৌন্দর্য্য অপার
সেত প্রভু আশীষ তোমার!
সন্ধ্যার আঁধার টুকু যবে নেমে আসে,
শত দীপ জ্বলে উঠে সাঁঝের আকাশে
ছায়াপথে খেলে তারকার,
সেও প্রভু আশীষ তোমার!

এ জীবন ভরা আছে কত সুখ দুঃখ,
উঠিতে পড়িতে হায় ভেঙ্গে যায় বুক,
যত হেথা হাসি অশ্রুধার
সবি প্রভু আশীষ তোমার!

শ্রীমতী রাণী দেবী।

"জাতীয়তা কোথায়"?

(শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন লিখিত।)

—:০:—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নামরে।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে সেই সে আমার প্রাণরে॥"

ভাই বাঙ্গালি! যদি গৌর না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়? তোমার জাতীয়-গৌরব-মণি গৌরগুণমণি তোমার ঘরের ছেলে,—তোমার সমাজের ছেলে। যদি তুমি তোমার ঘরের ছেলের গুণ বিস্মৃত হইয়া, পরের ছেলের আদর কর, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়?

বাঙ্গালীর—বাঙ্গালী জাতির যদি কিছু গৌরব করিবার সামগ্রী থাকে, দীনা বঙ্গভাষার যদি একটুও প্রাণ থাকে, এবং যাঁহার উন্নতাদর্শ-চরিত্র হইতেই বঙ্গ ভাষায় "চরিত" লেখার সৃষ্টি ও ভাষার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাঁহাকে যদি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়?

বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপ নগরে যে একটী ছেলে অবতীর্ণ হইয়া হরিনামের-বন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়া ছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত যাঁহার বহু ভক্ত বিরাজ করিতেছেন, যদি তুমি তাঁহাকে না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়?

ভারতে এ পর্য্যন্ত যত অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর কোন অবতারই বঙ্গদেশে প্রকট হন নাই। কলির প্রথম সন্ধ্যায় গোলকবিহারী স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে পতিত-পাবনী হরিভক্তি-প্রদায়িনী সুরধুনী তীরে নবদ্বীপ নগরে

অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের—তথা ভারতের যে দুর্দ্দশা মোচন করিয়াছিলেন, তাহা বড় বেশী দিনের কথা নয়। তিনি যে আমাদের মত মায়ামুগ্ধ জীবের নিকট হইতে অপ্রকট হইয়াছেন তাহা এখনও চারিশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তোমার আমার সৌভাগ্যবান উর্দ্ধতন দশম কি দ্বাদশ পুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তবে কেন তুমি তাঁহাকে না ভজিয়া বৃথা কাল কাটাইতেছ? জাতীয়তা হারাইতেছ?

তিনি আমাদের দুর্গতি দর্শন করিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এতই দুর্ভাগা যে, তাঁহার জন্ম একবিন্দুও কাঁদিতে পারিনা। যিনি আমাদের ঘরে ঘরে যাইয়া আচণ্ডালে দয়া করিয়া হরিনাম বিলাইয়া জীবকে ধন্য করিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহার এই মধুময় চরিত্রে আকৃষ্ট না হই, তবে আমাদের জাতীয়তা, আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়?

এ পর্য্যন্ত ভারতে যত যত অবতার হইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মত এমন প্রেমাবতার আর কখনও দেখিয়াছ কি? অন্যযুগে অস্ত্রাদির সহযোগে রক্তপাত করিয়াও যে কার্য্য সাধিত হয় নাই, এ যুগে তিনি কেবল প্রেম-দ্বারা সেই কার্য্য সাধন করিয়াছেন। ঐ শুন বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন;—

"রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরাদি করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারেও না মারিল, প্রেম দিয়ে করিল উদ্ধার॥"

পৃথিবীতে কি এমন প্রেমের ঠাকুর আর কখনও হইয়াছে? যদি তুমি এমন প্রেমের ঠাকুর না ভজ, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়?

এবার তিনি "মার" খাইয়া কলি-কলুষক্লিষ্ট কামিনী-কাঞ্চন-রতত দুর্ব্বল জীবকে নিজ-কৃপা-বারি বর্ষণে উদ্ধার করিয়াছেন। কত শত গলিতকুষ্ঠ রোগীকে, কত শত মহাপাপী দস্যু তস্করকে এবং কত শত শত মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন দয়াল ঠাকুরকে ফেলিয়া, তুমি আর কাহাকে ভজিবে ভাই?

জগৎ সৌন্দর্য্যের পিয়াসী। সকলেই সৌন্দর্য্যের মোহে বিমুগ্ধ হয়। আমার প্রেমের ঠাকুরটী এবার গলিত কাঞ্চন-ধারা গায়ে মাখিয়া ভুবন-মোহন বিশ্ব-মাতান সৌন্দর্য্য লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এমন বিশ্বমাতান রূপ এবং সৌন্দর্য্যের একীকরণ ও সমীকরণ আর কোন্ অবতারে হইয়াছিল? যদি

এমন সোণার মানুষ হাতে পাইয়াও তুমি না ভজিলে, তবে তোমার মন্দ ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ?

ভাই বাঙ্গালি! এখনও কি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ? এখনও কি তোমার নিজের দোষ তুমি নিজে বুঝিতে পার নাই ? ঘরের ঠাকুর না পুজিয়াই তোমার এত দুরবস্থা হইয়াছে।

ভাই! যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন ? এতদিন ধরিয়া আপন ঘরের ঠাকুর না পুজিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আর কেন অপরাধের মাত্রা বাড়াইতেছ ? এক্ষণে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কৃত-কর্ম্মের জন্য কাঁদ, তাঁহার পদে আত্ম-সমর্পণ কর। নতুবা তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই; এই পাপেই তুমি রসাতলে যাইতে বসিয়াছ, আরও যাইবে।

অতএব ভাই বাঙ্গালি! সময় আছে, এখনও ঘরের ঠাকুর, বাঙ্গালীর আরাধ্য ঠাকুর, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ভজিতে শিখ, জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসা, একেবারে ভুলিয়া যাও, প্রাণভরিয়া ঐক্যমন্ত্রে প্রাণগৌর বলিয়া ডাক, কাঁদ! আবার ভারতে ধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিবে। আবার ভারতের সার্ব্বজনীন্ প্রেম-ধর্ম্মের মোহনমন্ত্রের সুমধুর ধ্বনিতে সুপ্ত ধর্ম্ম-জগৎ জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার ভাই! সপ্তকোটী-কণ্ঠ-নিনাদিত প্রাণগৌর শব্দে প্রমুগ্ধা ধরণী মাতিয়া উঠিবে। কেন আর গৌণ করিতেছ ? বিলম্ব করিও না। অবিলম্বে বিলম্বের শিরে শত ব্রজ ভাঙ্গিয়া পড়ুক। এস, ভাই! ঐক্যমন্ত্রে সখ্যকণ্ঠে, ঐক্যতানে গৌর নাম গাহিয়া ধন্য হই এবং জগতকে ধন্য করি। এস, আপনি মাতিয়া জগৎ মাতাই, আপনি কাঁদিয়া জগৎ কাঁদাই। এস, আমরা আকুল কণ্ঠে মিলিত স্বরে জগতের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ঘোষণা করি,—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই সে আমার প্রাণ॥"

যদি ইহা করিতে না পার, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? মনে রাখিও,—কেবল বক্তৃতার হুজুগে বা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় মসীবিন্দু ব্যয়ে জাতীয়তা রক্ষা হয় না। জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে, তোমার জাতীয় সম্পত্তি বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কর। তোমার ঘরের ছেলের গুণ গাহিতে শিখ, বাঙ্গালীর ঠাকুর, তোমার ঘরের ছেলেটী কি বস্তু তাহা জানিয়া

রাখ। তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাস; মন দিয়া ভজ। যদি তাহা করিতে না পার, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়? ভাই,—

"হয় নাই হবে না এমন অবতার।
সর্ব্ব অবতার-সার গোরা অবতার॥"

অতএব আর কেন ভাই ভুলিয়া আছ; গৌর ভজ, গৌর নামে মজ, জীবন ধন্য কর এবং আপনাপন জাতীয়তা রক্ষা কর। জয় গৌর।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

শ্রীরাধার প্রেমে মুগ্ধ বনমালী, বংশীধারী হরি,
পীতধড়া শিখিপুচ্ছ বনমালা বংশী পরিহরি,
তেয়াগিয়ে শ্যাম-রূপ তেয়াগিয়ে শ্যামের মরম,
ত্যজিয়ে বৈকুণ্ঠধাম দেখাইতে প্রেমের চরম
অবতীর্ণ হ'লে হরি গৌর দেহে নবদ্বীপ মাঝে
শিখাইতে জনগণে প্রেম-ভক্তি-নিষ্ঠা বিশ্বরাজে!
তাই আজ মঞ্জুকণ্ঠে উঠিয়াছে ঐ হরিবোল
তাই ঝরে দু'নয়ন; পুলকের পাগল-হিল্লোল
খেলে যায় সর্ব্বদেহে; দু'বাহু তুলিয়ে বুঝি তাই
প্রেমের মোহন-সুখে ঘন ঘন নাচিছ কানাই!
কত শান্তি কত তৃপ্তি কত না আনন্দ মিলে হেথা
যেথা হরি-সঙ্কীর্ত্তন, যেখানেতে হয় কৃষ্ণ-কথা!
সর্ব্বত্যাগে কত সুখ, কত সুধা হরিনামে ঝরে
শিখাইলে সর্ব্বজনে; ভক্তি মুক্তি দিলে আপামরে।
আর শিখাইলে নাথ, বৃথা যত পাণ্ডিত্য-বড়াই
বৃথা তর্ক, বৃথা জ্ঞান, ভক্তি শুধু জীবেরে তরায়।
এই বিশ্ব-পারাবারে "নাম" মাত্র দিলে কর্ণ-মাঝে,
হৃদে দিলে প্রেম-বীজ অন্তিমে মিলাতে শ্যামরাজে!

দীন—শ্রীমন্মথ মথন সরকার।

নিবেদন।

—:০:—

নানা কাজে' সারাদিন থাকি আনমনে,—
সংসার লইয়া থাকি ছাড়িয়া তোমায়।
ভাব'লে কি হে বঁধু? যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে
বাঁধা আছি প্রাণে প্রাণে তোমায় আমায়
যাবে গো ছিঁড়িয়া? নাকি যে মধু-মুরতি
আমার মলিন এই হৃদয়ের মাঝে—
আপনি দিয়াছ আঁকি, ওগো! প্রাণপতি!
লবে তা' সরা'য়ে? কথা স্মরি মরি লাজে।
তব দরশন ভীতা কুণ্ঠিতার দেহ'
খুলিয়া গুণ্ঠন কান্ত! ম্লান মুখ চুমি'
আপনি উছলি দেছ প্রেমসিন্ধু হৃদে।
কেঁদে মরি, ভাবি "কত ভালবাস তুমি"!
যত আমি চা'ব নাথ! তোমার এ বাঁধন খুলিতে
আরও বেঁধ' প্রেম-ডোরে; তবু তোমা' দিওনা ভুলিতে।

শ্রীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

পদকার কবি ঈশ্বরচন্দ্র।

(শ্রীযুক্ত কালীহর দাস-বসু, ভক্তিসাগর লিখিত।)

—:০:—

বাংলা ১২৪২ সনের ২৯শে ফাল্গুন আমাদের আলোচ্য এই পদকার ঈশ্বরচন্দ্র মকসুদপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত সাহাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়কৃষ্ণ, মাতার নাম কমলা। পিতামাতা উভয়েই ভগবন্নিষ্ঠ ছিলেন। জয়কৃষ্ণ চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া স্ত্রী বিদ্যমানে পরলোক

যাত্রা করেন। মকসুদপুর পদ্মানদীতে ভগ্ন হইলে, তাঁহার চারি পুত্র কামার গাঁ গ্রামে মাতুল মণ্ডলবাবুদের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুচরণ কলিকাতা সাহেবদের দালালি করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং জনসমাজে খ্যাতনামা হন। দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিদাস পারসিক বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া মুন্সী উপাধি লাভ করেন এবং বৈষয়িক কর্ম্মে একজন গণ্য মান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন।

ঢাকা বিক্রমপুরের মধ্যে কামার গাঁ একটী সুবৃহৎ ও মনোজ্ঞ গ্রাম। ভাগ্যকুল কুণ্ডুরাজবাড়ীর সন্নিকট বলিয়া আধুনিক সময়ে উহার শ্রী বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে কোন দিনই গায়ক বাদক গুণিজনের অভাব নাই। সঙ্গ গুণে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গীত শাস্ত্রে অনুরাগ জন্মে। সঙ্গীত এক হস্তে লোককে নরকে ফেলে, অন্য হস্তে স্বর্গে তোলে; সঙ্গীত কাহাকে বিষ নয়নে দগ্ধ করে, কাহকেবা অমৃত নয়নে স্নিগ্ধ করে; কাহাকেবা পদে ঠেলে, কাহাকেবা কোলে তোলে। ঈশ্বরচন্দ্র নিজ নির্ম্মল-স্বভাবগুণে অমৃত লাভ করিলেন। সৌন্দর্য্যের রসময় নন্দন কাননে পাঁচটী কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি। তন্মধ্যে তিনি তিনটীর সেবা করিয়াছেন। কাব্যশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র চিত্রবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যা—এই পঞ্চ কলাবিদ্যার প্রথমত্রয়ে তাঁহার অধিকার হইতে চলিল। কারণ সৌন্দর্য্যস্পৃহা ঈশ্বরচন্দ্রের বলবতী।

মহাত্মা ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামি মহোদয়ের নিকট উপদিষ্ট হইয়া তদনুকরণে ঈশ্বরচন্দ্র যৌবনের উৎসবময় প্রফুল্লতায় বাসন্তী, হোরিলীলা, নগরসঙ্কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীত নিচয় রচনা ও প্রচার করিয়া রচনার মাধুর্য্যে ও কবিত্বে জন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন এবং মুন্সী উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। সঙ্গীতের অনুরোধে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ব্যুৎপন্ন হইলেন। এখন তিনি কেবল গায়ক নহেন, কবিও। তাঁহার মেধাশক্তি ও প্রতিভা অতি প্রখর।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন ৪৩ বৎসর, তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুর্গতির হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইল। কলিকাতার ব্যবসায় উপার্জ্জন বিনষ্ট হইল, মাতা ও তিন ভ্রাতা তাঁহাকে একাকী সংসারে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। নিজের বাড়ীর ইষ্টকালয় খানাও কয়েক বৎসরান্তর নদীসাৎ হইল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অটল। তাঁহার চিত্ত সঙ্গীত ও কাব্যরসে ভরপুর।

কল্পবৃক্ষের মূল-মন্দাকিনী-জলে বিধৌত। কাব্যাদি কল্পতরুর সেবা করিতে যাইয়া পদকার ভক্তি-মন্দাকিনীর প্রবাহ পরশ পাইলেন। কালে ভক্তিদেবীর এতই দয়া হইল যে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজভক্তদানে মাধুর্য্য পীযূষ পিয়াইলেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের গ্রন্থনিচয়ে তাঁহার পরমশ্রদ্ধা জন্মিল। এই সকল রসিক মহাজনগণ সেবাতুষ্ট হইয়াই যেন তাঁহাকে প্রেরণা-প্রসাদ দান করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কৃতার্থ হইলেন। শ্রীভগবান প্রাকৃতার্থ হরণ করিয়া তাঁহাকে পরমার্থ দিলেন। যুগলপিরিতি রসতত্ত্বের নবপুণ্যোৎস-মাধুরী তাঁহার হৃদয়-কন্দরে কল কল স্বরে প্রবাহিত হইল।

বস্তুর সার রস, রসেরসার মাধুর্য্য। যাঁর চিত্ত কণ্টক নয়, কুসুম; মরু নয়, সরিৎ—তাঁহার ইহাতে অধিকার। পশ্চিমাঞ্চলের মনোহরসাহী কীর্ত্তন উদ্দীপক ও উন্মাদক সামগ্রী। উহা চাঁদের সুধা। বিক্রমপুরের পদকীর্ত্তন চাঁদের সুধা না হউক্, পদ্মের মধু। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেম-প্রবণ চিত্ত সে মধুর একতম কমল। ঈশ্বরচন্দ্রের "হরিলীলা শিখরিণী" পদাবলী গ্রন্থ, আস্বাদ্য বস্তু। উহার সহস্র খানি পুস্তক প্রেমদাস ও শচীনন্দন প্রমুখ কীর্ত্তনীয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত ও ক্রীত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র এখন পরম ভাগ্যবান্ ও সুখী। তাঁহার সদানন্দ-চিত্তে সদাই সুখ বিরাজ করিতেছে। সুখী কে, তাঁহার মীমাংসা নাই; কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিলে উহার সংজ্ঞা স্থির করা যায়। পরন্তু তাঁহার এই সুখ-শীতল-চিত্তের গুপ্তকোণেও সময় সময় একটু বাষ্পোদ্গম লক্ষিত হয়। উহা স্বামীতে কৃষ্ণ-সেবা-নিরতা সাধ্বীপত্নী নন্দরাণীর গুণস্মৃতির তাপজনিত। পদকার এই গ্রন্থ লিখিতে প্রত্যেক অধ্যায়ান্তে যে চিন্তাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উহার আভাস পাওয়া যায়। নন্দরাণী স্বামীর অনুরূপা অনুকূলা ভার্য্যা। সংসারে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর নাই।

তিনি প্যারীলাল, কিশোরীলাল, রামলাল, রসলাল, বিন্দুলাল, গিরীন্দ্রলাল ও বিনোদীলাল এই সাত পুত্র এবং শরদ ও সুশীলা এই দুই সধবা কন্যা এবং পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া স্বামী সমক্ষে ১৩০৭ সনের ফাল্গুন মাসে ৫৩ বৎসর বয়সে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

সুরসিক ভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র আমার প্রতি সখ্যভাব দেখাইয়া থাকেন। এ অধমের রচিত পদ দুই চারিটি লইয়া তিনি দইছাকা নবনীর ন্যায় ভাবও রসের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে বিশেষতঃ তাঁহার পদাবলীর পর্য্যালোচনায় তাহার প্রতিভায় এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে অসাধারণ প্রেম-ভক্তি সঞ্চারের পরিচয় পাইয়াছি।

অক্ষম সত্বেও মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রীতিপ্রণোদনে তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি অনিচ্ছা সত্বেও উহা তাঁহার নিজ গ্রন্থে গ্রথিত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। ভক্তজনের গুণগীতি মঙ্গলকর।

ভাগ্যকুলের রজোপাধিক জমিদার শ্রীলশ্রীনাথ রায় মহোদয়ের মত অধীত-শাস্ত্র গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী ভক্তাগ্রণী যখন কবিবর মুন্সী ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভায় ও পদ-রচনার চাতুর্য্যে মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজ অর্থ ব্যয়ে ও সহৃদয় উৎসাহে তাঁহার পদাবলী দ্বিতীয় ভাগ "হরিলীলা নব মালিকা" প্রকাশিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার গুণপণা—প্রকৃত মুন্সীয়ানা আমার মত লোকে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেনা। অধিক লেখা বাহুল্য, তাঁহার গ্রন্থই উত্তম পরিচায়ক।

"শারদীয়া আবাহন।"

—:•:—

"আনন্দময়ির আগমনে হাসিছে ধরণী।
শুভ্রবর্ণে সাজিছে গো জননী প্রকৃতি-রাণী॥
গাহিছে বিহগকুল,　　আনন্দে হ'য়ে আকুল
বহিছে মলয়বায়ু মৃদু মন্দ ভরে।
কাঁপায়ে লতিকা লতা,　　দোলায়ে গাছের পাতা
ভাসাইয়ে প্রেমিকেরে ভক্তি অশ্রুনীরে॥

আবার শরৎকাল সমাগত। মা দশভুজা এবার ঘোটকে আসিতেছেন। আনন্দময়ির শুভাগমন প্রত্যেক বৎসর এই শরতেই হইয়া থাকে। এই

সময় হাস্যময়ী আকাশ শুভ্রবেশে সজ্জিত। দিগ্‌বধূ নির্ম্মল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। সতত সঞ্চারমান্ মেঘ সমূহ অন্তরালে লুক্কাইত, প্রকৃতিরাণী আনন্দে মাতোয়ারা। বিস্তৃত প্রান্তর সমূহ শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ। শরৎকালের রজনীর তমোশূন্য শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী কান্তি নিরীক্ষণ করিলে হৃদয় স্বতই আনন্দরসে আপ্লুত হয়। এ সময় সাগরসঙ্গতা স্রোতস্বতীর জলকল্লোল অন্তর্হিত হয়, এ সময় দীন দুঃখী রোগী ভোগী সকলেই আনন্দময়ীর আগমনে পুলকিত। শরৎ ও বসন্ত বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শত্রু মিত্র সকলেই মিলন-রাখীতে বদ্ধ। বঙ্গদেশের লোক পরস্পর ভ্রাতৃস্নেহে বাহুতে বাহুতে যুক্ত। এ সময়ের আনন্দ আনয়ন করিতে হয় না, নিজেই আসে। হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে মা সিংহবাহিনীর আগমন হইয়া থাকে। মা তিনটী দিন থাকিবার পর দশমীতে আবার ছয় মাসের মতন চলিয়া যান্। এই তিনটী শুভদিনে বৃক্ষ বল্লরী হইতে সমস্ত চলাচল ব্রহ্মার সৃষ্ট পদার্থ সকলেই আনন্দে মগ্ন। যেদিকে অবলোকন করা যায়, সেইদিকেই আনন্দোচ্ছ্বাস, সেইদিকেই ভক্তির বাঁধন, পবিত্র মিলন সুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিধাতা মানবগণকে পবিত্র বাঁধনে বাঁধিবার জন্যই বোধ হয় এই ঋতুটীকে জগতে পাঠাইয়াছেন। পতিত পাবনী দুর্গা অজ্ঞান অন্ধ সন্তানগণকে জ্ঞানা-লোকে আনিবার জন্যই এবং দুর্দ্দান্ত অসুর দল বিনাশ করিবার জন্যই দশদিকে দশ বাহু বিস্তার করিয়া সিংহবাহিনী মূর্ত্তীতে রত্ন সিংহাসনে বিরাজিত। দেবাদিদেব মহেশ্বর মার মস্তকোপরি অর্দ্ধ নিমিলত নয়নের অধিষ্ঠিত। মার দুই পার্শ্বে দুই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ধন-ঐশ্বর্য্য-প্রদায়িনী লক্ষ্মী ও জ্ঞান-গর্ভ-উপদেশময়ী বাণী বীণাপানি বীণাকরে দণ্ডায়মানা। এতদুভয়ের দক্ষিণে ও বামে জগৎমাতার তনয়দ্বয় কার্ত্তিক ও গণেশ ময়ুর ও মুষিকে আরোহণ করিয়া জগবাসীর আনন্দ বিধান করিতেছেন।

অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র, লঙ্কারাজ রাবণ-নিধন-মানসে এই সময় মা দশভুজার পূজা করেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি অতি প্রসিদ্ধ বাক্য। মার তিন দিবস পূজা আরতি করিবার পর চতুর্থ দিবসে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ মার প্রতিমূর্ত্তিকে পুত সলিলা গঙ্গাবক্ষে বিসর্জ্জন করেন। এই দিবসকে বিজয়া দশমী কহে। জানিনা ইহা বাঙ্গালার হিন্দুগণের সুখের দিন্ কি দুঃখের

দিন। প্রকৃতই এই দিন সংসারবাসীর পক্ষে অতি মহৎ ও পবিত্র। কারণ এই দিন সকলেই পূর্ব্বকৃত বিবাদ বিসম্বাদ, মনোমালিন্য ভুলিয়া দেবীর নাম স্মরণ করিয়া মিলন রজ্জুতে আবদ্ধ হয়।

শারদীয়া পূজার কথা মনে হইলে, লোক কত আশায় বুক বাঁধে। জননী তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র বিদেশ হইতে আগমন করিবে এই আশায় কত পূর্ব্ব হইতেই দিন গণনা করিতে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রিয়-জনের আশায় বুক বাঁধিয়া মার আগমনের আর কত বিলম্ব তাহারই চিন্তায় ব্যস্ত। মা আনন্দময়ির শুভাগমনে ধরার যে কি অপূর্ব্ব বেশ হইবে, কত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলে আবার একত্রিত হইবে এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া মনে মনে কত কথাই কল্পনা করিতেছে। কিন্তু কি জানি অদৃষ্টের লিখন ও বিধাতার ইচ্ছায় কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা বলা যায়না। মার আগমন-বার্ত্তা মন মধ্যে এইরূপভাবে আলোচনা করিয়া এক দিবস আমি নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে অচেতন হইলাম। যখন এই সুষুপ্তির শান্তি অনুভব করিতেছি, এমন সময় স্বপ্ন আসিয়া আমায় কৈলাস রাজ্যে লইয়া চলিল। স্বপ্নাবেশে মার শ্বশুরালয়ের নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব শোভা হেরিয়া পুলকিত চিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি আর আমার দুই চক্ষু দিয়া যেন আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময় একটী ভয়ানক আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি অবসান প্রায়। সেই কাতর রোদন-ধ্বনি শ্রবণ মাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নৈশবাতাস নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে দুই একটী পক্ষী রাত্রি শেষ হইয়াছে ইহা সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে শায়িত জগৎবাসীকে জানাইয়া চেতনা সঞ্চার করাইবার জন্য কুজন করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম যেন এক ষোড়শী নারী বিকষিত পদ্মের উপর সুবর্ণ খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়া, অলক্তরাগ রঞ্জিত পদযুগল নূপুরে পরিশোভিত করিয়া, অধরে মৃদুমন্দ হাস্য লইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। চকিতে একবার মাত্র সেই অপূর্ব্ব তেজময়ী মূর্ত্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। চক্ষু ঝলসাইয়া গেল; পুনরায় আর যেন আমি চাহিতে পারিলাম না। কিন্তু হৃদয় মধ্যে আর একবার মাত্র সেই অপূর্ব্ব তেজঃপূর্ণ হাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য বাসনা জাগিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আমি সেই মূর্ত্তির প্রতি চক্ষু ফিরাইলাম। দেখিলাম যে সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমার মস্তকের দিকে দণ্ডায়মান হইয়া বিণানিন্দিত স্বরে কাতর কণ্ঠে আমাকে কহিতেছেন, বাবা! আজ বিজয়া দশমী, আমার স্বামীগৃহে যাইবার দিন। আমার সহচরী বিজয়া আসিয়াছেন। উঠ, আর নিদ্রা যাইওনা। আমি তোমাদের কাছ হইতে আপাততঃ বিদায় লইলাম বটে, আবার শীঘ্রই আসিব। দুঃখ করিওনা বা হতাশ হইওনা আমি তোমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম বটে, কিন্তু তোমাদের উপর আমার সতত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রহিল। আমার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই তোমরা জীবনের কর্ত্তব্যকার্য্যে সফল কাম হইবে। তোমার সম্মুখে বিস্তৃত, কর্ম্মক্ষেত্র অনেক কর্ম্ম তোমাকে করিতে হইবে, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়ে উৎসাহ লইয়া, মনে আনন্দ জাগরুক রাখিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রপানে প্রধাবিত হও। আমায় ছায়া হইলে বলিয়া দুঃখ বা ক্ষোভ কিছুই করিওনা আবার আমি আসিব। আবার আসিয়া তোমাদের কোমল অধরে হাসি দেখিব, আবার তোমাদের ক্রোড়ে করিয়া তোমাদের বদন চুম্বন করিব, আবার তোমাদের সুমধুর মা, মা, ধ্বনী শুনিয়া আনন্দ সাগরে মগ্ন হইব।

বর্ষার বারিধারার ন্যায় রক্তিমবর্ণ প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায়, জ্যোৎস্নালোকে চন্দ্র-কিরণেরন্যায়, অমাবস্যার নিশাকাশে নক্ষত্র রাজির ন্যায়, শারদীয় পূর্ণিমার স্বচ্ছ স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত তোমাদের মুখ কমল দেখিয়া, বিশ্বের গরিমা, সৃষ্টির নৈপুণ্য সমস্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব। এই বলিয়া সেই হাস্যময়ী মধুর-ভাষিণী অপরূপ দেবী মূর্ত্তি সহসা অপসারিত হইয়া আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। আমি সেই গৃহে আর তাঁহাকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পাইলাম না। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে গৃহের বাহির হইয়া ধাবিত হইলাম। কিন্তু হায়! আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিবার আশায় আমি বহুদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কই পাইলাম না। হায় প্রভাত! আমায় তুমি হতাশ অন্তঃকরণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাইয়া পুনরায় গৃহে ফিরাইলে। আর একবার মাত্র যদি সেই পবিত্র দেবী প্রতিমাকে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইতাম। কিন্তু হইল না; আমার

ভাগ্য আর বুঝি তাঁহার সহিত দেখা হইল না। সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কই কোথাওত সেই মাতৃরূপিণী আনন্দময়ীকে দেখিতে পাইলাম না? তখন আমি উন্মাদ প্রায়; বাহ্য জগতে কি ঘটিতেছে বা কি ঘটিবে সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল সেই আনন্দময়ী মার পদযুগল ও স্নেহ, দয়া, মমতা ও আশীর্ব্বাদ পূর্ণ দৃষ্টির কথা আমার মানসপটে ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত তখন বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত। উন্মাদ-প্রায় যখন আমি চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছি, এমত সময় সহসা আমার চেতনার সঞ্চার হইল। জ্ঞানের সঞ্চারে দেখিলাম সেই জগজ্জননী বিশ্ব-প্রতিপালিনী, দানব-দলনী মা যেন সৌম্য মূর্ত্তিতে পূর্ব্বেরন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন। আমার হৃদয় তখন শান্তিরসে আপ্লুত, মানসভৃঙ্গ তখন সেই ভক্তি-রস-পানে উন্মত্ত। তখন আমার অন্তরাত্মা পরমাত্মাতে মিলিত। আমি মাকে হৃদয়াসনে উপবেশন করাইয়া, ভক্তি মাল্যে প্রথমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। পরে অনেক কাতরে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, মাগো অভয়দায়িনি! এই বিজয়া দশমীতে কতলোকের ঘর আঁধার ক'রে তুই চলে যাবি; কতলোক তোর মলিন অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দেখে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হ'বে। কত সন্তান্ তোর কোলে যাবার জন্য ব্যকুল হ'য়ে মা মা রবে ক্রন্দন ক'রবে। কিন্তু মা অভয়দায়িনী তুমি কি তাদের দিকে ফিরে চাইবে? আর কি মা মধুর বাক্যে তাহাদের তুমি অভয় দিবে? মা যেন কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইয়া আমায় উত্তর দিল, হাঁবাবা! তোমাদের মঙ্গল হইবে; তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া সহসা বায়ুমধ্যে অদৃশ্যা হইল। আমি সমস্ত জগতই অন্ধকার দেখিলাম। এমন সময় শুনিলাম মাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। কত দীনহীন দরিদ্র সন্তান্ মার মলিন মুখখানি একবার দেখিয়া তাঁহাকে শেষ প্রণাম দিবার জন্য গমনাগমন করিতেছে। বাঙ্গালীর গৃহে বিসর্জ্জন বাজনা বাজিয়া উঠিল। এদিকে আমাদের অন্তঃকরণে বিষাদ কালিমা পড়িল। সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া অশ্রুভরাক্রান্ত নয়নে বিষাদ পূর্ণ আননে একস্থানে সমবেত হইল। কোথাও এরূপ জনতার সমাগম হইলে, মধুর ও কর্কশ অস্ফুট ও উচ্চৈঃচ্চারিত কথোপকথনে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে কিন্তু আজিকার লোকারণ্য প্রবল ঝটিকার প্রকালীন্ নিস্তব্ধ

প্রকৃতির ন্যায়, নির্বাত নিশ্চল অটবী অথবা অসংখ্য চিত্রিত মূর্ত্তির প্রদর্শনীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নীরব। ইহার কারণ কি? জগৎবাসীগণ আজ ইহার উত্তর দিতে অক্ষম। তাঁহাদের হৃদয় এখন শোকসাগরে অভিভূত; এখন তাহারা মাতৃহারা হইয়া উত্তাল শোক-তরঙ্গে মজ্জমান্; এখন তাহাদের হৃদয় কবাট নিরুদ্ধ; বাহ্য জ্ঞান শূন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস শূন্য প্রস্তর মূর্ত্তি সদৃশ। পাষাণকায় ধারণ করিয়া তাহারা দণ্ডায়মান আছে মাত্র; কিন্তু তাহাদের হৃদয় মরুভূমি নয়। মাহারা সন্তানগণ আজ তাহাদের অবলম্বন হারাইয়াছে। প্রবলবাত্যায় এখন তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। দুঃখ দারিদ্রের পীড়নে তাহারা তিল মাত্র বিচলিত হইবেনা, দামোদর কি শত শত বারিধি ও এখন উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। হায় মায়া! তোমায় ধন্য, তোমার জালে পতিত হইয়া কত শত যোগী ঋষিরা আজও পর্য্যন্ত এক একবার তাহাদের প্রিয় বস্তুর কথা মনে করে। তোমার ক্ষমতার নিকট সকলই পরাভূত। যে তোমায় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে সে পরমাত্মায় লয় হইয়াছে; তাহার অস্তিত্ব আর এই ধরাধামে কিছুই নাই। তাহারই জন্ম সফল সে এই বিশ্বের গরিমার পাত্র। ধন্য সেই আত্মাকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহার নাম আজও পর্য্যন্ত বিলুপ্ত না হইয়া সুবর্ণঅক্ষরে ক্ষোদিত আছে।

মাগো শিবানী! কেন মা তুই মায়াকে সৃষ্টি ক'রে এই নশ্বর জগতে পাঠিয়েছিল? কেন মা তুই মনুষ্যের প্রাণ কোমল ক'রে গঠেছিলি? যখন আমাদের চক্ষের অন্তরালে থাকবি ব'লে তোর মনে বাসনা ছিল, তখন কেন তুই তোর অকৃতি অধম সন্তানগণকে মায়াজালে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলি? মা সন্তানের উপর কি তোর চাতুরী করিবার ইচ্ছা? মা, সংসারে কত জীব আসিতেছে, যাইতেছে তাদের জন্যে আমাদের প্রাণ কাঁদে কেন? তোর কাছে চলে যাবে; দুদিন পরে আমাদেরও এ ভবের পুতুল খেলা সাঙ্গ ক'রে তোর কাছে যেতে হ'বে; তবে কেন দয়াময়ী এত বাধা বিঘ্ন এত ভীষণ পরীক্ষায় পীড়ণ। তবে কেন তুই মা আমাদের এই কঠোর দায়িত্ব দিয়ে এই নশ্বর ধরাধামে পাঠাস্? এ বিশ্বসংসার কেন মা মায়াময়? দয়াময়ি! তুইত অগ্র পশ্চাৎ সমস্তই জানিস্ তবে সময়ে সময়ে কেন গো জননী এমন মোহেতে জীব সমাচ্ছন্ন হয়। সন্তানেরও কি তোর কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে?

অতএব মা, যাহা আমার ভাগ্যে ঘটে ঘটুক। আমি ভাল জানিনা, মন্দ জানিনা, কেবল তোমায় জানতে চাই, আর তোমার মহিমাকে চিনতে চাই। এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া আমি তোমার রক্ত-কমল সদৃশ পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া তোমারই অপেক্ষায় রহিলাম। দেখি মা তুমি কতদিনে এই অধম সন্তানকে কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া অভয় দায়িনী বাণী শুনাও। জয় মা দুর্গা, জয় মা জ্ঞানদায়িনী তমোনাশিনী দশভুজা। আমি তোর ওই জগদ্ধাত্রীরূপ ল'য়ে, ভক্তি-অশ্রুতে তোর ওই নুপুর-শোভিত পদযুগল চিন্তা করি এবং যেন আমার হৃদি সদা আনন্দতানে মগ্ন থাকে।

সেবক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব-বর্ষ আবাহনে।

(বৃদ্ধ শ্রীজগঝম্পা শর্ম্মার স্বগত বচন।)

হরি বোল হরি!!—আবার পথ ভুলিলাম না' কি? মহা বিপদ হ'য়েছে, রাস্তা গুলো সব বে-গোছ যে রকম হ'য়ে গেছে। যেখানে সরল সিধা রাস্তা ছিল সে'টা এখন প্রকাণ্ড কাঁটা বেড়ায় ঘেরা। যেখানে চিরদিনই এ'দো ডোবা এবং জঙ্গল ছিল সেখানটায় আপাত সুন্দর রাস্তা ক'রেছে। ভুলত' হবেই!!

বৃদ্ধ আমি; আমার পুরান অভ্যাস যায় না কাজেই সমস্ত ভুল রাস্তা গুলো আমার কাছে অপথ। চলতে গেলেই মনে হয় ঐ বুঝি ভুলিলাম" গিয়েছিলাম "বৈষ্ণব-সমাজে" কিছু "আচার" ল'য়ে। কারণ অরুচি সারাতে "আচার" বড়ই মজবুৎ। সেখানে "মধু"-মিষ্ট বাক্যে, পুরান ধারার, প্রাণান্ত চেষ্টায় কিছু কিছু ব্যবহার আছে দেখে বুড়ো প্রাণ্‌টা বড়ই খুসী হ'য়েছিল।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে মা গঙ্গার ধার ধরে' আসছি। কিন্তু পদে পদেই পথ হারা হ'য়ে পড়তে হচ্ছে। দু'চার জন প্রাচীন বা পুরাতন বংশের—সু-ভদ্রের ইঙ্গিতে এই অবধি এসেছি। এ'টা কোন্ স্থান তা'ও বুঝতে পাচ্ছিনা। কোথা এসেছি; কি কচ্ছি, ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা! সে কি আজকের কথা? মনে পড়ে, সেই নদীয়া, যেখানে বাঙ্গালায় সমস্ত গুণী-

গণের জমায়েৎ হ'য়েছিল, যেখানে রঘুরামের বেট্টা কৃষ্ণচন্দ্র ছিল, (যেখানে কৃষ্ণনগর) যেখানকার নামের স্রোতে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভূত আন্দোলন হইয়াছিল, সেইখানেই শর্ম্মার এই ভাবা জীবনের অনেক সুখ স্মৃতি প'ড়ে আছে। আর শুধু শর্ম্মারই বা বলি কেন, বাঙ্গালার এখনও যা'কিছু গৌরবের যা'কিছু শ্লাঘার আছে তাহা সেইখান কারই "কিছু কিছুর" ভগ্নাবশেষ।

"য, রি, র, লা" কথা অতি সত্য ; কাল প্রবাহে কোথায় কি লীন হ'য়েছে কে বল্‌বে !! কিন্তু আমার নজরে, যেন মনে হচ্ছে সে সব কাল্‌কের কথা।

সেই জব্‌সাহেব হঁ্যা হঁ্যা ঐ খানেই না তিনি "বামুনী বিবি"কে ল'য়ে প্রথমে তাঁবু পাতেন ? এইটাই বুঝি সুতোনুটী ছিল ? ঠিক হ'য়েছে গো এইবার পথ পেয়েছি আমাকে যে শ্রীধাম পুরী যেতে হবে। যাই মা' গঙ্গা ধ'রে।

ভাল কথা—কাল সন্ধ্যার পর আসিবার পথে, একস্থানে বড়ই এক সুন্দর দৃশ্য এবং আনন্দের মেলা দেখে এসেছি। আহা সে কি সুন্দর !!—পথ দিয়ে আস্‌ছি আর ভাব্‌ছি, এ সব হোল' কি ? এখন দেখছি—

—শিশ্নোদর পরায়ণাঃ
অব্রতা বটবোঽশৌচাঃ ভিক্ষাবশ কুটুম্বিনঃ
তপস্বিনো গ্রামবাসী ন্যাসিনোঽত্যর্থ লোলুপাঃ।

কিন্তু তা' হ'লে "পরিত্রাণায়" কথাটারই বা কি হবে, আর—"প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপনার মুখে। মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাবো প্রেম সুখে ॥" এরই বা কি হবে ? এইরূপ সব নানান্ তর কথা ভাব্‌ছি, আর গুটি গুটি যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে ঐ ওপারের এক স্থানে। সেখানে বেশ শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রম ভাব এখনো কিছু কিছু আছে। এখানকার মত এত ঘোড়া হীন টিকি তোলা গড় গড়ে গাড়ি বা নল-রাজার খাস আস্তাবলের ভোঁক্ ভোঁক্ শব্দের যোজন ছোটা শকটের বিশ্রী ভাড়া নাই। বেশ শান্ত ধীর পল্লিটী।

যাচ্ছি হঠাৎ দেখি একটা 'গুঁড়ী' পথের মধ্যে লোকে লোকারণ্য হ'য়েছে। কি ব্যাপার রে বাপু ? সুন্দর, দিব্য পুরাণ পুরাণ স্মৃতি মাখা ধূপ ধুনার গন্ধ ; মাঙ্গলিক শঙ্খ নিনাদ ; বড় আনন্দ হ'ল। একটু এগিয়ে, জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম জন্মতিথি পূজা। কা'র গো ?

আস্তে ভিড় ঠেলে সেই দিকে গেলাম। দেখি সুন্দর একটী আশ্রম। শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, আর আছে তথায় এক মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি। আর দেখিলাম বহু বহু ভক্ত এবং সাধু জ্ঞানীর মণ্ডলী। বহুকালের পর পুরান দৃশ্যের আভাষ দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হ'ল। কথা ঠিক—

"সাধুনাং দর্শনং পুন্যং তীর্থ ভুতাহি সাধবঃ
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্য সাধু সমাগম।"

পার্শ্বস্থিত জনৈক সু-চেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম; এস্থানটী বর্ত্তমান সময়ে "হাওড়া কোঁড়ারবাগান" নামক পল্লী এবং ভবনটী "ভাগবতাশ্রম" নামে এস্থলে প্রসিদ্ধ।

একে পথ-শ্রান্ত-ক্লান্ত, তা'তে বৃদ্ধ প্রায় জরাগ্রস্থ; বিশ্রাম স্থান পাইলেই নিদ্রাবেশ হয়, হইলও তা'ই। বসে বসে ঢুলিতে আরম্ভ করিলাম। হঠাৎ মৃদঙ্গ করতাল ঘণ্টাদির শব্দে. চট্‌কা ভাঙ্গিল। দেখি শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এ'কি মঙ্গল আরতি? এ'কি পুন্য উষা?—কতক্ষণ নিদ্রা ঘোরে ছিলাম জানিনা; কিন্তু এখনও সন্দেহ যায় নাই, সেই যে আরাত্রিক সে', কি জ্ঞান-সন্ধ্যার না প্রেম-উষার? কে জানে বাপু!! কিন্তু দৃশ্য যা দেখে ছিলাম তাহা অতি পবিত্র! শান্ত!! প্রাণারাম!!!

সমবেত সকলেই প্রেম-ভক্তি পুলকিত নয়নে আরাত্রিক অন্তে যেন কি প্রতীক্ষা করিতেছে। মনে হইল সকলেই যেন কাহার দর্শন আশা করিতেছে! এমন সময় এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, কিশোরী সেই প্রাঙ্গণে আগমন করিলেন। সঙ্গে গৃহস্বামী। দেবী মূর্ত্তির উপমা বা বর্ণনা ঠিক করিয়া বলিতে হইলে পুরানো কথায় বল্‌তে হয়।

"অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়ানি
মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।
সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈব জীবা-
ন্নানন্দসিন্ধু বিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী"।

দেবী উজ্জ্বলরসালঙ্কারালঙ্কৃতা, শান্তা, শুভ্রা, স্নিগ্ধ জ্যোতি বিশিষ্টা।

অনুসন্ধানে বুঝিলাম, ঐ যে সেই দেবী তিনি স্বধাম-গত "দীনবন্ধুর" পালিতা কন্যা। নাম "ভক্তি"। বর্ত্তমান গৃহস্বামীর যত্নে, তাঁহার আন্তরিক

সুচেষ্টাতেই ইনি এইরূপ শ্রীযুক্তা, পুষ্টা হইয়াছেন। আরও শুনিলাম ঐ সুমেধাবানেরই প্রতিপালনে, "ভক্তি" চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পন করিয়াছেন এবং সেইজন্যই "ভক্তি" সেবা পরায়ণ সমস্ত সুভদ্রের জমায়েতে জন্ম তিথির পূজা উৎসব। বড় সুন্দর! বড় আনন্দ!! বড়ই চমৎকার!!!

বুঝিলাম কথা ঠিক—

"ভক্তি"রেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি

ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।

কিন্তু অনেকেই একথা শুনেন্ না। কালের গতিকে ভদ্র "গৃহস্থ" ও কিছু কিছু বাঁকা, 'হিন্দুসখা' 'বঙ্গমহিলা' যাঁহারা চিরদিনই প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন তাঁরাই সকলে বিকল্প যোগে ভক্তির প্রচার সাহায্যে 'হ য ব র ল'। ছিঃ ছিঃ এ গুলো কি উচিৎ, আমি "বাহাত্তুরে বুড়ো" আমার কথা কেইবা শুনে আর কা'কেই বা বলি? 'হক্' বল্‌তে গেলেই গাল্ খেতে হয়!

আহা সে এক দিন ছিল যখন প্রতিবাসী 'পল্লিবাসী' সম জুটীদের কোনও কিছু একটা উৎসব অনুষ্ঠানে পরস্পোরের মধ্যে ঠিক্ আপনার মত জ্ঞান ছিল। সকলেই পরস্পরের শুভ অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে, কার্য্যে যোগদান করিত আনন্দ করিত। আর এখন সবই "ডিগ্‌বাজী" খেয়ে উল্টা। আর এ দিকেও ঠিক্ আছে, জটেঋষির কথা কি ভুল হয়? তাই এখন "ধর্ম্ম সঙ্কুচিতস্তপো বিরহিতঃ সত্যঞ্চ দূরংগতঃ"

কাল! কাল!!—তাহা না হ'লে যা'তে "বিজ্ঞান-ঘনানন্দ-ঘনা সচ্চিদানন্দৈক-রসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি" সে "ভক্তি"র জন্ম তিথি পূজাতে কি হিন্দুপ্রাণ হিন্দুসখা, গৃহস্থ, বঙ্গমহিলা প্রভৃতিরা আপনি এসে যোগ না দিতেন? যাঁরা দূরে থাক্‌তে চান্ থাকুন, কিন্তু আমার মনে হয় যদি—

শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদনের কাণ্ডটা জানবার ইচ্ছা হয়, তা' হলে ঐ যে "ভক্তি" যা'কে ঝগড়াটে ঋষির পাঁচ রাত্রিতে বলে "হৃষীকেন, হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুত্তমা" তাহার আশ্রয় লইতেই হইবে, আর তা' করতে হ'লে তাহার সহজ উপায় এ "ভক্তি"র সাহচর্য্য করা। কিন্তু আমার "ভীমরতী"র বক্‌বক্ কে শুনে!!!

তবে আমি, আমার "অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং ঠাকুরটীর কাছে বলিতেছি এ "ভক্তি" যেন দিন দিন সর্ব্বসাধারণে সর্ব্বত্র আদর পায়। যেমন ভাবে ধীরে ধীরে শিশু অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উজ্জলরস অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হ'য়ে পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী রূপে উপস্থিত হইয়াছেন—হে প্রভু! যেন তেমনি ভাবে ক্রমশঃ সকল ঐশ্বর্য্যে, শ্রীতে, ভূষিতা হইয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি ধাম
সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে মোর নাম"—তোমারই এ বাক্যের আংশিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে এ "ভক্তি" সমর্থা হন। তাহ'লেই "ভক্তি" ধন্যা।

হরিবোল হরি। আবার বুঝি পথ হারাইয়া যাইগো!! ঐ যে সুরধুনী দেখা যাচ্ছে ওঁর তীর ধরেই যাই। ইতি—

শ্রীখুন্তীর-আত্মকথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তা' হোক; প্রভু্ত তন্ময়! কিন্তু মেশো চন্দ্রশেখর বৃদ্ধের, এবং সঙ্গীগণের ভয়ের আর শেষ নাই! তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিতেছেন, কোনও রূপে একবার শ্রীনিমাই চাঁদকে শান্ত করিয়া, কোনরূপে একবার ঠাণ্ডা করিয়া, গৃহে ফিরাইতে পার্‌লে হয়!!

অন্তর্য্যামী, বুঝ্‌লেন। একদিন, পৌষ মাসের শেষা শেষি, যে সময়ে ন'দের ঘরে ঘরে "পোষ পিটে"র আপাদ্ মস্তক ধুম, ঠিক সেই সময়ের এক সন্ধ্যাকালে সকলে প্রভু লইয়া "ভালোয় ভালোয়" এসে পৌঁছিলেন্। সঙ্গে দু'চার জন ভুক্তের আশা হইল, "হ্যাঁ এবার ঘরে ঘরে দু'চারটী সদ্য-তপ্ত পিষ্টকের আস্বাদন করা যাইতে পারিবে।

পথে ফির্‌ৎ পাল্লার সময় ঠিক কি কি ঘটনা হয় তা'র মর্ম্ম ঐ একরূপই অর্থাৎ ঐ ভাব-ব্যাকুল ক্রন্দন, এবং "কিন্তু" মাখা কথা।

থা'ক। এখন কথা হচ্ছে সকলে, দেখ্‌লে বুঝলে, প্রভু এবার গয়াধাম থেকে এ'সে আর এক রকম্ হ'য়েছেন। যাঁরা বুঝ্‌বার লোক, যাঁরা বহু দিন থেকে প্রভুর কার্য্য গুলি প্রাণের আগ্রহে ঈক্ষণ করছিলেন; তাঁরা বুঝ্‌লেন "সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতারের" পালার "পঁয়তারা সুরু হ'ল।

পাণ্ডিত্য গর্ব্ব, স্বভাব চাঞ্চল্যের স্থলে, স্বর্গীয়, জ্যোতি সহ বিনয় ব্যাকুল-ভাব, শ্রীনিমাই চাঁদকে আশ্রয় করিয়াছে। আজ কাল যখন মুখখানি, কি জানি কেন ম্লান, করিয়া, যেন কত কি মর্ম্মের ধন খুঁজিতে খুঁজিতে মাথা হেঁট্ করিয়া নদীয়ার পথে প্রভু ধীরে ধীরে গমন করেন; তখনকার ভাব দেখে সমস্ত নদীয়ার লোক ভাবে "একি হ'ল ?''

যাঁরা বুঝে তাঁরা দেখে যেন প্রভু আভাষে বল্‌ছেন—

"বিজ্ঞান ঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি।"

তাঁরা দেখে প্রভু যেন নিজের আচরণে বুঝাইতেছেন—

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনা বৃতম্।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"।

"কিন্তু" মাথা ভাবে প্রভু যেন সকলের কাছে কত কি অপরাধী; আজ কাল প্রভু আত্মীয় স্বজনের নিকট যে কোন্ মহা দোষে দোষী, ধীরে ধীরে কথা, ধীরে ধীরে চলা, ধীরে ধীরে বসা জননীর চরণ বন্দন, শ্রীমতীর সহিত দু'চারটী মিষ্টালাপ, দিনান্তে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট একবার গমন এবং বাকি সময়টা' চুপ্ চাপ্ থাকা, এই হ'চ্ছে এখন দৈনিক কার্য্য প্রণালি। ইতিমধ্যে আর এক "চক্কড়্বা" হয়েছে! শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারি-গুপ্তের কাছে প্রভু যখন গয়ার বৃত্তান্ত বলেন তখন সে এক কাণ্ড!! যে বলছে; যাঁরা শুন্‌ছে সকলেরই হৈ হৈ কান্না। প্রভু যতই থেকে থেকে "হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলে অঝোরে ব্যাকুল ভাবে কাঁদেন ঐ শ্রোতারাও ততই আনন্দে "হরি হরি" বলে কাঁদেন। আরে বাপ্‌রে সে কি ব্যাপার!!! পাড়ায় রৈ রৈ কাণ্ড প'ড়ে গেল!!!

বুড়ো মেশো মশায় বল্‌লেন ঐ গো আবার বুঝি গয়ার সেই ভূতটা শ্রীনিমাইকে আশ্রয় কর্‌লে'' !!

এ'টা জমে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে। শুক্লাম্বর কে ছিল? উদাসীন। বৈষ্ণব উদাসীন, নানা তীর্থ ঘুরে, ঐ আমার সুবর্ণ বর্ণের ঠাকুরটীর চরণের ধুলির চেষ্টায় নবদ্বীপে এসে গ্যাট্ হয়ে বসে আছেন।

দয়াময়, চিরদিনই দয়াময়। ওঁরই কুটীরে, গঙ্গাতীরে প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারা হ'য়ে মাতোয়ারা হ'ন।

সমস্ত দিন গত হ'য়েছে কাহারও কিছু জ্ঞান নাই। সকলেই প্রেমতরঙ্গে ডুবিয়াছেন। সকলেই মগ্ন। প্রভু ক্রমাগত "হা নাথ কোথা যাও।" বলে ব্যাকুল ভাবে ডাকছেন। ভক্তি রসোদ্দীপক নানা শ্লোক, গাথা আবৃত্তি করিতেছেন, গড়াগড়ি দিতেছেন কাঁদিতেছেন এবং কাঁদাইতেছেন। এমন সময় শ্রীগদাধর পণ্ডিত ঘরের ভিতর হইতে, হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে করুণ হইতেও করুণ স্বরে কাঁদিয়া প্রভুকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। প্রভুর বাহ্য জ্ঞান আগমন করিল।

শ্রীগদাধরকে আসিতে না বলিলেও তিনি ব্রহ্মচারীর গৃহে লুকাইয়া সমস্তই দর্শন এবং শ্রবণ করিতেছিলেন। এবং বুঝি বা আত্ম নিবেদনও করিতেছিলেন।

এখন সকলেই চলিল। গৃহের দিকেসকলেই ফিরিল, কিন্তু সে সিধে ভাবে নহে। ভাবে নাচিয়া, ঢুলিয়া এবং তখনও কাঁদিয়া। এইরূপে চলনের এইবার প্রকাশ্য প্রকাশ হইল।

শচী মা সর্ব্বদাই প্রভুর জন্য ভয়ে ভীতা, তা'র উপর মেশো ম'শায় ত' আছেনই। যা' হোক ঐ ভাবে কোনও রূপে রাত কাটিল। প্রভাতে শ্রীনিমাই চাঁদ, জননীকে, পত্নীকে নানা ভাবে প্রবোধ দিয়া স্নান করিয়া টোলে পড়াইতে চলিলেন।

হরি। হরি!!—কে কা'কে পড়ায়!!! যে যা প্রশ্ন করে তাহার উত্তরে বা যে কোনও ব্যাখ্যাতেই প্রভু হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করেন। ক্রমে জ্ঞান হারা, শেষে নৃত্য। দু'চারজন নিন্দুক আসিয়া দেখিল এবং হাঁসিয়া প্রকাশ করিল "নিমাই পণ্ডিত বোধ হয় গয়া থেকে সদলে ভাং পান্ অভ্যাস ক'রেছে আরে রাম একি উন্মাদের নৃত্য!!!"

এদিকে ছাত্রদের ভিতর কতক "রাম রাম" শব্দে ভৌতিক ভয়ে ভীত হ'য়ে পুঁথী ফেলে ছুট দিল। আর যাঁরা কৃপালাভের পাত্র তাঁরা অতঃপর সর্ব্বদাই প্রভুর সেবাকারী দাস হইল।

পণ্ডিত নিমাইয়ের টোল ভাঙ্গিল। ভক্ত নিমাইয়ের হাটের পত্তন হইল। প্রেম-ভক্তির বন্যার ডাক্ ছুটিল। যে সকল ছাত্র, যে সকল শাস্ত্র ব্যবসায়ী ন্যায়, দর্শন, তর্ক, মীমাংসায় দিনরাত চেঁচামিচি করিত তাহারাই আজ প্রভুর সহিত মিশিয়া প্রভুর কৃপা-কণায় তাঁহার সহিত একটী সংকীর্ত্তনের দল সৃষ্টি করিল।

সমাজে, ধর্ম্মে, ইতিহাসে নূতন জীবন, নূতন পৃষ্ঠার আরম্ভ হইল।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীমুখের এই ভবিষ্যবাণীর সাফল্যের দিন আসিয়া উপস্থিত হ'ল। যে কীর্ত্তনের মধুর অথচ সাগর তরঙ্গের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ-স্রোতে, বঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। যে কীর্ত্তনের, এক এক লহরীতে শুষ্ক জ্ঞান বৃথা তর্ক দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল; এবং গিয়াছে, যাহার সামান্য জল কণা স্পর্শে কত কত শুষ্ক পাষাণ হৃদয় গলিয়া গিয়াছে যাইতেছে এইবার তাহার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। জগতের মহা অন্ধকার যেন নব-রবি-কিরণে ধীরে ধীরে লীন হইতে চলিল।

প্রভু বলিলেন—

"পড়িলাম্ শুনিলাম্ এতকাল ধরি
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥"
শিষ্যগণ বোলেন "কেমন সে কীর্ত্তন?"
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥"

প্রভু প্রথমে এই নাম শিখান; এবং নিজে গান করেন? কি বল্‌ছ? কোন্ সুরে? বুড়োরা বলেন প্রভু না'কি কেদার রাগে এই নাম গান করেন?

ক্রমশঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ধর্ম্ম-বুদ্ধ্যা বিবেকোঽহস্মৎ। দুর্য্যোধনাদিষু ভ্রাতৃষু মচ্ছস্ত্রপ্রহারেণ মরিষ্যৎসু কৃপেয়মিতি চেত্তত্রাহ ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেককৃপে। কিন্তু ক্ষুদ্রং লঘিষ্ঠং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যমেব। তস্মাত্তত্ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ সজ্জীভব। হে পরন্তপ শত্রুতাপনেতি শত্রুতাপনপাত্রতাং মা গাঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অর্জ্জুন! ক্ষত্রবন্ধুর ন্যায় কাতরতা কখন তোমার শোভা পায় না। যদি বল "আমার বল বীর্য্যের অভাব বশতঃ এরূপ কাতরতা নহে, কিন্তু পূজার্হ ভীষ্মাদি গুরুজনের প্রতি ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত বিবেক বশতঃ এবং দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃ-বর্গ আমার অস্ত্রপ্রহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে বলিয়া উঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রযুক্ত ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধের ভয়ে এরূপ হই নাই।" শ্রীভগবান্ যেন অর্জ্জুনের এবম্প্রকার ভাব অবগত হইয়াই বলিলেন— "সখে! ইহা তোমার বিবেক বা কৃপা নহে, ইহা কেবল হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মাত্র, ইহা তোমার শোভা পায় না। অবিবেকী সাধারণ ব্যক্তি যেমন নশ্বর স্থূল দেহে মমতা বশতঃ শোক ও মোহে অভিভূত হইয়া থাকে, ইহাও সেই শোক জন্য মোহ, দেখ বিবেকী জ্ঞানী পুরুষ কখন নশ্বর স্থূল দেহের প্রতি মমতা করেন না, তাঁহারা কিসে আত্মার মঙ্গল সাধিত হইবে তদুদ্দেশ্যে নিয়তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন! অতএব হে শূরশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার হৃদয়ের শোক-মোহজনিত দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। হে শত্রু-তাপন! এই ভীষণ যুদ্ধস্থানে তুমি শত্রুগণের নিকট ঈদৃশ ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের নিকট আর হাস্যাস্পদ হইও না ॥ ২-৩ ॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ননু ভীষ্মাদিষু প্রতিযোদ্ধৃষু সৎসু ত্বয়া কথং ন যোদ্ধব্যং। আহূতোন নিবর্ত্তেতেতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়স্যেতি চেত্তত্রাহ কথমিতি। ভীষ্মং পিতামহং দ্রোণঞ্চ বিদ্যাগুরুং ইষুভিঃ কথং যোৎস্যে। যদিমৌ পূজার্হৌ পুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্যৌ পরিহাসবাগ্‌ভিরপি যাভ্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং তাভ্যাং সহেষুভিস্তং কথং যুধ্যেত। প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রম ইতি স্মৃতেশ্চ। মধুসূদন নারিসূদনেতি সম্বোধন পুনরুক্তিঃ শোকাকুলস্য পূর্ব্বোত্তরানুসন্ধিবিরহাৎ। ত্বদ্ভাবশ্চ ত্বমপি শত্রুনেব যুদ্ধে নিহংসি নতুগ্রসেনসান্দীপন্যাদীন্ পূজ্যানিতি॥ ৪॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

শ্রীভগবানের এতাদৃশ বাক্যশ্রবনে অর্জ্জুন বলিলেন হে মধুসূদন! যদি আপনি বলেন, ভীষ্মাদি যখন প্রতিপক্ষরূপে যুদ্ধ প্রার্থনায় তোমায় আহ্বান করিতেছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত যুদ্ধে বিরত হইতেছ, যেহেতু ক্ষত্রিয় কখনই যুদ্ধে আহূত হইয়া নিবৃত্ত হইবে না। ইহা আমি জানি, কিন্তু আপনি বলুন, আমি এই পূজার্হ পিতামহ ভীষ্মের ও অস্ত্রবিদ্যোপদেষ্টা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের অঙ্গে কিরূপে অস্ত্রাঘাত করিব? যেহেতু ইহাঁরা পূজার্হ পরিহাস বাক্যেও যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধবিগর্হিত কর্ম্ম, পুষ্পাদিদ্বারা যাঁহাদিগের বন্দনা করা কর্ত্তব্য, আজ পুষ্পাদি উপচারের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের অঙ্গে কি প্রকারে অস্ত্র প্রয়োগ করিব।

স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত আছে "পূজ্য ব্যক্তির পূজা ব্যতিক্রম করিলে, শ্রেয়ঃ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে"। অতএব হে অরিনিসূদন! আমি ইহাঁদিগের সহিত কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এখানে অর্জ্জুন যে অতিশয় শোকাকুল হইয়া ছিলেন, তাহা এই দুইটী সম্বোধন বাক্য হইতে বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে। এবং অরিনিসূদন এই সম্বোধনে যেন ভগবান্‌কে বলিয়া দিতেছেন, কৈ প্রভু! আমাকে আজ গুরু ও স্বজন হত্যা রূপ যে মহা-পাতকে নিয়োজিত করিতেছেন, আপনি স্বয়ং কখন তো এইরূপ উগ্রসেন বা সান্দীপনী প্রভৃতি গুরু জনের বধ কার্য্যে লিপ্ত হয়েন নাই; অরিগণকেই বধ করিয়া আসিয়াছেন। আজ আমার প্রতি এ বিপরীত বিধান কেন?॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌॥ ৫

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্‌।

নন্বু স্বরাজ্যে স্পৃহা চেত্তব নাস্তি, তর্হি দেহযাত্রা বা কথং সেৎস্যতীতি চেৎ তত্রাহ গুরূনিতি। গুরুবধমকৃত্বা স্থিতস্য মে ভৈক্ষ্যান্নং ক্ষত্রিয়াণাং নিন্দ্যমপি-ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং। ঐহিকদুর্যশোহেতুত্বেহপি পরলোকাবিঘাতিত্বাৎ। নম্বেতে ভীষ্মাদয়ো গুরবোহপি যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাৎ ছদ্মনা যুষ্মদ্রাজ্যাপহারং যুষ্মদ্‌-দ্রোহঞ্চ কুর্ব্বতাং দুর্য্যোধনাদিনাং সংসর্গেণ কার্য্যাকার্য্যবিবেক বিরহাচ্চ সংপ্রতি ত্যজ্যা এব। "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।" ইতি স্মৃতেরিতি চেত্তত্রাহ মহানুভাবানিতি। মহান্‌ সর্ব্বোৎকৃষ্টোহনুভাবো বেদাধ্যয়ন-ব্রহ্মচর্য্যাদিহেতুকঃ প্রভাবো যেষাং তান্‌।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

যদি বলেন তোমার রাজ্য স্পৃহা না থাকিতে পারে, কিন্তু রাজ্য ভিন্ন দেহ যাত্রা কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবে" শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তির উদ্ভাবন করিয়াই যেন পুনশ্চ বলিলেন,—দেখুন গুরু হত্যা হইতে বিরত হইয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষালব্ধ অন্ন অতি নিন্দনীয় হইলেও, ঐ ভিক্ষান্নে আমার জীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়, উহাও আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ ইহাতে আমার ইহকালে দুর্দ্দশা হইলেও পরলোকে আমার অনিষ্ট হইবে না। যদি বলেন তুমি যাঁহাদিগকে গুরু পরমাত্মীয় বোধে অসম্মান করিতেছ না, ঐ ভীষ্ম দ্রোণাদি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেক হারাইয়াছেন এবং যুদ্ধগর্ব্বের ছল ক্রমে ইঁহারা ও ও তোমাদের প্রতি দ্রোহাচরণ ও রাজ্যাপহরণ করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে ইঁহারাও তোমার ত্যাগের যোগ্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রে বলেন "কার্য্যাকার্য্য বিচারাক্ষম পাপাদি অবলিপ্ত উৎপথপ্রতিপন্ন গুরুকেও ত্যাগ

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

কাল-কামাদয়োঽপি যদ্বশ্যাস্তেষাং তদ্দোষসম্বন্ধো নেতি ভাবঃ। নন্বর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈরিতি ভীষ্মোক্তেরর্থলোভেন বিক্রীতাত্মনাং তেষাং কুতো মহানুভাবতা ততো যুদ্ধে হন্তব্যাস্তে ইতি চেত্তত্রাহ হত্বার্থকামানিতি। অর্থকামানপি গুরূন্ হত্বাহমিহৈব লোকে ভোগান্ ভুঞ্জীয় ন তু পরলোকে তাংশ্চরুধিরপ্রদিগ্ধান্ তদ্রুধিরমিশ্রানেব

তাৎপর্য্যানুবাদ।

করিবে" অতএব কেন তুমি ইহাঁদিগের অপেক্ষায় যুদ্ধে বিরত হইতেছ? ইহাও বলিতে পারেন্ না; কারণ, এই শাস্ত্র শাসন ইহাঁদের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না; যেহেতু ইহাঁরা মহানুভব, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি জন্য অত্যন্ত বর্দ্ধিতপ্রভাব হইয়াছেন এবং সেই বলে কামাদিরিপু এমন কি মৃত্যুকেও নিজবশে স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাঁদিগকে উক্ত পাপ স্পর্শ করিতেই পারে না। তথাপি আপনি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্ম মহাশয়ের মুখোচ্চারিত "পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, হে মহারাজ! একথা সত্য যে আমি কুরুগণের অর্থেই বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া যদি বলেন যে, ভীষ্ম যখন অর্থলোভে আত্ম বিক্রয় করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর মহানুভাবতা কোথায়? কারণ লোভ অপর সকল গুণকেই নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব এরূপ লোভপরবশ ব্যক্তি হনন অযোগ্য নহেন। এই সকল কল্পিত আশঙ্কা আজ অর্জ্জুনকে বিচলিত করিতে পারিল না, তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বেও যেমন দৃঢ় ছিল, এখনও "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্। অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥" অর্থাৎ গুরু যেমনই হউন না কেন শিষ্যের নিকট তিনি দেবতা। এই অনুকূল যুক্তি বলে তদ্রূপই দৃঢ়, তজ্জন্য তিনি পুনশ্চ "গুরু" এই শব্দের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—আমি অর্থকাম গুরুগণকে হনন করিয়া, ইহলোকেই বা কৈ শুদ্ধ ভোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি? যেহেতু উঁহাদের হিংসাদ্বারা সমস্ত ভোগ্যই উহাঁদের রুধিরে প্রদীপ্ত হইতেছে, ঐ রুধির লিপ্ত ভোগ্য উপভোগে পাপই আশ্রয় করিবে, ইহাতে ধর্ম্ম বা পরম পুরুষার্থ লাভ

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ॥
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥৬॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ন তু গুর্ব্বান্ ভুঞ্জীয় তদ্ধিংসয়া তল্লাভাৎ। তথা চ যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাদি মত্ত্বেঽপি তেষাং মদ্গুরুত্বমস্ত্যেবেতি পুনর্গুরুগ্রহণেন সূচ্যতে॥৫॥

নন্বু ভৈক্ষ্যভোজনং ক্ষত্রিয়স্য বিগর্হিতং যুদ্ধঞ্চ স্বধর্ম্ম বিজানন্নপি কিমিদং বিভাষসে ইতি চেত্তত্রাহ ন চৈতদিতি। এতদ্দ্বয়ং ন বিদ্মঃ-ভৈক্ষযুদ্ধয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরদ্গরীয়ঃ প্রশস্ততরং। হিংসা বিরহাদ্ভৈক্ষ্যং গরীয়ঃ স্বধর্ম্মত্বা-দ্যুদ্ধং বেতি। এতচ্চ ন বিদ্মঃ সমারদ্ধে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জয়েম তে বা নো হস্মান্ জয়েয়ুরিতি। নন্বু মহাবিক্রমিণাং ধার্ম্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবতামেব বিজয়ো ভাবীতি চেত্তত্রাহ যানেবেতি। যান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ সর্ব্বান্। ন জিজী-বিষামো জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ। কিং পুনর্ভোগান্ ভোক্তুমিত্যর্থঃ। তথা চ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হইবে না। অতএব আপনি আমার ইহলোকে নিন্দনীয় এবং পরকালে অধোগতির মূলীভূত এই ভয়াবহ নৃশংস কার্য্য করিতে বলিবেন্ না; ইহাপেক্ষা আমার ভিক্ষাশন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ॥৫॥

"ভিক্ষালব্ধ অন্ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিগর্হিত; যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, তুমি ইহা বিশেষ অবগত থাকিয়াও কি জন্য এরূপ অন্যায় উক্তি করিতেছ" শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ঈদৃশ প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়াই যেন, জ্ঞান পথে অগ্রযায়ী অর্জ্জুন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন; হায়! ভিক্ষাশন বা যুদ্ধ এতদু-ভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমার বিশেষ প্রশস্ততর, তাহা আমি ধারণা করিতে পারিতেছি না। একপক্ষে ভিক্ষাশনে হিংসাদি কোন অসৎ কার্য্য নাই, অথবা পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম বলিয়া যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ? এতদুভয়ের কোন্‌টী অবলম্বনীয়?

বিদ্যাভূষণভাষ্যম্।

বিজয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেতি। তস্মাৎ যুদ্ধস্য ভৈক্ষ্যাদ্‌গরীয়স্ত্বম-প্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন তস্মাদেবং বিচ্ছান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমর্জ্জুনস্য জ্ঞানাধিকারিত্বং দর্শিতং। তত্র কিন্নোরাজ্যেনেতি শমদমৌ। অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যেত্যৈহিক-পারত্রিক ভোগোপেক্ষালক্ষণা উপরতিঃ। ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং শ্রেয় ইতি দ্বন্দ্ব-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

যুদ্ধে একপক্ষের জয় লাভ অবশ্যম্ভাবী। হয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের নিকট আমরা পরাজিত হইব, অথবা উহারা আমাদিগের নিকট পরাস্ত হইবে।

যদি বলেন তোমরা মহাবলশালী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তোমরা যখন ধর্ম্মযুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমাদের জয়ই অবশ্যম্ভাবী, এবং ইহাই তোমাদের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠের পক্ষে প্রশস্ততর।

কিন্তু হায়! যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে কিছুই আসিয়া যায় না, যেহেতু জয় বা পরাজয় এতদুভয় আমাদের পক্ষে তুল্যই হইতেছে। যে ভীষ্ম প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া আমরা আর জীবন ধারণেরও বাসনা করিনা, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে বধ করিয়া যদি আমরা জয় লাভে সক্ষম হই, উহার পরিণাম পরাজয় অপেক্ষা অধিক কষ্টজনক হইবে, কারণ এই ভীষণ স্বজন হত্যা দুঃখানলে আমরণ দগ্ধীভূতের পক্ষে রাজ্যভোগস্পৃহার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব ভিক্ষাশন অপেক্ষা যুদ্ধ যে আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর নহে, ইহা স্থির নিশ্চয়।

অর্জ্জুনের এতাবৎ উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে।" এই শ্রুতিসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকার, তৎকালে অর্জ্জুনের উপস্থিত হইয়াছিল।

অর্থাৎ "কিং নো রাজ্যেন" (১।৩২) এই শ্লোকে শম, দম। "অপিত্রৈ-লোক্য রাজ্যস্য" (১।৩৫) এই শ্লোকে ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগের উপেক্ষা লক্ষণ উপরতি। "ভৈক্ষ্যং ভক্তুং শ্রেয়ঃ" এই বাক্যে সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা লক্ষণ তিতিক্ষা এবং "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ" এইবাক্যে

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

সহিষ্ণুত্বলক্ষণা তিতিক্ষা। গুরুবাক্যদৃঢ়বিশ্বাসলক্ষণো শ্রদ্ধা তুত্তরবাকে ব্যক্তীভবিষ্যতি ন খলু শমাদিশূন্যস্য জ্ঞানেঽস্ত্যধিকারঃ পঙ্গ্বাদেরিব কর্ম্মণীতি ॥৬॥

অথ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধাং গুরূপসত্তিং দর্শয়তি কার্পণ্যেতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণ ইতি—শ্রবণাদ্ ব্রহ্মবিত্ত্বং কার্পণ্যং। তেন হেতুনা যো দোষো যানেব হন্তেতি বন্ধুবর্গমমতালক্ষণ-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

গুরু বাক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষণ শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহা হইতে পঙ্গু প্রভৃতির কর্ম্মে অক্ষমতার ন্যায় শম, দমাদি শ্রদ্ধা বিরহিত ব্যক্তির যে তত্ত্ব জ্ঞানে অধিকার নাই, তাহা দেখান হইয়াছে। এবং জ্ঞানমার্গে অর্জ্জুনের ক্রমোন্নতির বিষয় ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে ॥৬॥

পূর্ব্বে অর্জ্জুনের চিত্তবৈকল্য হইতে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া সংসারে জীবের শোক মোহাদি বিবিধ দুঃখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এবং পরবর্ত্তী ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেয়স্করতা হইতে, ভোগে বিরাগ, এবং ইহলোক ও পরলোকের নশ্বরতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সমিদ্ গ্রহণ করিয়া শোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। আচার্য্যবান্ পুরুষই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।" এই শ্রুতি প্রতিপাদিত, বিষয় ভোগ বিরত শম, দমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতাই যে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সদ্ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত অবস্থায় যে অর্জ্জুন উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে;—সৌভাগ্যবান অর্জ্জুন

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

স্নেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহালক্ষণঃ স্বধর্ম্মো যস্য' সঃ। ধর্ম্মে সংমূঢ়ং ক্ষত্রিয়স্য যে যুদ্ধং স্বধর্ম্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং চেত্যেবং সন্দিহানং চেতোযস্য সঃ। ঈদৃশঃ সন্নহং ত্বামিদানীং পৃচ্ছামি তস্মান্নিশ্চিতমৈকান্তিকং আত্যন্তিকং যন্মে শ্রেয়ঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, আনন্দ চিদ্ঘন বিগ্রহ পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিয়া বলিলেন; আমি কার্পণ দোষে উপহতস্বভাব ও ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত হইয়া আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর পথ, তাহা নিশ্চয় পূর্ব্বক বলুন, আমি আপনার শিষ্য ও শরণাপন্ন, আমাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন।

অর্জ্জুনের বাক্যে তাহার তিনটি দোষের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কার্পণ্য, উপহতস্বভাব ও ধর্ম্মবিমূঢ়। প্রথমত কার্পণ্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কার্পণ্য লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার। যে ব্যক্তি কোন প্রকারের নিজ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন্ না, তিনিই কৃপণ।

আজ আত্মীয় স্বজনের মমতা-পাশচ্ছেদনে অক্ষম হওয়ায় লৌকিক নিয়মে কৃপণতা আসিতেছে।

বৈদিক কৃপণের লক্ষণে দেখাযায় "হে গার্গ! যিনি অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া, এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনিই কৃপণ," অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের অজ্ঞত্বই কার্পণ্য।

এখানে অর্জ্জুন যখন পাঞ্চভৌতিক দেহকেই আত্ম স্বরূপে কল্পনা করিয়া সেই নশ্বর দেহের প্রতি মমতা প্রকাশ করিতেছেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা বা সেই আত্মার কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন্ না, তখন তৎকালে তাঁহার পর ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান যে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই, তাহা বেশ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং উক্ত উভয় লক্ষণেই তৎকালে কৃপণের ভাব রূপ কার্পণ্য অর্জ্জুনে আপতিত হইয়াছিল।

ভক্তি, ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন মাস, ১৩২৩

মুরলী তানে।

যদি—জীবন যৌবন সফল করিবি,
চল্ সখি! যমুনার কূলে,
সেথা—নবীন নাগর শ্যাম নটবর
ত্রিভঙ্গিম, কদম্বের মূলে।
ধড়া চূড়া পরি' সুবেশ কিশোর
রতিপতি জিনি' তার শোভা,
অধরে মুরলী বাজে মৃদু মৃদু
কিবা তার সুর মনোলোভা!
চাহনিতে তার পাগল করে লো
অবশ হইয়া যায় দেহ,
রসের সাগর, পীরিতির ধারা
সে যে সুখ, ভালবাসা, স্নেহ।
এমন নাগর পাবি না লো আর,
এমন হৃদয় চোরা সখা,
মন তার পদে বিকাইতে চায়
হ'লে শুধু বারেকের দেখা।
ঐ শোন্ সখি! কানুর মুরলী
ফুকারিছে—আয়, আয়, আয়!
যমুনা পুলিনে চল নিধুবনে—
আর কি লো ঘরে রহা যায়।

শ্রীহরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।

মুক্তি ও ভক্তি।

(শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ সরকার, এম, এ; বি, এল লিখিত।)

——:০:——

ভারতবর্ষের ধর্ম্মদর্শনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন সমূহে মুক্তিই মানবের নিঃশ্রেয়সরূপে অবধারিত হইয়াছে। ত্রিতাপদগ্ধ জীব অবিদ্যাবশে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দুঃখাত্মক সংসার-চক্রে জন্ম জন্মান্তর নিষ্পেষিত হইতেছে। কর্ম্মফলাত্মক এই সংসার-চক্র হইতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করাই পরম পুরুষার্থ। তাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি যে চতুর্ব্বর্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বর্গ। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে মোক্ষাবস্থার কল্পনায় ন্যূনাধিক ভেদ থাকিলেও মোক্ষই পরম শ্রেয়ঃ এ বিষয়ে সকলেই একমত। অদ্বৈত বেদান্তমতে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্ম নৈবাপরঃ।" মায়াবশে জীব স্বীয় ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না; তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যে মায়া অপগত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তখন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সাংখ্যমতে পুরুষ (জীব) তত্ত্বতঃ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র বিশ্বক্রীড়ায় মোহিত হইয়া পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত ভ্রমবশে একীভূত মনে করিয়া তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে; তজ্জন্যই প্রাকৃত সুখ, দুঃখ ও মোহ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিতে পারিতেছে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি হইতে নিজ স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারিলে, মায়াময়ী প্রকৃতি সেই পুরুষের নিকট হইতে ধৃতাপরাধা স্বৈরিণীর ন্যায় দূরে অপসারিত হইবে, তখন পুরুষ নিজের নির্ম্মল কেবল সাক্ষী চৈতন্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহাই কৈবল্য-মুক্তি। যোগদর্শনেরও এই মত। তবে যোগদর্শনে কৈবল্য প্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ যোগাচার ও ঈশ্বর প্রণিধান বিশেষরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ন্যায় ও

বৈশেষিক দর্শন মতে জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যথাক্রমে দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইয়া জীব মোক্ষাপবর্গ লাভ করিবে। বৌদ্ধমতানুসারে দুঃখাত্মক জন্মপরম্পরার কারণীভূত বাসনারাশির বিধ্বংস হইলে জীব নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করে। জৈনমতে দ্বেষরাগ নির্ম্মূল হইলে কর্ম্মাস্রব রহিত হইয়া জীব কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অর্হত্ত্ব লাভ করে। এইরূপে সকল দর্শনই মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। মোক্ষ লাভ হইলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তির আর কোন কামনা থাকে না; সর্ব্ববিষয় হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আত্মারাম আত্মক্রীড় হন।

সকল দর্শনেই এবম্প্রকার মুক্তির পরম পুরুষার্থত্ব উক্ত হইলেও ভক্তি মার্গাবলম্বী বৈষ্ণবগণ এইরূপ মুক্তির প্রয়াসী নহেন। ইষ্টদেবে নিত্য ভক্তিই তাঁহাদের একমাত্র সাধ্য ও পরম নিঃশ্রেয়স। এই আত্যন্তিক ভক্তিকেই কোন কোন শাস্ত্রে বৈষ্ণব সম্মত মুক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

লীনতা হরি-পাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ইদমেব হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানাং সুসম্মতম্॥ (নারদ পঞ্চরাত্র।)
মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা
নির্ব্বাণ-পদদাত্রীচ হরিভক্তিপ্রদা প্রিয়ে॥
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ২২অধ্যায়।

কিন্তু মুক্তি শব্দ পারিভাষিক অর্থে, উক্তপ্রকার মোক্ষেরই প্রতীতি মনে জন্মাইয়া থাকে, তজ্জন্য ভক্তিকে মুক্তি নামে অভিহিত না করাই শ্রেয়। একদিন সার্ব্বভৌম মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মাস্তব (১০ম স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক) পাঠ করিবার সময় "মুক্তিপদে স দায়ভাক্" স্থলে "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" এইরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। "মুক্তির স্থলে ভক্তি শব্দের সন্নিবেশ দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ পাঠান্তর করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় "ভক্তি সম নহে মুক্তিফল" বলিয়া স্বীয় বক্তব্য নিবেদন করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু

মূল পাঠ অবিকৃত রাখিয়া "মুক্তিপদ" শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন।

ও পাঠ কহিতে না পারি ॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে।
তথাপি অশ্লিষ্যদোষে কহন না যায় ॥
যদ্যপিহ মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্তি কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়েত উল্লাস ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।)

শ্রীমদ্ভাগবতে যে অপরূপ ভক্তি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইয়াছে তাহাতে মুক্তির পরম পুরুষার্থ খণ্ডিত হইয়াছে। ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া নিজপুত্র শুকদেবকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন এই কথা শুনিয়া শৌনক মুনি প্রশ্ন করিলেন।

স বৈ নিবৃত্তি নিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারামঃ সমভ্যসৎ ॥ ভাঃ ১।৭।৯

অর্থাৎ শুকদেব ঋষি নিবৃত্তি নিরত, তাঁহার কোন কামনা নাই, তজ্জন্য তিনি সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি আত্মারাম, তিনি কি নিমিত্ত এই বিস্তীর্ণ ভাগবত সংহিতা অভ্যাস করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই সুপ্রসিদ্ধ আত্মারাম শ্লোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে :—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ভাঃ ১।৭।১০

অর্থাৎ আত্মাতে যাঁহাদিগের রতি এরূপ বাসনা-গ্রন্থি শূন্য মুনি সকলও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির এমনই গুণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ॥
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তি যোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥ ভাঃ ৩।২৯।১৩-১৪

অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে ভক্তিতে ভক্তজন,—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব দান করিলেও আমার সেবা ব্যতিরেকে উঁহাদের কিছুই গ্রহণ করে না, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে কথিত হয়। যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিত্যধামে কৃষ্ণ সেবার অধিকারী হইয়া অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আস্বাদনে রত হইয়া আছেন, তিনি সালোক্যাদি মুক্তি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন কেন? অপ্রাকৃত হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর নিকট মুক্তি-সুখ গোষ্পদের তুল্য।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণ করিলেও তাহা এই ভক্তি সুখসাগরে পরমাণু-তুল্য হইতে পারে না।

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্ক-মিশ্র-তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ।
অন্তর্গত স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভ মক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ॥

এই জন্যই "মোক্ষলঘুকৃৎ" ভক্তির অন্যতম লক্ষণ।

ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা বহুল পরিমাণে গরীয়সী। ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই মহান্ আদর্শের নিকট চতুর্ব্বর্গ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
শ্রেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞান দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা স্বর্গ ভোগাদি সুলভ হয় কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥ভাঃ।৫।৬।১৮

কিন্তু এই মুনিবাঞ্ছিত সুদুর্ল্লভ হরিভক্তি আমাদিগের পরমদয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু অকাতরে জগতে বিতরণ করিয়াছেন।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।

হরিঃ পুরট সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যিনি চিরকাল অনর্পিত উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বীয় ভক্তি, শ্রী প্রদান করিবার জন্য কৃপা করিয়া কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার দেহকান্তি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, এই শচীনন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত হউন।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য।*

জগতপাতা জগদীশ্বরের সৃজিত যাবতীয় জীব জন্তুর মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব্বপ্রধান। মানব মাত্রেই সকল জীবের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত। "মনু শব্দের" উত্তর অপত্যার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিয়া, মানব এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব মানব মাত্রেই মনুর পুত্র। মনু আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করাই আমাদিগের উচিত। ঈশ্বর যত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব জাতিকেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছেন, অন্যান্য প্রণী অপেক্ষা মানবকেই অধিক পরিমাণে বিচার শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। তাই মানব জাতি সকলেরই উপর আধিপত্য লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জড় জগতে তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ও বিচার শক্তির সাহায্যে সকলকে সুখ শান্তি প্রদান করিবে বলিয়াই যেন তিনি এই মানব জাতীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবরূপে জন্ম দিয়াছেন। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি গৃহ পালিত অথচ মানবের বিশেষ উপকারী বলবান অতিকায় প্রাণিগণ মানবের বুদ্ধি বলেই তাহাদিগের

* পৃথিবীর যাবতীয় প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটগণের ও সুবিখ্যাত সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের নিকট সুপরিচিত স্যার স্বামী যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ কে, সি, এস, আই লিখিত।

বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। এমন যে মহা খল স্বভাব যুক্ত বিষধর সর্প, সেও মানবের বুদ্ধি কৌশলে বশীভূত হইয়া, তাহার ইচ্ছামত কত প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব মানব জাতি যে সর্বপ্রধান প্রাণী, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্রে ও দেখিতে পাই,—

> "জন্তুনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা,
> তস্মাদ্বৈদিক ধর্ম্ম-মার্গ-পরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎপরম্।
> আত্মানাত্ম বিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
> র্মুক্তির্নো শত জন্ম কোটি সুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনালভ্যতে॥"

অর্থাৎ জীব মধ্যে নর জন্ম সুদুর্লভ মানব মধ্যে পুরুষ, পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র মধ্যে বেদবিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদ-ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা প্রধান। যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদ ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর বিচারদর্শীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত একাত্ম ভাবে অধিষ্ঠিত,তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়; সেইরূপ অনুষ্ঠান-কেই মুক্তি কহে; পরন্তু শতকোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য ব্যতীত তাদৃশী মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।

শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাত উপরে উল্লিখিত হইল এখন ইহাই বিচার্য্য যে, আমরা যে এই মানব দেহ লাভ করিয়াছি, ইহার দ্বারা কি কেবল সংসার প্রতিপালন আত্মীয় কুটুম্বগণের ভরণ পোষণ ও আমাদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রভৃতির সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিলেই আমাদিগের কার্য্য শেষ হইল? অথবা আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে? তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমনান্তর আমরা এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি। এই মানব জন্ম আমাদিগের শেষ জন্ম। আমরা ঈশ্বরের সৃজিত শেষ জীব, মায়ের কোলের ছেলে বড়ই আদরের ধন, অতএব কেবল পিতা মাতার আদুরে ছেলের মত খেলা ধূলায় মত্ত থাকিলে চলিবে না; পরন্তু পিতার আদিষ্ট কার্য্যগুলি যাহাতে সুসম্পাদন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইতে হইবে।

আজ এই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড শৃঙ্খলায় সুশাসিত হইতেছে কাহাদিগের বুদ্ধি বলে? একমাত্র মানদিগেরই বুদ্ধিবলেই কি এই ভূমণ্ডল নানাবিধ সুখশান্তির আকর হইয়া দাঁড়ায় নাই? পরমেশ্বর আমাদিগের জীবন ধারণোপযোগী নানাবিধ শস্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা যদি আমাদিগের বুদ্ধি বলে সেই সকল ফসল জন্মাইয়া না লইতাম, তবে কি আমরা তাহাদিগের রসাস্বাদনে আমাদিগের রসনার বাসনা পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিতাম? নানাবিধ শিল্প কর্ম্মাদির দ্বারা যদি আমাদিগের পরিধেয় বসন ভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া না লইতাম, তবে কি আমরা আজ নয়ন মনোরঞ্জনকারী নানাবিধ পরিচ্ছদে আমাদিগের দেহ আবৃত করিয়া, আনন্দিত হইতে পারিতাম? তাহা হইলে আজ আমাদিগকে বন্য পশুদিগের ন্যায় নগ্নাবস্থায় বনে বনে বিচরণ করিতে হইত। আজ যদি বুদ্ধি কৌশলে আমরা নানাপ্রকার যান বাহনাদির আবিষ্কার না করিতাম, তবে কি আমরা অনায়াসে পৃথিবীর একপ্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে গমনাগমন করিয়া, তত্তৎ প্রদেশের মানবমণ্ডলীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমাদিগের পরস্পরের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে সক্ষম হইতাম? তাহা কখনই হইত না; বরং আমাদিগকে নিশ্চেষ্টভাবে জড়ের ন্যায় একস্থানে বসিয়া থাকিতে হইত। তবেই দেখা গেল, আমরা মানব মাত্রেই এই সকল গুণ বিশিষ্ট হওয়াতেই সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছি।

উপরে যে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা গেল, তাহা জড়জগতের উন্নতি সম্বন্ধীয়। কিন্তু আমাদিগের ইহা ছাড়া আরও একটী মহান কর্ত্তব্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। আজ এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, আমরা সেই সুমহান কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধন করিবার জন্য একটীবারও চিন্তা করিনা। আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন ইহাতো সকল জীবেরই আছে। বাসা বাঁধিয়া ঘর সংসার করিলে আর আত্মীয় স্বজনগণের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই যে আমাদিগের কার্য্য শেষ হইল তাহা নহে। উহা ত সকল জীবেরই আছে। ঐ জ্ঞান ত পশু পক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জীব জন্তুরও আছে। অতএব কেবল মাত্র ঐরূপ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদিগের এই নশ্বর দেহের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমরা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিনা। আমার এই কথা সমর্থন করিবার জন্যই আমি চণ্ডী হইতে

সুরথ রাজা ও সমধি নামক বৈশ্যের প্রতি মেধস মুনির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—

"যতোহিজ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশু পক্ষী মৃগাদয়।"

অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞান বলিয়া, তুমি যাহার উল্লেখ করিলে, সেই জ্ঞান পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতির ও আছে। স্নেহ মমতা প্রভৃতিকে যদি জ্ঞান বল তবে তাহা অন্য জীবের কি নাই ?

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥

পক্ষীও চঞ্চুদ্বারা আহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহার শাবকের মুখে প্রদান করে। তাহারাও কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া, আপনারা নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। তাহারাও সন্তান জনন ও পালনাদি দ্বারা ঈশ্বরের জীব সৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে। তাহাদিগকেও মায়া, মমতা, ক্রোধ প্রভৃতির বশতাপন্ন হইতে দেখা যায়। অতএব সন্তানের জন্ম দাতা হইলে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলে, আপনার স্বার্থে আঘাত লাগায় ঝগড়া, মারামারি করিলে ও বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুখে অবস্থান করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায়না। প্রকৃত জ্ঞান তাহাই, যে জ্ঞানের তুলনা নাই। যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, ধ্রুব, প্রহ্লাদ পরম-কারণ-সত্য-সনাতন শ্রীহরির চরণ লাভ করিয়াছিলেন. যে, জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, শুকদেব গোস্বামী আজন্ম সন্ন্যাসীরূপে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া, ভগবানের নাম গানে রত থাকিয়া, আপনাকে ধন্য ও শাস্ত্রীয় উপদেশে ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মহর্ষি নারদ অহর্নিশি হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া, ত্রিজগত বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, বুদ্ধদেব আজ জগতবাসীকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, শ্রীচৈতন্যদেব আসমুদ্র হিমাচল হরিনামের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া কত কত পাপী তাপী নারকীকেও উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগের মানবজীবন ধন্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মহানুভাব ভাস্করানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি কতকত মহাপুরুষ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্মরূপ পরম ধর্ম্মাচরণে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ ও জগজ্জনকে সুশিক্ষা দান করিয়া, তাহাদিগেরও হৃদয়ের কুসংস্কার রাশি বিদূরিত

করুণানন্তর অমল ধবল প্রবল জ্যোতিতে তাহাদিগের অন্তর আলোকিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর এই জ্ঞানলাভের জন্যই আমাদিগের এই মানবদেহ ধারণ। অতএব মানদেহ পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপালাভের একমাত্র সোপান স্বরূপ। যদি আমাদিগের দুর্লভ মানব জন্ম একবার বিফলে যায়, তবে আর আমাদিগের দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধম জন্ম লাভ করিতে অর্থাৎ degrade (ডিগ্রেড) হইতে হইবে। একটী বালক first class এ (ফার্ষ্ট ক্লাসে) পড়িতে পড়িতে অমনোযোগিতার জন্য যেমন নিম্ন ক্লাসে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়; সেইরূপ আমরাও সেই বিশ্ববিধাতার সার্ব্বভৌমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবজীবন রূপ ফার্ষ্ট ক্লাস (প্রথম শ্রেণীতে) উন্নীত হইয়া, আমাদিগের নিজ নিজ অসতর্কতা হেতু আমাদিগকে অধম যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদিগকে নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

ভরত রাজা আপনার রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি পুত্রকে প্রদান পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া, বনগমন করিলেও একটী মৃগের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া, শেষে তদ্গত চিত্ত হইয়া, দেহত্যাগ করায়, তাঁহাকে মৃগরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মৃগ দেহ ধারণ করিলেও সেই জন্মে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি" মনোমধ্যে জাগরূক থাকায় আবার সুদুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ লালসায় অবিরত সেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াছিলেন। মায়া মোহে অভিভূত হইবার আশঙ্কায় এজন্মে আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, নীরবে হরিসাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া, কালে শ্রীহরির শ্রীচরণলাভে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে যাইয়া, বলিয়াছিলেন,—

"যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ

অর্থাৎ অন্তকালে যে যেরূপ ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করে, হে কৌন্তেয়। সে সেইরূপ কলেবরই পুনর্জ্জন্মে লাভ করিয়া থাকে। তাই বলি আমাদিগের এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, যেন এক নিমেষের জন্যও আমরা সেই বিশ্ব বিধাতাকে না ভুলি। যদি আমরা এই সকল উপদেশ অবহেলা করিয়া

আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হই; তবে আমাদিগকে আত্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ইহাও আমার স্বকপোল কল্পিত কথা নহে। আমি শাস্ত্র হইতে যুক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইব। বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থ বলিতেছেন যে,—

"লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
সহ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥

অর্থাৎ পুণ্যবলে মানব জন্ম লাভ করিয়া, পুংস্ত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা থাকিতেও যে ব্যক্তি ভব সঙ্কট হইতে আত্ম-পরিত্রাণের জন্য যত্ন পরায়ণ না হয়, সেই মূর্খ ব্যক্তি অসদ্ বস্তু গ্রহণ নিবন্ধন আত্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হয়।

কেবল অহিফেন সেবন অথবা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেই যে, আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি এই ভবসাগর পারে যত্নবান না হইয়া, বৃথায় কালযাপন করে এবং শাস্ত্রাদির চর্চ্চায় রত হইয়া সাধু সদাত্মার সহবাসে জ্ঞানোন্নতির চেষ্টায় একটী দিনও যত্ন না করিয়া, বিফলে এই সুদুর্ল্লভ মানব জীবন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে সেই প্রকৃত আত্ম-হত্যাকারী, এবং আইন অনুসারে বর্ত্তমান যুগে তাহার পার্থিব রাজদণ্ড ভোগ করাও কর্ত্তব্য। আমার মতে সম্প্রতি এই দুষ্ট মতি খলস্বভাব সম্পূর্ন অধর্ম্মাচরণে অভ্যস্ত পাষণ্ডদিগকে সুশাসিত করিবার জন্য একটী নব রাজবিধান প্রণয়ন করা উচিত।

এই পাপমতি কুলাঙ্গারগণ সমাজের যত অকল্যাণ সাধন করিতেছে, এত আর কেহই নহে। ইহারাই বাস্তবিক আজ কাল উদ্দাম রিপুগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া, মানব জীবনের উদ্দেশ্য একেবারে লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিতেছে। এই উদ্দাম সমাজকে অগত্যা রাজবিধানের অধীন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আজ কাল যে ব্যক্তি ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, সে-ই এই সকল দুষ্কৃতকারী দিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। ইহাদিগের দ্বারা

ঐ সকল পুণ্যবানগণ নানা প্রকার নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত হইতেছেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও করিতেছি।

অতএব মানব জীবনের শুভ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আজ এই যে, প্রবন্ধটী আমার বন্ধুবর্গের অনুরোধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, যদি ইহা সাধারণের মনোমত হইয়া থাকে ও এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয় গুলির আলোচনা করিয়া যদি কাহারও জীবন ধন্য হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। তাহার পর আমার আর একটী কথা এই যে, পূর্ব্বে যে আমি রাজ বিধানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, আজ কা'ল পার্থিব রাজ বিধানকে সকলেই ভয় করিয়া থাকে, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর জাগতিক রাজা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী রাজারই প্রতিনিধি স্বরূপ। অতএব তৎকর্ত্তৃক আমরা সেই শমন রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথঞ্চিৎ আশা করিতে পারি বলিয়াই আমি পূর্ব্বে উহার উল্লেখ করিয়াছি। আজ এই খানেই আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীখুন্তীর-আত্মকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

দু' একজন' 'শক-গোণা'-পণ্ডিত বলেন ঐ যে ব্যাপার হয়; সে'টা ১৪৩০ শকে। ওহে বাপু! অত নাক মুখ শিঁট্‌কো না!! বলি অত ঠিক ইতিহাস আমি জানিও না, আর আছে কিনা, তাই বা কে জানে; তবে বেশীর ভাগ মনিষ্যিরা যা' ব'লেছে, যা' শুনেছি, তাই বলছি, বিশ্বাস করতে হয় কর, না হয়, যতদিন না পাথুরে কয়লার দোকানের নিচে তাম্র ফলক বাহির হয়, তত দিন ঐরূপ নাক শিঁট্‌কেই থা'ক!!

হ্যাঁ তার পর—

"বোল বোল বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥"

* * *

সবে প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলয়ে সদায়
বাহ্য হইলেও বাহ্য কথা নাহি কয়।

এই সব দেখে শচীমা বুড়ির ত' হ'ল চক্ষু স্থির! সর্ব্বদা যা' ভয় তাই বুঝি হয়!!

হাঁ করে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হয়ত কতবার ডেকে ডেকে একবার সাড়া পান্।

যা'ওবা উত্তর পান্ তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ড, কোনই মানে হয় না ঐ যা'কে গ্রাম্য ভাষায় বলে "কথাও না কথার দরুণোনয়" এঠিক্ তাই। হয়ত বহু ডাকের পর উত্তর শুনে বল্লেন "ও বাপ নিমাই! যাও বাবা স্নান আহার কর গে।" নিমাই চাঁদ হয়ত তার উত্তরে বল্লেন।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।
ভক্তি বশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী॥"

গতিক ত' এই রকম! বুড়ি কেঁদে কেঁটে সারা! কা'কে ডাকেন, কি করেন্ কিছুরই গোছ পান্ না। মেশো মশায় চন্দ্রশেখর পরমআত্মীয়, কিন্তু তাঁ'কে ডেকে যে কিছু পরামর্শ গ্রহণ করবেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁ'র যো নেই; তিনি নিমাই চাঁদকে যেমন দেখেন আর অমনি চক্ষু কপালে তুলে "জয়রাম জয়রাম" জপ্ করতে সুরু করেন, সে জপের আর কামাই নাই! কি হয়?

শেষকালে শ্রীবাস চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকা হ'ল। ঐ নাও আবার কি প্রশ্ন হ'ল? ইনি কে? কি বিপদ এ সবও বলতে হবে? আচ্ছা বলি শুন, ইনি নবদ্বীপের একজন অতি জ্ঞানী বয়োবৃদ্ধ সুভদ্র; তবে তত্ত্ব বিদ্‌রা বলেন্ আর যা' বলেন সেটা খুব জমাট্ সত্য-তত্ত্ব-কথা, সেই কথার গোছা, দুই চারটা বলি শুনে যাও। সব সময়ে মনেও পড়ে না আর আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তত সাজিয়ে ব'লবার ক্ষমতাও নাই, যা পারি বলি :—

শ্রুতি বেদ, পুরাণের মত যে দু'চার পাঁচখানা পোকা কাঁটা পুঁথী আছে তাতে ব'লেছে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হ'চ্ছেন আমার প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। যিনি পর্জ্জন্য তিনি হ'চ্ছেন ঐ শ্রীহট্টের শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র মহাশয়। ঠাকুর মা বরীয়সী হ'লেন কলাবতী। শ্রীনন্দ যশোমতি হ'লেন, জগন্নাথ মিশ্র

দাদাঠাকুর, আর শচীমা বুড়ী। মা যশোদার বাপ্ হ'লেন ঐ আমাদের চক্রবর্ত্তী মহাশয়; কি নাম ভাল?—হ্যাঁ নিলাম্বর মহাশয়। শ্রীবাস হ'চ্ছেন সে কালের সেই লড়াই বাঁধান মুনি শ্রীযুক্ত নারদ ঠাকুর।

এই ঠাকুরটী এলেন; দু'চার বার অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রে বল্লেন" কিছু ভয় নাই শচীমা'! তোমার কিছু ভয় নাই এ সব কিছু নয় ভাবতে হবে না আগা গোড়ার বাঁধন ঠিক্ আছে।" শচীমাও বুঝে না বুঝে কতক স্থির হ'লেন। এদিকে আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—

কি বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ তার পর শ্রীআচার্য্য প্রভু রাত্রে কি এক স্বপ্ন দেখে, ধড় মড়িয়ে উঠে আহ্লাদে ধিন্ ধিন্ করে একেবারে পাগ্‌লা শিবের মত নৃত্য শুরু করেছেন। ব্রাহ্মণী শ্রীসীতাদেবী ছুটে এসে, বুড়োর কাণ্ড দেখে অবাক্! বুড়ো এত নাচে কেন গো? বাতাস লাগ্‌লো না কি?"

ঐ যাঃ আমার কি যে রোগ; কিছু বুঝ্‌তে পারিনা, কিছুই গোছ নাই, আগের কথা শেষে, আর শেষের কথা আগে; ছিঃ ছিঃ!!

উদ্দেশ্য, উপায়, উপকরণ, উপভোগ, কোথায় কি, কোন্‌টা কোথায়, গোল্লায় যাচ্ছে কে জানে! যা'ক্ গে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান? শ্রী অদ্বৈত ঠাকুরের টোলে শ্রীপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ দাদাঠাকুর যখন ভক্তি শাস্ত্র পড়েন, সেই সময়ে শ্রীপ্রভুর মধ্যে মধ্যে আগমন হইত। তিনি তখন একটী তরল, চপল, সুন্দর বালক। বৃদ্ধ আচার্য্য তাঁকে দেখে ভেবে ব'সেছিলেন "এটি একটী অবতার।" তারপর বহুদিন গেছে। তাঁর সে চিন্তার কার্য্য-সূত্র এ যাবৎ কিছু দেখেন নাই। তারপর, গত কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন প্রতি-বাসী, প্রভুর সব জীবনের প্রসঙ্গ আচার্য্য ঠাকুরকে শুনাইলেন। আচার্য্যের মুখে অল্প আনন্দের হাঁসি খেলিল। দু'চার দিন পরে, এক্ দিন এক্ গুঁয়ে 'বারেন্দ্র বামুণ' আচার্য্যজী ভাগবতের কোন্ এক স্থানের কি এক তাৎপর্য্যে বিপর্য্যয় বোধ করে, উপবাস করে দাঁতে কুটোলয়ে "চিৎপটাং" হ'য়ে শু'য়ে রইলেন। ওঁদের কার্য্য ওঁরাই জানেন!!!

ক্রমে নিদ্রা। পরে স্বপ্ন দর্শন। কে যেন বল্‌ছেন "আর চিন্তা করিওনা। তোমার সংকল্প সিদ্ধ হ'য়েছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'য়েছেন।"

যেমন ইহা স্বপ্নে শ্রবণ করা আর তারপরই ঐ নৃত্য! বুঝলে, ব্যাপারটা কি?

তারপর আমার দয়াল ঠাকুর একদিন শ্রীগদাধর চন্দ্রকে সঙ্গে ল'য়ে নিজেই আচার্য্যের মন্দিরে হাজির! তা দেখে, বৃদ্ধ গঙ্গাজল, তুলসী, ল'য়ে "নমো ব্রহ্মণ্য, দেবায়" ইত্যাদি মন্ত্র ব'লে দস্তুর মত শ্রীপ্রভুর পূজা সুরু ক'রে দিলেন। বেচারা গদাধর, আচার্য্য বুড়োর কাণ্ড দেখে, প্রভুর পাছে অকল্যাণ হয় এই ভয়ে ভেবেই সারা। গেল কিছুদিন। তারপর—

"জানিলা অদ্বৈত হৈ'ল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥

এদিকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর, ঐ পূজার কাণ্ড ধীরে ধীরে পাঁচ কাণ্ হতে লাগলো। আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ সহ প্রায় সর্ব্ব সাধারণ সকলেই শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে মন প্রাণে ভক্তি করিতে লাগিল। রোজই বহু দূর দেশ হইতে ধীরে ধীরে ভক্তগণের আগমন আরম্ভ হইল। নদীয়ায় ভক্তগণের সমাবেশ হইল।

আজ কাল সন্ধ্যার পর হইতেই আমার প্রভুর বহির্বাটীতে সংকীর্ত্তন করিতে সকলে একত্রিত হইতেন।। আনন্দ! আনন্দ!! নদীয়ায় আনন্দের স্রোত চলিল। এই সময়ে প্রায়ই আবেগে শ্রীগৌরচন্দ্র বলিতেন "ভাই সকল! কানাই নাটশালায় যখন গয়া থেকে আসি, সেই যে একটী পরম সুন্দর কৃষ্ণ বর্ণের রাখাল বালক নাচিয়া নাচিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে এসে আমাকে আলিঙ্গন করিল সে কোথা গেল, বল্‌তে পার? তোমরা দয়া ক'রে তা'কে আমার কাছে এনে দাও। আর তোমরা সকলেও তাঁহাকে ভজনা কর।" এরূপ ভাবের বিরাম নাই।

কিছুদিন যায়, ক্রমে শ্রীবাস মন্দিরেতে রাত্রে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। আর বাজে লোকের গোল নিবারণ করিবার জন্য দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে গঙ্গাদাস নামে এক ভক্তকে দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হইল। সর্ব্ব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কেবল অন্তরঙ্গ লইয়া কীর্ত্তনানন্দ। চলিল কিছুদিন। ক্রমে নিন্দুকের দল নানারূপ কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে চণ্ডী চরণ নামে একজন ঘোর শাক্ত অহিফেন সেবি ব্রাহ্মণের 'রকে' প্রাতঃকালে

রোজই এক "ভ্যান্‌ভাড়ার" আড্ডা বসিত। তাদের কাজ ছিল তামাকু সেবন আর বৃথা পর কুৎসা, পর চর্চ্চা।

একদিন চণ্ডি বল্‌লেন—

ওহে "এ গুলোর হইল কি বাই"।
রাত্রে যে আর নিদ্রা হইবার উপায় নাই॥"

একজন দলে বকধার্ম্মিক ছিলেন তিনি ভারি মুখ সিঁট্‌কে বল্লেন "জ্ঞান যোগ এড়িয়া একোন্‌ বিচারে ?" এ দের এসব কি কাণ্ড ? ছিঃ ছিঃ !!

একজন ওরি মধ্যে রাজনৈতিক ছিলেন তিনি রক্তহীন বদন হিন্দুস্থানীর বটুয়া সঙ্কোচন সদৃশ-ভাবে, তুব্‌ড়ে বল্‌লেন—"ভায়া! সে সব কথা যাউক্‌, এখন আদৎ কথা কি জান ? ঐ বেটাদের জ্বালায় আমাদের মত দশজন ভদ্রেরই বিপদ। আজ খাস্‌ কামরায় শুনিলাম শীঘ্রই দুই খানি বহর করিয়া 'নবাবের' ফৌজ আস্‌ছে। শ্রীবেসে বেটাদের কি বলনা, ওরা ঢোল্‌ তব্‌লা নিয়ে ঝোড় জঙ্গলে সরে পড়্‌বে; আর মর্‌তে আমরাই স্ত্রী পরিবার ল'য়ে বিপদে পড়ে মর্‌বো।"—

কি বল্‌ছ ? তখন কি সত্য সত্যই ঐরূপ কিছু একটা হইতে পারিত ? ধর্ম্ম কাজে কি রাজা বাধা দিত ? হ্যাঁ—তার আর আশ্চার্য্য কি ? তখন ছিল মুশলমান রাজা। আর মুশলমানদের যা কীর্ত্তি, তা' তখন পূর্ণ মাত্রাতেই ছিল। কেননা এই যে, ব্যাপার এটা হ'চ্ছে ৪০০ শত বৎসর আগে কার কথা। তখন হিন্দুদের পক্ষে কতকটা সুবিধের বাদ্‌সা আকবর-সার রাজত্ব সুরু হয় নাই। কাজেই তখনো সেই সোমনাথ ধ্বংশের আওয়াজ হেথা হোথা ছিল। তখন ঠিক বাঙ্গালী বল্‌লে এখন যা' বুঝায় ঠিক্‌ সে রকম একটা জীবই গজায় নি'। যে জাতি যখন প্রবল হয়, যে জাতি যখন রাজত্ব ক'রে; ইচ্ছায় হো'ক, অনিচ্ছায় হো'ক তাঁদের দৃষ্টান্ত, তা'দের সর্ব্ববিধ অনুকরণ সাধারণজনগণের মধ্যে, তখন কিছু কিছু বিস্তার হয়। এইটাই হ'চ্ছে নিয়ম। সেই জন্য তখন হিন্দুদের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে মুশলমানদের অনুকরণ, কতক কতক ব্যবহার-কাণ্ড সমাজে ঢুকে' প'ড়েছিল।

ক্রমশঃ।

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

স্যাত্তৎ ত্বং ব্রূহি। সাধনোত্তরমবশ্যং ভাবিত্বমৈকান্তিকৎ। ভূতস্যাবিনাশিত্ব-মাত্যন্তিকত্বং। নমু শরণাগতস্যোপদেশস্তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এবং উক্ত কার্পণ্য হেতু যে দোষ অর্থাৎ যাহা "যানেব হত্বা" এই শ্লোকে বন্ধুবর্গেরপ্রতি মমতায়, যুদ্ধস্পৃহারূপ যাহা ক্ষত্রিয়ের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম হইতে বিরত হওয়ায় স্বভাবের বিচ্যুতি।

তৃতীয় ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত, তাহার কারণ তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া যখন নিজের ধর্ম্ম, যুদ্ধাদি পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়ের অযোগ্য ভিক্ষাশনকে শ্রেয়স্কর বলিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, তখন যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিমূঢ়াবস্থায় আপতিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঈদৃশাবস্থায় পতিত অর্জ্জুনের প্রশ্নে তাঁহার ঐকান্তিকত্ব ও আত্যন্তিকত্বেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

জীব, সাধন-পথে অগ্রসর হইলে, তাহার পরবর্ত্তী ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহার বিচার করে না, তখন আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধন, ফল যাহা হইবার তাহা হইবে, এই দৃঢ়তায় সাধন পথে অগ্রসর হইলে তদনন্তর ঐকান্তিকত্বের দ্বারা অবশ্যম্ভাবিত্ব জ্ঞান হইলে, আর বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা।

এবং জীবের অবিনশ্বর অবস্থাই আত্যন্তিকাবস্থা, অর্থাৎ যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন আত্যন্তিক কল্যাণ বুঝিতে সক্ষম হয় না। দেহাতি-রিক্ত জীবাত্মা আছেন সেই জীবাত্মার মঙ্গলই দেহের মঙ্গল, বিনশ্বর দেহের কল্যাণ কামনা অকিঞ্চিৎকর, এইরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইলেই আত্যন্তিক অবস্থা আসিয়া থাকে। ঐ সময় সমস্ত প্রাণের প্রতি যে অবিনশ্বর ভাব হয়, উহাই আত্যন্তিক ভাব।

এক্ষণে সাধন পথে আরূঢ় হইয়া অর্জ্জুন সেই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই তিনি প্রাণ খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্যন্তিক মঙ্গলের প্রশ্ন করিলেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

দিত্যাদি শ্রুতেঃ। সখায়ং ত্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেত্তত্রাহ শিষ্যস্তেঽহমিতি। শাধি শিক্ষয় ॥৭॥

ননু ত্বং শাস্ত্রজ্ঞোঽসি স্বহিতং বিচার্য্যানুতিষ্ঠ। সখ্যমে শিষ্যঃ কথং ভবেরিতি চেত্তত্রাহ ন হীতি। যৎ কর্ম্ম মম শোকমপনুদ্যাদ্ দূরীকুর্য্যাত্তদহং নপ্রপশ্যামি। শোকং বিশিনষ্টি ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি। তস্মাচ্ছোকবিনাশায় ত্বাং প্রপন্নোঽস্মীতি। ইত্থঞ্চ সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি শ্রুত্যর্থোদর্শিতঃ। ননু ত্বমধুনা শোকাকুলঃ প্রপদ্যসে

তাৎপর্য্যানুবাদ।

কিন্তু এ তত্ত্বোপদেশ সকলকে করা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন "তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণ লইতে হয়, এবং গুরু শরণাগতকেই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।" সুতরাং তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে উপযুক্ত শিষ্যের আবশ্যক। তুমি আমার সখা, বন্ধু তোমায় আমি এ বিষয়ে উপদেশ কিরূপে করিব? এই বাক্যের উদ্ভাবন করিয়া যদি আজ শ্রীভগবান্ উপদেশে পরাঙ্মুখ হয়েন, তজ্জন্য বলিলেন;—প্রভু! আমায় আপনি কৃপা করিয়া যাহাই বলুন না কেন, আমি আপনার শিষ্য ও শরণাগত, হে শরণাগত বৎসল! শরণাগত শিষ্যকে গুরুর কিছুই অদেয় থাকেনা, আপনি কৃপাপরবশ হইয়া আমায় প্রকৃত কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন ॥৭॥

অর্জ্জুন মনে করিলেন শ্রীভগবান যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত, নিজের হিতসাধন বিষয়ে স্বয়ং বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠান কর, তুমি আমার সখা, সখার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে? তুমি এক্ষণে এরূপ শোকাকুল হইতেছ, কিন্তু যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যখন সুখ সমৃদ্ধি লাভ

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

যুদ্ধাৎ সুখসমৃদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ অবাপ্যেতি। যদি যুদ্ধে বিজয়ী স্যাং তদা ভূমাবসপত্নং নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্য যদি চ তত্র হতঃ স্যাং তদা স্বর্গে সুরাণামপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্য মে বিশোকত্বং ন ভবেদিত্যর্থঃ। তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে

তাৎপর্য্যানুবাদ।

করিবে তখন এই আত্মীয় স্বজনের বিনাস জন্য শোক অপনীত হইবে। এইরূপ ভগবদ্ভক্তির কল্পনা করিয়াই যেন অধিকতর কাতর ভাবে বলিলেন, হে শরণাগত বৎসল প্রভু! হায় কি কর্ম্ম করিলে যে আমার শোক দূরীভূত হইবে তাহা আমি আদৌ বুঝিতে সক্ষম হইতেছিনা, শোকে আমার ইন্দ্রিয়-গণকে বিশোষিত করিয়াছে, মানব ইন্দ্রিয়বলে দর্শনাদি করিয়া, অন্তরিন্দ্রিয় মনের সাহায্যে বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সদসৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আজ আমার সে অবস্থা নাই, ইন্দ্রিয় পরিশোষক এই শোকের নিবারক উপায় দেখিতে পাইতেছিনা, তজ্জন্যই আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি আপনি আমায় উপেক্ষা করিবেন না। ইহা দ্বারা "হে ভগবন! আমি শোক-যুক্ত হইয়াছি তুমি আমাকে এই দুস্তর শোক-সমুদ্রের পরপারে লইয়া চল।" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইয়াছে, যদি বলেন যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলেই শোক দূরীভূত হইবে, তাহাও মনে হয়না, কারণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে অসাপত্ন্য নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও শোক আমায় পরিত্যাগ করিতেছেনা, কিম্বা যদি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হত হই, তাহা হইলে স্বর্গ রাজ্যে দেবতাদিগের আধিপত্য লাভ করিয়া অবস্থান করিলেও শোক পরিহারের সম্ভাবনা দেখিনা, কারণ তখনও স্বর্গভোগের অবসানে আবার কোন লোকে আসিয়া জন্ম লইতে হইবে স্বর্গ অবিনশ্বর নহে শ্রুতি বলেন "ইহ জগতে কেবল কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ বস্তুর যেমন ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকেরও ক্ষয় হইয়া থাকে।" সুতরাং যুদ্ধ লব্ধ-কি ঐহিক, কি পারত্রিক কোন সুখই আমার শোকাপনোদনে সক্ষম হইতেছে না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ইতি শ্রুতেনৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং সুখং শোকাপহং তস্মাত্তাদৃশমেব শ্রেয়স্তং ব্রূহীতি ন যুদ্ধং শোকহরং ॥৮॥

ততোঽর্জ্জুনঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেতি। গুড়াকেশো হৃষীকেশং প্রতি এবং নহি প্রপশ্যামীত্যাদিনা যুদ্ধস্য শোকানিবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা পরন্তপোঽপি গোবিন্দং সর্ব্ববেদজ্ঞং প্রতি ন যোৎস্য ইতি চোক্ত্বেতি যোজ্যং। তত্র হৃষীকেশত্বাদ্ বুদ্ধিং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যতি। সর্ব্ববেদবিত্ত্বাদ্ যুদ্ধে স্বধর্ম্মত্বং গ্রাহয়িষ্যতীতি ব্যঞ্জা ধৃতরাষ্ট্রহৃদি সংজাতা স্বপুত্ররাজ্যাশা নিরস্যতে ॥৯॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অতএব আপনি আমাকে এমন কোন শ্রেয়স্কর উপায় বলিয়া দিন যাহাতে আর আমাকে শোকের বশীভূত হইতে না হয় ॥৮॥

অর্জ্জুনের এই উক্তি শ্রবণে যদি রাজ্যলোলুপ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের রাজ্যাশা মনে মনে কল্পনা করেন, তাই সঞ্জয় মহাশয় তৎপরবর্ত্তি ঘটনার বিবরণ প্রকাশাভিপ্রায়ে বলিলেন,—পরন্তপ জিতনিদ্র অর্জ্জুন, প্রথমে রাজ্যাপহারী আত্মীয়বধে হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য মনে করিয়া যুদ্ধোদ্যত হইয়াও, পরিশেষে পর্য্যালোচনা দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যুদ্ধে শোক অপরিহার্য্য জ্ঞাপন করিয়া একেবারে যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না" বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

এখানে শত্রুতাপী ও জিতনিদ্র এই বিশেষণ হইতে অর্জ্জুনের সংযম ও ক্ষমতার বিষয়, এবং গোবিন্দ ও হৃষীকেশ এই উভয় পদ হইতে যেন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া দিলেন, হেলুব্ধ! তুমি বৃথা আশায় আশ্বস্ত হইও না, সর্ব্ববেদতত্ত্ববেত্তা হৃষীকেশের পক্ষে অর্জ্জুন সদৃশ সংযমী যোদ্ধাকে যুদ্ধই যে তাহার স্বধর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া যুদ্ধে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে অধিক বিলম্ব হইবেনা ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ব্যঙ্গমর্থং প্রকাশয়ন্নাহ তমুবাচেতি। তং বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি হৃষীকেশো ভগবান শোচ্যান্নিত্যাদিকমতিগম্ভীরার্থং বচনমুবাচ। অহো তবাপীদৃগ্ বিবেক ইতি সখ্যভাবেন প্রহসন্ অনৌচিত্যভাষিত্বেন ত্রপাসিন্ধৌ নিমজ্জয়ন্নিত্যর্থঃ। ইবেতি তদৈব শিষ্যতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌ চিত্যাদিষদধরোল্লাসং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা তস্যোপদেশশ্চ সর্ব্বসাক্ষিক ইতি বোধয়িতুং সেনয়োরুভয়োরিত্যুক্তং ॥১০॥

এবং অর্জ্জুনে তুষ্ণীং স্থিতে তদ্বুদ্ধিমাক্ষিপন্ ভগবানাহ অশোচ্যানিতি হে অর্জ্জুন! অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যান্ এব ধার্ত্তরাষ্ট্রাংস্ত্বং অন্বশোচঃ শোচিত

তাৎপর্য্যানুবাদ।

সঞ্জয় মহাশয় ধৃতরাষ্ট্রকে এই ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা ভাবি বিষয়ের অবতারণা করিয়াই যেন বলিলেন, উভয় পক্ষীয়সৈন্য মধ্যে সর্ব্বলোক সমক্ষে বিষাদে মুহ্যমান অর্জ্জুনকে তৎকালে শ্রীভগবান্ সহাস্য হইয়াই যেন বলিলেন, এখানে ভগবানের হাস্যের তাৎপর্য্য যেন—অহো! কি আশ্চর্য্য তোমারও এমন বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল যে, বিবেকের বশীভূত হইয়া তুমি এমন অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতেছ। এই বলিয়া অর্জ্জুনকে লজ্জা-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া দিলেন। ভগবান হাস্য না করিয়া হাস্য ভাবই যেন, শ্লোকের এই "ইব"'র তাৎপর্য্য। অর্জ্জুন এখন আর কেবল সখা নহে শিষ্য, শিষ্যের নিকট হাস্য করা গুরুর কর্ত্তব্য নহে, সে কারণ ঈষৎ অধরের উল্লাস দ্বারা তাহাকে লজ্জিত করাই এখানে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ॥১০॥

জরা মরণাদি শোক পরিক্লিষ্ট মানব এই জগতে নিয়ত নব নব আশার কুহকে পতিত হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে কতই না দুঃখ ভোগ করিতেছে? আজ যাহা

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

বানসি। তথা মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিব বচনানি দৃষ্টেমং স্বজনমিত্যাদীনি, কথং ভীষ্মমিত্যাদীনিচ ভাষসে। ন চ তে প্রজ্ঞালেশোঽপ্যস্তীতি ভাবঃ যে তু প্রজ্ঞাবন্তস্তে গতাসূন্ নির্গত প্রাণান্ স্থূল দেহান্ অগতাসূংশ্চানির্গত প্রাণান্ সূক্ষ্মদেহান্ চ শব্দাদাত্মনশ্চ ন শোচন্তি। অয়মর্থঃ। শোকঃ স্থূলদেহ বিনাশ নিমিত্তঃ। সূক্ষ্মদেহবিনাশ নিমিত্তো বা। নাদ্যঃ স্থূলদেহানাং বিনাশি

তাৎপর্য্যানুবাদ।

সুখের বলিয়া আকাঙ্ক্ষার বশে তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইতেছে পরক্ষণে আবার তাহাই মহাদুঃখে পর্য্যবসিত হইতেছে, কিন্তু আশার বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। এই ভ্রমান্ধ মানবকুলকে প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া তাহার সুখ কি? কিসে এই দুষ্পার দুরাশা সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃত সুখ লাভে সক্ষম হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান জন্য যে গীতা শাস্ত্রের অবতারণা, এই শ্লোক হইতেই তাহার সূচনা। শ্রীভগবান এই শ্লোক হইতে তাঁহার উপদেশামৃত বর্ষণ করিয়া ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যখন দেখিলেন অর্জ্জুন বিষাদে তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিয়া যথার্থই যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করিলেন, তখন উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তুমি তাহাদের বিষয়ে অনুশোচনা করিতেছ কেন; কেবল শোক নহে, আমার উপর প্রকৃষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রয়োগও করিতেছ। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমার জ্ঞান দূরের কথা, জ্ঞানের লেশ মাত্রও নাই। দেখ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বিগত-প্রাণ স্থূল দেহ বা অবিগত-প্রাণ সূক্ষ্ম দেহের এবং আত্মার বিষয়ে শোক করেন না। কারণ স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন দেহের বিনাশ জন্য শোক? যদি স্থূল দেহের বিনাশ জন্যই এই শোক বল, তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু স্থূল দেহ যে অবিনাশী নহে, ইহার বিনাশ যে স্থির নিশ্চিত তাহা আপামর সাধারণের পরিজ্ঞাত। যদি সূক্ষ্ম দেহের বিনাশ জন্য শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও অসঙ্গত হইতেছে কারণ মুক্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্ম দেহেরও বিনাশ হইয়া থাকে, নতুবা জীবের মুক্তিই হয় না। তৃতীয় আত্মা; যদি আত্মার

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥১২॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ত্বাৎ। নাস্ত্যঃ স্থূলদেহানাং মুক্তেঃ প্রাগ্‌বিনাশিত্বাৎ। তদ্বতাং আত্মনাং তু ষড়্‌ভাববিকারবর্জ্জিতানাং নিত্যত্বান্ন শোচ্যতেতি। দেহাত্মস্বভাববিদাং ন কোঽপি শোকহেতুঃ। যদর্থশাস্ত্রাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রস্য বলবত্ত্বমুচ্যতে তৎ কিল ততোঽপি বলবতা জ্ঞান শাস্ত্রেণ প্রত্যুচ্যতে। তস্মাদশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পামরসাধারণঃ পণ্ডিতস্য তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥১১॥

এবমস্থান শোচিত্বাদপাণ্ডিত্যমর্জ্জুনস্যাপাদ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নিযোজিতাঞ্জলিং তং প্রতি সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামানিতি শ্রুতিসিদ্ধং স্বস্মাজ্জীবানাঞ্চ পারমার্থিকং ভেদমাহ, ন ত্বেবাহমিতি। হে অর্জ্জুন! অহং সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ ইতঃ পূর্ব্বস্মিন্নাদৌ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

জন্য শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারেনা, যেহেতু আত্ম-বিকার-শূন্য, দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ রূপ (জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি) ষড়্‌বিকার আত্মার নাই, আত্মা নিত্য অবিনাশী। সুতরাং দেহ বা আত্মার স্বভাব যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহার শোকের কোন কারণই নাই। পূর্ব্বে তুমি আমাকে অর্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের দৃষ্টান্তে ধর্ম্ম শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছ, কিন্তু আমি তোমায় যে জ্ঞান শাস্ত্রের কথা বলিলাম এই জ্ঞান শাস্ত্র অর্থ বা ধর্ম্ম শাস্ত্রের উভয় বাক্যেরই নিরাস করিতেছে। তোমার মত ধী-শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মী পুরুষের এই অজ্ঞজনোচিত শোকের অবিষয়ে শোক করা সম্পূর্ণই অযোগ্য ॥১১॥

এই রূপে সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিষয়ে শোক করায় অর্জ্জুনের অজ্ঞতা খ্যাপন করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু নিয়োজিতাঞ্জলি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, বহুনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য, বহুচেতনেরও যিনি চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, এই শ্রুতি

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

কালে জাতু কদাচিন্নাসমিতি ন অপিত্বাসমেব। তথা ত্বমর্জ্জুনো নাসীরিতি ন কিন্ত্বাসীরেব। ইমে জনাধিপা রাজানো নাসন্নিতি ন কিন্ত্বাসন্নেব। তথৈতঃ পরস্মিন্নন্তে কালে সর্ব্বে বয়ং অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন কিন্তু ভবিষ্যাম এবেতি। সর্ব্বেশ্বরবজ্জীবানাঞ্চ ত্রৈকালিকসত্তাযোগিত্বাত্তদ্বিষয়কো ন

তাৎপর্য্যানুবাদ।

প্রতিপাদিত বহু চেতনের চেতয়িতা ত্রিজগতের সর্ব্ববিধ কামনার পূরণ কর্ত্তা, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আমি, এই আমার সহিত জীবের ভেদ নিত্য পারমার্থিক ভেদ। জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত ভেদ নহে। এই বিষয় প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! এই সর্ব্বেশ্বর ভগবান আমি যে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি কালে ছিলাম না, এমন নহে, কিন্তু আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, "পূর্ব্ব মেবাহমিহাসং" এই শ্রুতি আমার পূর্ব্ব কালের অবস্থিতির বিষয় ঘোষণা করিতেছে, "অজরো বিমৃত্যু" ইত্যাদি শ্রুতিও আমার অজরাত্বের ও বিগতনাশের বিষয় বলিয়া দিতেছে, সুতরাং পরবর্ত্তী কালেও আমি থাকিব। এইরূপ তুমি যে অর্জ্জুন অর্থাৎ তোমার যে জীবাত্মা আজ অর্জ্জুন আখ্যায় আখ্যাত হইতেছে এই আত্মা যে, কোন দিন ছিল না, তাহা মনে করিওনা, তুমিও ছিলে, আর এই যে সমুদয় রাজন্য বর্গকে অবলোকন করিতেছ ইঁহারাও যে ছিলেন না তাহা নহে। এবং ইহার পরবর্ত্তি কালে আমি তুমি বা ইহারা সকলে যে হইব না, তাহা নহে, আমরা সকলেই পুনরায় হইব। অতএব সর্ব্বেশ্বর জীব নিয়ন্তা আমার ন্যায়, জীবও পূর্ব্বে ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে, সুতরাং ত্রিকালেই যাহার সত্তা বিদ্যমান, এমন জীবের জন্য শোক করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারেনা।

যদি বল জীবের এই ভেদের কথা ভগবান্ যাহা বলিলেন, ইহা ব্যবহারিক দশায় অবিদ্যা বিজৃম্ভিত কল্পিত ভেদকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা কল্পিত মাত্র। অর্থাৎ যাঁহারা অবিদ্যা জন্য ভেদের কল্পনা করেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন "অজ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ জ্ঞান আবৃত হইলে বস্তুর যাথার্থ্যানুভব হয়না,

প্রাণের কথা।

—:০:—

প্রাণে যখন অভাব আসে, আপন পুরুষকার দ্বারা যখন সে অভাব যায় না, অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রচুর ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দ্বারা উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের নানাবিধ সেবা করিয়াও যখন প্রাণে শান্তি আসে না, সে অভাব মিটে না, তখন মানুষ সাধু-সঙ্গ খোঁজে, আপন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া কি করিলে সে অভাব নিবৃত্তি হয়, কি করিলে আধিব্যধি-প্রপীড়িত-সূচীভেদ্য অজ্ঞানান্ধকারে কর্ম্ম-তরঙ্গাভিঘাতে বিতাড়িত তাপিত প্রাণ শীতল হইবে তাহার জন্য ব্যাকুল হয়। আজকাল সমাজের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠবলিয়া, উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গরব করেন তাঁহাদিগের মধ্যেও এই অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিভূত বলিয়া অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই অভাব অনুভূত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত হওয়াও যে, মঙ্গল-রবি প্রকাশের শুভ পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই যে অভাব, এই যে হাহুতাশ ইহার নিবৃত্তির উপায় কি, তাহাই আলোচ্য। যোগ যাগ ব্রত তপস্যাদি নানারূপ কঠোর অনুষ্ঠানের কথা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সহজে এই হাহুতাশের নিবৃত্তি যে একমাত্র সাধু-সঙ্গ দ্বারাই হইয়া থাকে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে মহাপুরুষগণ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং বহু বহু দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলোপাখ্যান আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান শ্রীকপিলদেব স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন ;—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তিহৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ, আমার (ভগবানের) ভক্তগণের সহিত হৃৎকর্ণ-রসায়ণ যে আমার লীলাগুণ কাহিনী তাহা আলোচনা করিতে করিতেই ক্রমে ক্রমে আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হইবে। তাহা হইলে আর অভাব কোথায়? কাজেই এই সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তিকারী শ্রীভগবানে ভক্তি লাভের প্রধান উপায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। ভক্তি শাস্ত্র বলেন,—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তেন পরিজায়তে।"

অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারাই ভক্তি উপজাত হয়। কিন্তু আমরা আঘাত না পাইলে, প্রাণে অভাব না আসিলে ভগবদুপাসনাতো দূরের কথা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও করিতে চাহিনা। অগ্নিতে ঝাঁপ দিলে যে পুড়িয়া মরিতে হয় এটী জানিয়াও আমরা নানাপ্রকার অসৎ কর্ম্ম, নানারূপ অসৎ কামনা বাসনা রূপ ইন্ধন দ্বারা অগ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।

* * *

ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণে শান্তি দিতে, শান্তিশতক বলিয়াছেন,—

"অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বাবৃতবড়িশ মশ্নাতি পিশিতং।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালে জটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ! গহনো মোহ মহিমা॥"

অর্থাৎ, পতঙ্গ জানে না যে, পুড়িয়া মরার কি জ্বালা তাই সে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়, আর মৎস্য জানে না যে, যে মাংসখণ্ড সে আনন্দে আহার করিতেছে তাহার মধ্যেই তাহার প্রাণ সংহারক সুতীক্ষ্ণ বড়শি রহিয়াছে তাই সে লোভ-পরবশ হইয়া বরশি সহিত মাংসখণ্ড গিলিয়া আপন জীবন হারায়। কিন্তু মায়ার কি ভয়ানক ক্ষমতা, আমরা জানি যে, ভোগের বিষয়গুলি বিপদ পরিপূর্ণ, উহা ভোগ করিলেই সর্ব্বনাশ নিশ্চিত, তথাপি উহা ত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু সৎ-সঙ্গ দ্বারা যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন ঐ সকল অনিত্য বিষয় বাসনা, ভোগ লালসা দূর হইয়া শ্রীভগবানে প্রীতি জন্মে। আর একবার শ্রীভগবানে নির্ভরতা আসিলে অন্য কামনা বাসনা লইয়াও যদি ভগবদুপাসনা আরম্ভ করে তবে শেষে শ্রীভগবান নিজগুণে দয়া করিয়া তাঁহাকে নিজপাদপদ্ম দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা মিচ্ছাপিধানং নিজ পাদপল্লবম্।"

এইভাব হয় বলিয়াই, ধ্রুবমহাশয় প্রথমে রাজ্যৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিয়া শেষে যখন সেই পাদপদ্ম লাভ করিলেন তখন ভগবান তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেও তিনি আর বর লইলেন না, কারণ তিনি নিজ মুখেই আপন প্রাণের কথা ভগবানকে বলিয়াছেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসিস্থিতোহহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

অর্থাৎ, রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় তোমার তপস্যা আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রগণেরও অগোচর যে ধন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি এটী ঠিক যেন কাচ অন্বেষণ করিতে আমার দিব্যরত্ন লাভের ন্যায় হইয়াছে। সুতরাং হে স্বামিন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাহি না। অতএব দেখা যায় যে, শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দে একবার ভক্তির উদয় হইলে কামনা বাসনা আর হৃদয়ে স্থান পায় না, কেননা সকল কামনার সার মুক্তি পর্য্যন্তও তখন ভক্তের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

"যদি ভবতি মুকুন্দে ভক্তিরানন্দ সান্দ্রা।
বিলুণ্ঠিত চরণাব্জে মোক্ষ সাম্রাজ্য লক্ষ্মী॥"

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তের ব্যাধি ও বিপদ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র এম, এ, বি, এল।)

—:০:—

"যিনি, কৃষ্ণস্মৃতি হেতু দেহের অনয়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি মৃত্যু সংসার ধরম,
ভয়াদিতে কভু নাহি হন বিমোহিত,
যথার্থ ভকত তিনি, বুঝিবে নিশ্চিত।"

শ্রীপাষণ্ডদলনোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য।

"পড়্‌লে শুন্‌লে দুদুভাতো।
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥"

অস্মদ্দেশে যে সকল বিজ্ঞবাণী প্রচলিত থাকিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসমান জনসাধারণকে দিক্‌দর্শন করাইতেছে, উল্লিখিত বচনটী তন্মধ্যে অন্যতম। এবম্বিধ প্রত্যেক বচনই এক একটী বহু পরীক্ষিত সত্যের অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু নানাবিধ অজ্ঞাত ও জ্ঞাত কারণ প্রযুক্ত সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রমস্থল দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র বা জ্যোতিষ, শক্তি বিজ্ঞান বা রসায়ন, ন্যায় বা ব্যাকরণ সর্ব্বত্রই সাধারণ নিয়ম প্রায়শঃ ব্যতিক্রম বিহীন হয় না। তবে সে ব্যতিক্রম এত বিরল যে, তাহা দেখিয়া সাধারণ নিয়ম বিস্মৃত হইলে বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হয়।

উদ্ধৃত বিজ্ঞবচনটীও সম্পূর্ণ অব্যভিচারী নয়। উহারও ব্যভিচার মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যার্থী বহু সংযম, বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিলেন কিন্তু তাঁহার কপালে দুদুভাতো জুটিল না! পক্ষান্তরে জনৈক নিরক্ষর ব্যক্তি বুদ্ধিচাতুর্য্য-প্রভাবে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ দেখিয়া বিদ্যার্জ্জন নিস্ফল ও নিষ্প্রয়োজন এইরূপ ধারণা করা কি সমীচীন? না তাই দেখিয়া অভিভাবকগণ শিশুদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে বিরত হইবেন? কুলটার বহুবিত্ত ও প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার দর্শনে কোন্ সাধ্বী রমণী আপন নির্ধন পতিকে ত্যাগ করেন? কেহই নহে।

এইরূপ, অনেকে আশা করেন ভক্তিলাভ হইলে আত্মা, প্রাণ ও মনের সহিত দেহও চিরসুস্থ হয় এবং সাংসারিক আপদ বিপদও ঘটেনা। সুতরাং কোথাও কোন ভক্তের ব্যাধি বা কোনরূপ ক্লেশ দেখিলেই তাঁহাদের মনে নানারূপ সন্দেহ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহারা ভক্তিদেবীর উপর বীতানুরাগ হইয়া পড়েন। ইহজীবনসর্ব্বস্বতাই এইরূপ হইবার একমাত্র কারণ।

ভক্তি অনুশীলনকারী প্রত্যেকেই জানেন যে, মৃত্যুই জীবলীলার শেষ সীমা নয়। ঈশ্বরও যেমন অনাদি ও অন্তহীন, জীবও তেমনি অনাদি ও অন্ত বিহীন। জীবে ও ভগবানে পার্থক্য বা প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তা কখনই ভৃত্য ছাড়া নহে। সুতরাং যতদিন ভগবান আছেন ততদিন জীবও আছে। কাজেই মৃত্যু তাহার শেষ যবনিকা হইতে পারে না। উহা অঙ্কান্তর অভিনয়ের জন্য

পট পরিবর্তন মাত্র। অথবা ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী তীর্থযাত্রীর এক পান্থনিবাস হইতে অন্য পান্থনিবাসে গমন মাত্র। জীবের লয় নাই। কারণ, লয় হইলে শ্রীভগবানের লীলাচ্ছিন্ন করিবে কে ?

বিশেষ, ব্যাধি বা বিপদ চিৎস্বরূপ আত্মার হইতে পারে না। আত্মা অদাহ্য, অক্লেদ্য, অক্ষয়, অব্যয়, অজর অমর। সুতরাং যাঁহারা দেহকে আমি জ্ঞান করেন না, অর্থাৎ যাঁহারা দেহাত্মাভিমানী নন, তাঁহারা দেহের ব্যধি বা ক্লেশে অভিভূত হন না। ভক্তি তাঁহাদিগকে নিত্য সুস্থ-দেহীর সন্ধান দেখাইয়া দেয় এবং 'তরোরিব সহিষ্ণু' করিয়া ত্রিতাপ সহনে সমর্থ করে। ভক্তি, ভক্তকে ধীর ও বীর করে। কুষ্ঠী বাসুদেব, পুরী মাধবেন্দ্র, ব্রহ্ম হরিদাস, প্রভু নিত্যানন্দ, রূপ সনাতন, রঘুনাথ ও রামানুজ প্রমুখ মহাত্মাগণের নির্ভীক ও জীবন্মুক্ত চরিত্র আলোচনা করিলে ভক্তির যে কি মহিমা, তাহা পাঠক নিঃসংশয়িত রূপে অবগত হইতে পারিবেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে বিরত হইলাম।

বীরও হইব, যুদ্ধ ক্লেশও সহিব না একথা যেমন হাস্যোদ্দীপক ; ভক্তও হইব, সহিষ্ণুতার পরীক্ষাও দিবনা—একথাও ঠিক তদ্রূপ। যদি কোন তথাকথিত ভক্তের সহিষ্ণুতার অভাব দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার সাধনা এখনও সুপক্ক হয় নাই। সাধনা পূর্ণ হইলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। সে সাধনা কি ? না, প্রত্যহ নিজেকে ও নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত "গোপীজন বল্লভায় স্বাহা" বলিয়া সেই বিশ্বপতির পদ প্রান্তে সমর্পণ বা বিক্রয় করা। ভক্তের আমার বলিবার কিছুই নাই। আইনের ভাষায় বলিতে গেলে ভক্ত একজন বেনামদার মাত্র। ধনী সেই বিশ্বপতি, কিন্তু কি জানি কোন্ গূঢ় প্রয়োজন বশতঃ তিনি গুপ্ত আছেন ও ভক্তজনের নাম ব্যবহারে সকল কার্য্য চালাইতেছেন। কাজেই বিক্রীত গো অশ্বাদিতে যেমন কাহারও মমত্ব বুদ্ধি থাকেনা তেমনি হরি-পাদ-পদ্মে সমর্পিত দেহেও ভক্তের মমত্ব বুদ্ধি থাকে না। ভক্তের আহার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ সকলই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার কার্য্য সাধন জন্য, আর সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার নাম যশ কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তের নিজের কার্য্য জগতে অন্য কিছুই নাই।

ভক্ত জানেন গোবিন্দ দর্শন পাইতে গোপীগণকেও তীব্রতাপধূতাশুভা ও ক্ষীণমঙ্গলা হইয়া প্রক্ষীণ-বন্ধনা হইতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে যে তাপ

পাইতে হইবে ইহা অণুমাত্রও অদ্ভুত নয়। তাহাতে কাতর হওয়া দূরে থাকুক তদ্দারা আনন্দধাম ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে এই ভরসায় তিনি আনন্দিতই হইয়া থাকেন।

এই সকল তত্ত্বের সন্ধান যাঁহারা পান নাই, যাঁহারা এই অতিক্ষুদ্র, না, না, নগণ্য জীবনকালকে সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন এবং নিরন্তর পরিবর্ত্তনপূর্ণ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহাদের নিকটে ভক্ত জীবনের ক্লেশ বা ব্যাধি ভক্তি-সাধনার অন্তরায় হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? পরন্তু পঠদ্দশায় সামান্য সামান্য আয়াসের ভয়ে যে বালক অধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হয় তাহাকে মন্দধী ও মন্দভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যাহারা সুধী তাহারা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' পণ করিয়া পড়াশুনায় রত হয়। আর যাঁহারা ভক্তির বিমল আনন্দ লাভেচ্ছুক তাঁহারা "যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শান্তিসুখে ইহ সংসারে বিচরণ করেন।

সে যাহা হউক, ভক্তের ব্যাধি বা ক্লেশ হয় কেন? কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ভক্তি তাঁহাকে রক্ষা করেন না কেন? এ বড় গুরুতর প্রশ্ন, যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভক্তির পথ কুসুমাকীর্ণ হয় না কেন? কিন্তু পাঠক! আপনি জানেন কি, কোন্ পথ কেবল কুসুমময়, কোন্ পথে আদৌ কণ্টক নাই? যাঁহার এই রচনা, যাঁহার এই বিশ্বলীলার বিলাস-কানন তিনিই জানেন কেন আনন্দের পথে পরীক্ষা থাকে!

আমরা এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি ও পুরাণাদিতে দেখিতেছি যে, ভক্তি অর্থে বাহ্য সুখে সন্তরণ করা নয় বা ক্ষণমাত্রস্থায়ী অবসাদকর আমোদ প্রমোদে হাবুডুবু খাওয়া নয়; প্রাকৃত দুঃখ দুর্দ্দশার কঠোর কশাঘাতে আদৌ ম্রিয়মাণ বা মুহ্যমান না হইয়া একান্ত মনে দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রীভগবানের পদারবিন্দের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আদিষ্ট বা অভীপ্সিত কর্ম্মে রত থাকা ও তাঁহার নাম-যশ-গুণ-কীর্ত্তনে নিরন্তর পরমানন্দ অনুভব করাই ভক্তি। পৌরাণিক ধ্রুব প্রহ্লাদ হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা জগজ্জন বিদিত জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, কবীরাদি ভক্তচরিত্র স্পষ্টাক্ষরে ইহাই প্রমাণিত করিতেছে।

আমার পতি খুব উপায়ক্ষম, আমার কোন দ্রব্য চাহিতে হয় না, চাহিবার পূর্ব্বেই পাই, আমি আমার পতিকে বড় ভালবাসি। এ ভালবাসা বড়? না, আমার পতির তাদৃশ উপায় ক্ষমতা নাই, আমাদের সর্ব্বদাই অভাব, কিন্তু আমার হাতের লোহা ও সীঁতার সিন্দুরের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই আমি সকল অভাব ভুলিয়া যাই, প্রাণ উৎসবে মগ্ন হয়, এ ভালবাসা বড়?

"পড়িলেও মহাক্লেশে ক্লেশবে যে ভক্তিমান।
যাঁরমতি অবিচ্যুত সেই সে ভক্ত প্রধান॥"

ব্যাধি বা বিপদ বহির্ম্মুখকে বীতশ্রদ্ধ করিতে পারে কিন্তু অন্তর্মুখীন ভক্তকে আদৌ অবসন্ন বা উদাসীন করিতে পারে না। পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী তাঁহার সাক্ষ্য। কুন্তী বলিয়াছিলেন "হে কৃষ্ণ! আমার বিপদ লাগিয়া থাকুক, কারণ বিপদে তোমার স্মরণ ও দর্শন লাভ হয়, আর তোমাকে পাইলে বিপদ সম্পদে, শোক সুখে ও বিষাদ উৎসবে পরিণত হয়।"

এইভাব যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সে সকল সদাচার সম্যক্ পালন করিতে পারেন তাঁহাদিগকে অধিক তাপ ভোগ করিতে হয় না, অথচ ধীরে ধীরে বিশুদ্ধি লাভ করিয়া আনন্দময় গোবিন্দ দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এখন দেখা যাউক ব্যাধি বা বিপদের কারণ কি, কারণ—ভক্তি হীন জীবনেও যা, ভক্তিমান জীবনেও তাই, কোন প্রভেদ অনুভূত হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন বা পৈতৃক রোগাদি হেতু ব্যাধি ঘটে। কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট অভ্যাস থাকায় ভক্তগণের রোগ প্রবণতা অনেক কমিয়া যায় এবং সাত্ত্বতগণ প্রায়ই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। আর অমনোযোগিতা, অবিবেকিতা প্রভৃতি বহুবিধ দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কারণ বশতঃই বিপদ্পাত হয়। এ বিষয়ে ভক্তে ও অভক্তে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। একই নিয়মে জগৎ শাসিত হয়। পুলিশের কর্ম্ম করেন বলিয়া কেহ কি দণ্ড বিধির বহির্ভূত হইতে পারেন?

কিন্তু ফলের প্রভেদ বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। অভক্ত যে কারণে জীবনকে ঘোর অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলেন, ভক্ত ঠিক সেই কারণে কেবল যে কোন অশান্তির সৃষ্টি করেন না তাহা নহে, বরং সে অবস্থায় ভগবৎ স্মরণের অধিক সুবিধা এবং

কোন না কোন ভাবী মঙ্গলের সূচনা আশা করিয়া ঐ অবস্থাকেও দুঃখের কারণ মনে করেন না। তিনি "দুঃখে স্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ॥"

পাঠক! যদ্দারা আপনার হৃদয়ে সকল অবস্থাতেই অভয় ও বিমল আনন্দ বর্ত্তমান থাকে সে মূল্যবান জিনিস, সে হরিভক্তি মানব জীবনে যে কত প্রয়োজনীয় তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে?

ভক্তগণ স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য যত না ব্যস্ত, আত্মসুখ বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যত না মনোযোগী, জীবের কল্যাণ সাধনে, আর্ত্তের দুঃখ মোচনে, জগতের হিতবিধানে তদপেক্ষা অধিক প্রয়াসী। সুতরাং অনেক সময়ে তাঁহাকে দেহ গেহাদি স্বার্থসুখ বিস্মৃত হইতে হয়, স্বাস্থ্যের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিতে হয়। কাজেই সেরূপ অমিতাচার সহ ধাতু না হইলেই পীড়া উপস্থিত হয়।

আর বিপদ! ভগবৎপদে যাঁর মতিস্থির আছে তাঁর আর বিপদ কি? হইলেও ভক্ত তাহাতে আদৌ ধৈর্য্যচ্যুত হন না। তিনি বিপদকেও পরম মিত্র জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, কাহারও প্রতি দ্বেষ বা প্রতি হিংসা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিতে ভক্ত হওয়া যায় না।

সকলই ভগবদিচ্ছায় হয়, সে ইচ্ছায় জীবের কল্যাণই একমাত্র লক্ষ্য থাকে এই স্থির বিশ্বাসে ভক্ত বিপদকে সাধারণ জীবের ন্যায় দোষাবহ ও অশুভাকর জ্ঞান করেন না।

ফলতঃ যথার্থ ভক্তের হৃদয়ের অন্তস্তলে অবিরত যে এক বিমল সুস্নিগ্ধ আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার সন্ধান অভক্তগণ না পাওয়াতেই বাহিক বিপদ বা ব্যাধি দেখিয়াই ভক্ত ও অভক্তের জীবন একরূপ মনে করেন। কিন্তু শাস্ত্রদর্শী সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বলিতেছেন :—

"প্রাকৃত দেহেতে হয় রোগাদি যেমন।
ভক্ত দেহে সেইরূপ করিয়া দর্শন॥
প্রাকৃত করিয়া ভক্তে কভু না দেখিবে।
ভক্ত দেহ অপ্রাকৃত সর্ব্বদা মানিবে॥
মনোযোগে শুন কহি ইহার যে মর্ম্ম।
শরীরে যে দোষ হয়, সে শরীর-ধর্ম্ম॥

বুদ্‌বুদ পঙ্ক আদি জলমাত্রে হয়।
ইহা বলি কূপ গঙ্গাজলে তুল্য নয়॥

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর উপদেশামৃত।

ভক্তি হইলেন গঙ্গাজল। তাহাতে ব্যাধি বিপদরূপ পঙ্ক বুদ্‌বুদ থাকিলেও বিষ্ণুপাদ সম্পৃক্ত বলিয়া তাহা কেবল পবিত্র আনন্দেরই কারণ হয়। উহা বিষ্ণুপাদ পদ্মের গুণ।

যদি কোন স্থানে উত্তম সঙ্গীত হইতে থাকে সে স্থানে যে যায় সে-ই আনন্দ পায়। তাহার জীবনে নানা ক্লেশ বা চিন্তা থাকিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ সে সেই সঙ্গীত-সভায় উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সেসকল চিন্তা বা ক্লেশ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সেইরূপ বিষ্ণুপাদ পদ্মের এমনই পবিত্র আনন্দময় গুণ যে, তাহাতে জন্তুই হউক বা মানুষই হউক যে-ই অকপটে মগ্ন হয় সে-ই পবিত্র ও আনন্দিত হইয়া উঠে।

ব্রহ্মা নিজপুত্র নারদকে বলিয়াছিলেন,—

"সে অনন্ত ভগবান দয়া করে যারে।
সে যদি কাপট্য ছাড়ি' পদতরি ধরে॥
তবে সে দুস্তর মায়া সিন্ধু পার হ'য়ে।
তাঁর তত্ত্ব জানি সদা থাকে সে অভয়ে॥
পঞ্চভূত ময় দেহে না থাকে মমতা।
অনন্তের অংশ ভাবি' নাহি পায় ব্যথা॥"

তাই বিনীতভাবে বলিতে হয়, পাঠক পাঠিকাগণ? সত্বর হরি চরণারবিন্দে রত হউন। সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবেন। শত্রু মিত্র হইবে, গরল অমৃত হইবে, দৈন্য সুখের আকর হইবে, সকল ভয় দূর হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অনেকে মনে করেন, কি ভক্ত কি অভক্ত মানব মাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করে। যতদিন মানব নিজেকে কর্ত্তা মনে করিবেন ততদিন উহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যখন হইতে মানব আপনাকে ভগবদ্দাস রূপে দেখিবেন তখন হইতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান লোপ পাইবে সুতরাং কর্ম্ম থাকিবে না। বাস্তবিকই যদি আমরা আপন আপন

কর্ম্ম বলে ভাল বা মন্দ হইতে পারিতাম তাহা হইলে ভগবৎ কৃপার আবশ্যক আদৌ থাকিত না। প্রকৃত কথা তাহা নয়। কারণ,—

আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ কৃপা বিনা এক বাঞ্ছা নাহি পুরে॥"

অখিল-পূজ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধে স্পষ্টই ঘোষিত হইয়াছে যে, "সুখ ও দুঃখের মূল কর্ম্মই নাই।" শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত শ্রীব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে,—"কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি, কিন্তু চ ভক্তি ভাজাং" অর্থাৎ ভক্তিমান ব্যক্তির সকল কর্ম্ম ভগবান নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া থাকেন।

পাঠকগণ! ব্যাধি ও বিপদের কারণ, ভক্ত ও অভক্তের পক্ষে এক, এইরূপ যাহা বর্ণিত হইল তাহা সাধারণ ভক্তগণ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। শ্রীভক্তমালাদি বহুবিধ ভক্তি-গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, অসাধারণ ভক্তগণ প্রাকৃতিক নিয়মাদির বহির্ভূত। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, ভক্তি নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ হইলে জীব বহু দুরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যু-সঙ্কুল বিপদ হইতে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষিত হইয়া থাকেন। শ্রীগ্রন্থ আলোচনা করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আবাহন কি বিসর্জ্জন?

(লেখক—স্যার স্বামী যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ)
(কে, সি, এস, আই।)

—:•:—

কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দেবার্চ্চনা প্রভৃতি দৈব কর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগের অধীন থাকিয়া, যোগী ঋষি মহাপুরুষগণ যোগানুষ্ঠানাদি দ্বারা সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অতি পবিত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ভারতমাতার এই সকল সুসন্তান অবিরত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ও অসৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়া, পূর্ব্বাপর জগতের উন্নতি বিধান

করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে, তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজ কাল অনেকেই শাস্ত্রাদেশ মানিয়া কার্য্য করিতে চায় না। অধুনা অধিকাংশ লোককেই বিপথগামী হইতে দেখা যায়। শাস্ত্রোক্ত কার্য্য কলাপাদির যথাবৎ নিয়ম পরিপালন করিয়া, এখন আর কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। পূজা, জপ, তপাদির কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে যে সকল দ্রব্যের আয়োজন বিশেষ আবশ্যক, তাহাও আজ কাল ঠিক ঠিক পাওয়া যায় না। বাজারের ভেজালের কৃপায় হোমের আসল দ্রব্য ঘৃত, একবিন্দু খাঁটি পাওয়া দুষ্কর। আবার ঐরূপ দৈব কার্য্যাদির অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতিও খাঁটি নাই। তাহাতেও ভেজাল চলিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের ভারতমাতা দিন দিন দীনা, হীনা, মলিনা ও পরিক্ষীণা হইয়া, আমাদিগকে রক্ষা করিবার শক্তি হারাইতেছেন। আমরা এখন দুঃখিনী মাতার দুঃখী সন্তানের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইতেছি। মহারাজ দশরথ, তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া, যজ্ঞ করিবার পর দেবরাজ প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। আর আজ পৃথিবীতে কোন দৈব দুর্ব্বিপত্তির আবির্ভাব হইলে তাহার প্রতিকার জন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইতে যজ্ঞ দ্রব্যাদি সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ অভাব অনুভব করিতে হয়। সুতরাং প্রতিবিধান হওয়া ত দূরের কথা। অতএব এই সকল পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ কি? কেন এমন হইল? কেন এমন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া আমাদিগের এইরূপ নানাবিধ দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির আবির্ভাব হইল? কে আমাদিগকে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া সুস্থ ও শান্ত করিবে! যাহাকেই এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিব, সে-ই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিবে। বরং অনেকে আবার এ সকল কুসংস্কার রাশির আলোচনার আবশ্যক নাই বলিয়া আমাদিগকে উল্টা উপদেশ প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে। তাই বলি ভারতমাতার এখন বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। প্রকৃত সদুপদেশ কেহই গ্রহণ করিতে চাহেনা। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই সকলকে নিজ নিজ উপদেশ দানে আপনদলের পুষ্টি সাধন করিতে অভিলাষী। এই সকল ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া, আজ দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাই আজ "আবাহন কি বিসর্জ্জন" বিষয়ে আলোচনা

করিতে বসিয়াছি। আশা আছে, সেই বিশ্ববিধাত্রী, করুণাময়ী, জগদ্ধাত্রী মা, আমার মনোমধ্যে উদয় হইয়া, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইবার জন্য যুক্তি যুক্ত সমালোচনা দ্বারা আধুনিক হিন্দু সমাজের মঙ্গলের উপযোগী বিষয়গুলি মাদৃশ অধম ব্যক্তির লেখনী সাহায্যে প্রকাশ করিবেন. আজ সেই ব্রহ্মময়ী মা মঙ্গলচণ্ডীর আদেশ-ই মদীয় লেখনীমুখে প্রকাশিত হইবে মাত্র। বহুদিন হইতে আমি আবাহন ও বিসর্জ্জন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া, আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলতায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বোধ হয় মায়েরই ইচ্ছায় তাহা প্রকাশ করিতে বা বিচার করিতে সামর্থ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আবার সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই আজ সহসা লেখনী পরিচালনা করিতে বসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

মহামুনি বাল্মীকি, বেদব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, বশিষ্ঠ, নারদ, মরীচ, অত্রি, হারীত, উশনা, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বৃহস্পতি, শিব, বিষ্ণু, অষ্টাবক্র, ঘেরণ্ড, কপিল, জৈমিনী, পতঞ্জলি প্রভৃতি পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি উপনিষৎ, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক, সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতাগণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা আমাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা সেই সকল সংশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তাহা হইতে প্রকৃত মর্ম্মার্থ ও তাৎপর্য্যাদি গ্রহণে যদি সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমাদিগের আজ এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। অনেকে, সময়ে সময়ে এই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থ প্রণেতাগণকে ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা যেন সবজান্তা ভাবে ঐ সকল মুনি ঋষি ও দেবতাদিগকে অতি হেয় ও নগণ্য জ্ঞানে আপনাদিগের অহংকারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু যেদিন অসংখ্য দাসদাসী ও আত্মীয় স্বজনগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতাবস্থায় থাকিয়াও রবিসুত কিঙ্করগণের হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমন রাজার বার দেশে উপনীত হইবেন, সেইদিন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিবে। মহাকালীর খরধার অসি দর্শন না করিলে বর্ত্তমানে এই সকল ব্যক্তির জীবন্তে চৈতন্য সঞ্চারের আর ত উপায় দেখিতে পাইনা। এই দুর্ম্মতি পামরগণ পূজা অর্চ্চনাকেও বর্ব্বরতার কার্য্য বলিয়া, উল্লেখ

করিতে পশ্চাৎপদ নহে। ইহারা এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও সেই সকল প্রতীচ্য জাতির পরলোক বিশ্বাস বা ঈশ্বর ভক্তি পরায়ণতা দর্শন করিয়াও আপনাদিগের কুসংস্কার বিদূরিত করিতে প্রয়াস পায় না। সুতরাং ইহাদিগের মানব জন্মে ধিক্! ইহারা যে কেন গোকুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, আমি তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। অথবা এইবার অবশ্যই ইহাদিগকে গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এতক্ষণ একদল চার্ব্বাক মতাবলম্বী নাস্তিকের শাস্ত্র অবিশ্বাস প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে সমাজের আর একদল ভণ্ড, পাষণ্ড, অকাল কুষাণ্ডের স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহারা আবার দেব দেবীর পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃত বিধি বোধিত ভাবে দেব কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে রত হইয়া, সাত্বিক ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা না করিয়া স্বেচ্ছাচারী ভাবে কেবল তামসিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মাত্রকে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে।

সামাজিক পুরোহিতগণ কখনও যে স্বেচ্ছাকারী হইতে পারে না, ইহা তাহাদিগের যেন আদৌ স্মরণ থাকে না, অথবা স্মৃতি পথে জাগরূক থাকিলেও ঐ পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্ত্তী হইয়াই যেন তাহারা তাহাদিগের কর্ম্মকাণ্ড অযথাচরণে পণ্ড করিয়া, প্রকৃত দৈবকার্য্যের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে। অবশ্য যাঁহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন—যাঁহারা স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা এই অখণ্ড বিশ্বচরাচরে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, এই নিখিল সংসারে যাঁহাদিগের মায়া মমতাদির চিহ্নমাত্রও নাই, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইলে ক্ষতি নাই। বরং শাস্ত্র উহাই তাঁহাদিগের পক্ষে বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং সংহার কর্ত্তা মহাদেব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন :—

"কিংতস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচার বিধিঃস্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির তান্ত্রিক আচারই বা কি বৈদিক আচারই বা কি, তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারই বিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ মহাপুরুষগণ পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তির জন্য মনো মধ্যে কোনরূপ বাসনা না রাখিয়া,

সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ মহাপুরুষগণকেই জীবন্মুক্ত বা পরমহংস বলা যায়। ইহাঁরা হংসের নীর পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষীর গ্রহণের ন্যায় সমল অন্ন বা পাপান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যান্ন গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ইহাঁদিগকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তাই ইহাঁরা পরমহংস নামে খ্যাত। ইহাঁদিগের পবিত্র করস্পর্শে সমল অন্ন ও অমল হইয়া যায়। ইহাঁরা কোন দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিলে সেই মূর্ত্তিতে দেবতার অধিষ্ঠান ও দৈবশক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রও বলেন ঃ—

"অর্চ্চকস্য তপোযোগে তদর্চ্চনস্যাতিশয়েনাৎ।
অভিরূপ্যচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি॥"

অর্থাৎ, অর্চ্চকের তপস্যার প্রভাব, অর্চ্চন-দ্রব্যের বাহুল্য এবং মনের মত দেবমূর্ত্তি হইলে সেই মূর্ত্তিতে দেবতার সন্নিধি (অধিষ্ঠান) ঘটিয়া থাকে। আর পরমহংসের কর স্পর্শে অপবিত্র অন্ন পবিত্র হওয়ার সম্বন্ধেও শাস্ত্র বলিতেছেন :—

"যদিস্যান্নীচ জাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥"

অর্থাৎ, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শ্রীমন্মহাদেব বলিয়াছেন যে, যদি নীচ জাতীয় অন্নও ব্রহ্মকে নিবেদিত হয় তবে তাহা বেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণও গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার পর পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

"জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যো প্রসাদে পরমাত্মনি।
যোহশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥"

অর্থাৎ, পরমাত্মার প্রসাদে জাতি ভেদ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অপবিত্র বোধ করে, সে মহাপাতকী হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনেও বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ।"

অর্থাৎ, অন্নের অভাবে প্রাণাত্যয়ে কালে সর্ব্বান্ন ভক্ষণের আজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বলিয়াছেন :—"অবাধাচ্চঃ"

অর্থাৎ, আপৎকালে সর্ব্বান্নভোজন জ্ঞানীর পক্ষে দোষ নহে। তাহার পর এববিধ মুক্ত পুরুষদিগের সংস্পর্শে সমস্তই পবিত্র হয় তাহার প্রমাণ ও মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র শাস্ত্রে দিতেছেন :—

"অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥
কিরাত পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দাঃ যবনাঃ খলাঃ।
শুদ্ধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ॥"

অর্থাৎ, যাঁহাদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অশুচি শুচি, অস্পৃশ্য স্পৃশ্য (স্পর্শ যোগ্য) এবং অভক্ষ্য ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে যাঁহাদিগের সংস্পর্শে কিরাত, পাপী, ক্রূর, পুলিন্দ (ম্লেচ্ছ জাতি বিশেষ) যবন ও খল ব্যক্তিরাও পবিত্র হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহাকে অর্চ্চনা করিবে? অতএব বেশ বুঝা গেল যে, এই সকল মহাপুরুষ দেবতার ন্যায় এই মহীমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশার্থই ইহাঁরা স্বেচ্ছায় আহার বিহারাদির অনুষ্ঠানে রত হয়েন মাত্র; নতুবা ইহাঁদিগের আসক্তি বা অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয় না। শোক, মোহ, মায়া, মমতা প্রভৃতি ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অর্থাৎ ইহাঁরা ইহ সংসারে মায়া মমতাদির অধীন নহেন পরন্তু স্বাধীন ভাবে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায়ে অর্থাৎ জন্মান্তর নিবৃত্তি হেতু কামনা রূপিনী কামিনী ও বিষয়রূপ কাঞ্চন হইতে দূরে থাকিয়া, প্রজ্জ্বলিত প্রবল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্মরূপ কাষ্ঠরাশি ভস্ম করিয়া ফেলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন যে, :—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এধাংসি (ইন্ধন বা কাষ্ঠরাশি) ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। অতএব পুনঃ পুনঃ যাতায়াত নিবৃত্তি করিতে হইলে, কর্ম্মসকল দগ্ধ করিয়া ফেলা চাই। রজক মুখ নিঃসৃত "দিনত আখের হয়া বাসনা জ্বালায় দেও" এই কথাটী প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবু ঠিক এই অর্থেই গ্রহণ করিয়া, বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হইয়া, মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে আপনাকে চরিতার্থ

জ্ঞানে পুলকিত হইয়াছিলেন। শুভক্ষণে ঐ কথাটী তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাই তাঁহার কর্ম্ম করিবার বাসনা একেবারে নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ নিবৃত্তিই স্বরূপ সিদ্ধির একমাত্র সোপান। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যবলেই এইরূপ নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। লালাবাবুরও অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধনা অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল, তাই এ জন্মের পূর্ব্বভাগে তিনি বিষয় বাসনানুরাগী থাকিলেও ঐ একটী দিনের সামান্য কথাই তাঁহার নিকট পরমার্থ-ভাবের উদ্দীপন করিয়া দিয়া, তাঁহাকে দিব্য ধামে পৌঁছিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। এই লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া ভিক্ষোপজীবী হইয়া, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য দীন ভাবে ভক্তিযোগ সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ইনি বাসনা পরিশূন্য হইলেও অদ্বৈত জ্ঞান লাভে অসমর্থ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষদিগের স্থলাভিষক্ত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত পরমহংসগণের কর্ম্ম নিবৃত্তি জন্যই তাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা আর তাঁহা-দিগের অন্তরে স্থান পায় না। তাঁহারা একেবারে ক্লেশের হেতু বাসনা রাশিকে ভস্ম করিয়া ফেলেন। তাই পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্রের সাধন পদের ১২শ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে:—

"ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।"

অর্থাৎ, ক্লেশ মূলক কর্ম্মাশয় (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ) দৃষ্টাদৃষ্ট, দৃষ্ট (ইহ) ও অদৃষ্ট (পূর্ব্ব ও পর) জন্ম, বেদনীয় ((ভোগ্য)। ইহ জন্মের অথবা জন্মান্তরের কৃত কর্ম্মাশয় সকল ক্লেশ মূলক। কর্ম্ম সঞ্চয় মাত্রই ফল ভোগের কারণ। আর ঐ ফল ভোগই দুঃখ। এ জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম সমস্তই যে এ জন্মে ভোগ হইবে তাহা নহে; পরন্তু জন্মান্তরে অবশিষ্টটুকু ভোগ হইবেই হইবে। জন্মান্তর বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তাই এ বিষয়ের আর অধিক বিস্তার না করিয়া আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত হইলাম। অর্থাৎ এক্ষণে দেখা গেল যে, মুক্ত পুরুষগণ বারংবার গর্ভ যন্ত্রণা রূপ নরক ভোগ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমূলে বাসনার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। কারণ গর্ভ যন্ত্রণাই যে নরক ভোগ সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার যুক্তিও শাস্ত্রে দেখিতে পাই। মণিরত্নমালা বলিতেছেন:—

"স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ।"

অর্থাৎ, স্বীয় অদৃষ্ট বশে পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের নামই সংসার। আর শরীর কি? তাহার উত্তরে বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন :—

"মাংসাসৃকপূর্‌য়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।

দেহেচেৎ প্রীতিমান্মূঢ়ো নরকে ভবিতাপিসঃ॥"

অর্থাৎ, দেহ বলিতে কেবল মাত্র মাংস, রক্ত, পুঁষ, বিষ্ঠা ও মূত্রাদির সংহতি (সমষ্টি) মাত্র একটা পদার্থই বুঝা যায়। অতএব তাহাতে আর নরকে প্রভেদ কি? শ্রুতিতেও ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

"নস পুনরাবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ, আত্মাকে জানিতে পারিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় এবং সেই ব্যক্তির আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাঁহার জন্মান্তর নিবৃত্তি বা নরক ভোগের অবসান হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের অধীন হইতে একান্তই অনভিলাষী। এই সকল তত্ত্বকথার বিচার করিতে যাইয়া প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আমি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি পূর্ব্বে যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাই এক্ষণে সেই বিষয়টীর উল্লেখ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই সকল মহাপুরুষ যে প্রতিমা বা দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করেন, তাহা দৈব শক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ মহাপুরুষ আজকাল কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? আজ কাল নিত্য কদাচারী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই সকল দৈব কর্ম্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি কতটুকু দৈবশক্তির বিকাশ দেখাইতে পারে? ইহারা পূজা করিতে জানে না; কিন্তু বিসর্জ্জনে আনন্দানুভব করিয়া থাকে। পূজা বা আবাহন করিতে পারে না; কিন্তু পূজার দিন হইতেই বিসর্জ্জনের বন্দোবস্ত করিতে থাকে।

"আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।

বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥"

এই বলিয়া, আপনাদিগের কৃত কর্ম্মের দোষ ক্ষালন করিয়া লয় মাত্র। ইহাদিগের যদি বিন্দুমাত্রও কাণ্ড জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে ইহারা অবশ্যই ভীত

বিহ্বল চিত্তে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার পূজায় রত হইত, তাহা হইলে কোন গতিকে তাড়াতাড়ি পূজা সারিয়া লইয়া, ভগবানের সাক্ষাতে দেব মন্দিরে পবিত্র হোম-ধূম, ধূপ ধুনার ধূম, পুষ্পচন্দনাদির নানাবিধ সৌগন্ধে দেবতাদিগের আনন্দ বর্দ্ধনান্তে সেইখানে বসিয়াই আবার নিঃসঙ্কোচে তামাকুর ধূম প্রদান করিবার জন্য ঐ প্রকার ধূমপানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। অধুনাকাল এইরূপ তামসিক পূজারই অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র দেখা যায়। প্রকৃত সাত্বিক ভাবে পূজা বা অর্চ্চনা আজ কাল হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে দেবতাদিগের পূজার্চ্চনাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং যেখানে দেবতাদিগের চরিত্র কথার আলোচনা বা সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে ধূম পান একেবারেই নিষিদ্ধ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্ব্বাচীন কৌতুকপ্রিয় তমগুণান্বিত পুরোহিতগণ অহংকারে মত্ত হইয়া, এই সকল আদেশ প্রতিপালন না করিয়া, অবহেলাই করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহার অবস্থান স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া, নারদ মুনিকে বলিয়াছেন :—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

অর্থাৎ, হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করিনা, যোগীদের হৃদয়েও থাকিনা; কিন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম গান করে, আমি সেই খানেই অবস্থান করিয়া থাকি। কিন্তু আজ কাল হরিসভায় হরিকথা বা হরিনাম শ্রবণ করিতে গিয়া, অগ্রে তামাকের জন্যই অনেকে ব্যাকুল হইয়া পড়েন ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। সুতরাং সভায় সম্পাদকগণকেও সভার অন্যান্য বিষয়ের ফর্দ্দ করিবার সময় অগ্রেই হুঁকা কলিকা ও তামাকের ফর্দ্দ করিতে হয়, এবং সভাস্থ সভ্যবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য অহরহ তামাক যোগাইতে হয়। আবার অনেকেই হয়ত বিড়ী বা চুরুট প্রভৃতি ধরাইয়া, আপনাদিগের ধূমপান পিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য হুঁকা কলিকায় করিয়া তামাক আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতেই, মুখাগ্নি করিয়া বসে। আজ কাল রুচি এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া, প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানী পুরুষগণকে মর্ম্মাহত হইতে হয়। তাহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেও দেখিয়াছি। অতএব এই সকল বিধি ইহারা

কোন্ শাস্ত্রে খুঁজিয়া পায় তাহাও জানিনা। আবার সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ তাহার দোষ গুণ যথাযথ যুক্তি সহকারে অস্মাদিগকে বুঝাইয়া দিতে যাইলে তাহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকে এবং যেন উহা তাহাদিগের নিকট অগ্রাহ্য বলিয়াই বিবেচিত হয় এই ভাব তাহারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়। অবশ্য কতকগুলি লোক আবার উক্ত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিয়া, স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্পই দেখাযায়।

আজ কাল বারইয়ারি পূজায় ও অনেক গলদ দেখিতে পাওয়া যায়। বারইয়ারি কাণ্ডের পাণ্ডাগণ দেবতার পূজার আয়োজনে যত আগ্রহ প্রকাশ না করে, ততোধিক তাহাদিগের নাচ তামাসা প্রভৃতির আমোদোৎসব সম্পাদনের জন্যই হইয়া থাকে। বাই নাচ, খেমটা নাচ, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতে যত টাকা ব্যয় করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ ও দেবতার পূজাদিতে বা দীন দুঃখীদিগের দুঃখ মোচনের জন্য কাঙ্গালী ভোজন বা দরিদ্র নারায়ণের সেবায় ব্যয়িত হয় না। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কি বুঝিতে পারা যায় না যে, ইহারা আমোদ আহ্লাদেই অধিকতর অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে? এই সকল অন্তঃসার শূন্য হৃদয় হীন ব্যক্তিগণ বারইয়ারি প্রতিমা পূজার জন্য কোন স্থানে একমাস দুইমাস এমন কি তিন চারিমাস পর্য্যন্ত কেবল মাত্র একটী ঢাক ও এক কাঁসী অথবা কেবল মাত্র কাঁসর ঘণ্টা লাগাইয়া রাখে; কিন্তু বিসর্জ্জনের দিন ইংরাজী বাজনা, জয়ঢাক কাড়ানাকড়া, বাই নাচ, খেমটা নাচ রঙ্গ তামাসা প্রভৃতির আয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, শেষে সেই সোণার প্রতিমা নদীজলে নিমজ্জিত করিয়া, পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যেন ইহারা ইহাতেই চতুর্ব্বর্গ লাভ করে। অতএব বলিতে পারিনা কি যে, ইহারা পূজা করিতে চায়না; কিন্তু বিসর্জ্জন করিতেই অভিলাষী ও কেবল মাত্র লোকতঃ পূজার ভাণ মাত্র করিয়া, অজ্ঞ নর নারীর নিকট হইতে প্রণামী আদায় করিয়া থাকে? তাহার পর আর একটী কথা এই যে, কাম্য পূজায় অর্থাৎ দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি পূজায় বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সম্বৎসর পরে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, বিদায় দিবার ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবি! গচ্ছদেবি! যদৃচ্ছয়া।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥"

অর্থাৎ, হে মহাদেবি! তুমি এক্ষণে গমন কর, গমন কর। হে দেবি! এক্ষণে যদৃচ্ছা গমন কর। কিন্তু সম্বৎসর পরে আবার আগমন করিও। এই বলিয়া ভক্ত-সাধক সজল নয়নে কাতর প্রাণে মাকে বিদায় দিয়া থাকেন। আশ্বিন মাসে শরৎকালে যে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে, সেই পূজায় স্বয়ং দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধার্থ বর গ্রহণান্তে দেবীকে ঐ বলিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। তাই আজ পর্য্যন্ত পঞ্জিকাকারগণ উক্ত দুর্গা পূজায় বিজয়ার দিন স্ব স্ব পঞ্জিকায় "শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই শ্রীরামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া বার-ইয়ারি উপলক্ষে আবাহন করনানন্তর তিন চারি মাস পূজা করিয়া, শেষে বিসর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা কোন্ শাস্ত্রে আছে, তাহা কি উক্ত বারইয়ারির পাণ্ডাগণ আমাকে বলিয়া দিতে পারেন? এইরূপ বারইয়ারির মধ্যে সাঁত্রা-গাছীর রামরাজা পূজা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহুকাল হইতে উক্ত রামরাজা পূজার অনুষ্ঠান সাঁত্রাগাছীতে হইয়া আসিতেছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার আমি তথায় উপস্থিত হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বিসর্জ্জন না করিয়া, চিরকালের জন্য তাঁহাকে রাখিয়া দিয়া, সাঁত্রাগাছীকে দ্বিতীয় অযোধ্যা পুরীতে পরিণত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা আরম্ভ হইত ও ক্রমান্বয়ে চারিমাস কাল প্রতিমা রাখিয়া দিয়া, নাচ তামাসাদি আমোদের চূড়ান্ত করিয়া, মহাসমারোহের সহিত গঙ্গা জলে বিসর্জ্জন করা হইত। সেবার আমি উক্ত প্রতিমা পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় না করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমী তিথিতে করা উচিত এমতও প্রকাশ করিয়াছিলাম। আর বাকসাড়ায় যাইয়া, নবনারী কুঞ্জরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিও বারমাস রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আর যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া, প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দিয়া আসিয়াছিলাম। অর্থাৎ সাঁত্রাগাছীকে দ্বিতীয় অযোধ্যা ও বাকসাড়াকে দ্বিতীয় বৃন্দাবন তীর্থে পরিণত করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলাম। অন্যান্য স্থানেও যেখানে সেখানে

মৃন্ময়ী দেবদেবী মূর্ত্তি বারমাস অধিষ্ঠিত আছেন, তত্তৎ স্থানও তাঁহাদিগের পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপনার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সেই সকল উপদেশ অন্য কোথাও কার্য্যে পরিণত না হইলেও, শিবপুরে ব্রহ্মময়ী দেবীর ও খুরুটে পঞ্চানন ঠাকুরের পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আনন্দানুভব করিলাম। আর সাঁত্রাগাছীতে আমার বন্ধুবর্গ শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবী প্রভৃতির পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি গঠন করাইয়া স্থাপনা না করিলেও, আজ তিন বৎসর কাল তাঁহারা রামনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া, আনন্দিত হইলাম বটে; কিন্তু পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি চিরকালের জন্য উক্ত রামনবমী তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিলে পরমানন্দ লাভ করিতাম। যে বৎসর আমি উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, সেই বৎসর শ্রীরামচন্দ্রকে ছয় মাস কাল রাখিয়া আশ্বিন মাসের প্রথমে বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল। সে বৎসর দেখিয়াছিলাম যে, উক্ত ছয়মাস কাল, সমভাবেই যাত্রী সমাগম হইয়াছিল এবং যে সকল দোকানদার মাসিক ২০০।২৫০ টাকা হারে খাজনা দিয়া, দোকান করিয়া থাকে, তাহারাও সজল নয়নে আমার সমক্ষে বলিয়াছিল যে, যদি বারমাস শ্রীরামচন্দ্র এখানে রাজা হইয়া বসিয়া থাকেন, তবে আমরাও বারমাস উক্ত হারে খাজনা দিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর পদতলে বসিয়া থাকিতে পারি। ইহা হইতেই নিত্য যাত্রী সংখ্যা অনুমান করা যায়। তথাপি সেবার রামরাজা প্রতিমা আশ্বিন মাসে বিসর্জ্জন হইয়াছিলেন।

যাহা হউক এবার আবার আমি গত শ্রাবণ মাসে রামরাজা বিসর্জ্জনের তিন দিন পূর্ব্বে বৃহস্পতিবারযুক্ত একাদশী তিথিতে সাঁত্রাগাছীতে উপস্থিত হইয়া, পুনর্ব্বার উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। এবার পুরোহিতরূপে আমার বাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিপদ শিরোমণিকে দেখিতে পাই নাই। এবার তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকটী অসন্তোষজনক কার্য্য দেখিয়াই আমি পূর্ব্ববৎ আবাহন বিসর্জ্জনের ব্যাখ্যা দ্বারা রামরাজা প্রতিমূর্ত্তি বারমাস রাখিবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। সে দিনও প্রায় পাঁচ শতাধিক নর নারীর সম্মুখে আমার ঐ সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমি সে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে আমার প্রধান যুক্তি এই যে, প্রকৃত ভক্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন না, বরং চিরকালের জন্য সেবা করিতে

চান। বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের যখন জমিদারী আছে ও তাঁহার স্থায়ী ঘর বাড়ী প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাঁহার নামে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি "রামরাজাতালা" ষ্টেশন স্থায়ী ভাবে স্থাপন করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে স্থায়ী না করিয়া, অস্থায়ী ভাবে তাঁহার উপাসনা করা হইতেছে কেন? তাহার পর ভগবানের মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিবার নিয়ম নাই। অতএব সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার কারণ কি? গত তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি লোক পরম্পরায় বলিয়াছিলাম যে, রামরাজা বিসর্জ্জন করিও না। কিন্তু আমার বাক্য অবহেলা করিয়া, যে রাত্রে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল, সেই রাত্রেই আমি বলিয়াছিলাম যে, তোমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জলে ডুবাইয়া তোমরা যেমন চিত্ত প্রসাদ লাভ করিলে, এইবার ইনি তেমনই তোমাদিগকে মহাপ্রলয়ের নমুনা দেখাইয়া দিবেন। আর সেই রাত্রের বর্ষাতেই, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা ভীষণ জল প্লাবনের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এবারও আমি বলিয়া যাইতেছি যে, যদি তোমরা আমার কথা অবহেলা করিয়া, এই সোণার প্রতিমা জলসাৎ কর, তবে এবারও সেইরূপ ভীষণ জলপ্লাবনের এমন কি অযোধ্যাধিপতির খাস অযোধ্যাগমন পথেও উহা সহ্য করিতে হইবে! এবার গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী গোদাবরী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি বহুতর নদনদী ভীষণ বন্যায় উজান্ বহিবে। অধিকন্তু আমি যে, সকল কথা বলিতেছি, সে সকল কথা যে, আমার কথা নহে; পরন্তু ঐ শ্রীরামচন্দ্রেরই মনোভাব আমার মুখ দিয়া ব্যক্ত হইতেছে, তাহা এইখানেই সেই বিসর্জ্জনের দিনই, দৈব দুর্ঘটনা দ্বারা উনি বুঝাইয়া দিবেন। আমি উহাঁদিগের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া, জোর করিয়া ইহা বলিতেছি। আর আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যদি উহাঁদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয়, তবে উহাঁরা আমার বাক্‌শক্তি রোধ করিয়া দেখাইয়া দিউন। আর যদি তাহা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ইচ্ছাময় নারায়ণ আমার মুখ দিয়াই আজ উহাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছেন। এইরূপ ভাবে আমার বক্তব্য শেষ হইলে সকলেই একবাক্যে আমার যুক্তি গুলি সমর্থন করিলেন বটে; কিন্তু পাষাণময়ী মূর্ত্তি গঠন করিতে অনেক খরচ পড়িবে এই কারণ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহাও তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে, এই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি, ১২ বৎসর রাখিয়া দিলা, প্রতিবৎসর প্রতিমা নির্ম্মাণের উদ্বৃত্ত অর্থ

ও দ্বাদশ বৎসরের জমিদারীর আয় হইতে অনায়াসে পাষাণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ১২ বৎসর পরে এই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিয়া, যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপনা করিলেই চলিতে পারিবে। তখন একরূপ সকলেই নীরব হইলেন। আমি আরও একটী যুক্তি প্রদর্শন করিলাম যে, যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করেন, তাঁহাকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলে। এইরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা যত বাড়িবে ততই আমাদিগের সমাজের মঙ্গল হইবে। আজ কাল এই সকলের অভাব হইয়াছে বলিয়াই ত আমরা নানাবিধ অভাব অনুভব করিতেছি। সায়েস্তা খাঁর আমলে এই পৃথিবীই আমাদিগকে প্রচুর শস্যাদি যোগাইয়াছিলেন। তখন ৮৶০ মন ধান্য ১৲ টাকায় পাওয়া যাইত। আর আজ ৮৲ টাকা ৯৲ টাকা মন হারে চাউল বিক্রয় হইতেছে। গাভী অল্পদুগ্ধবতী হইয়াছেন। এইরূপ ও অন্যরূপ, নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কেবল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অভাবে। অতএব শ্রীরামচন্দ্রের পূজা উপলক্ষে যদি সাঁত্রাগাছীতে এইরূপ একটী সাগ্নিক ব্রাহ্মণও তৈয়ারি হয়, তাহাও কি সাঁত্রাগাছী সমাজের মঙ্গলের বিষয় নহে? এইবার সকলেই নীরব হইলেন। এইরূপ ভাবে সেদিন আমি সাঁত্রাগাছীতে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া, চলিয়া আসিলাম। অনন্তর রবিবারে বিসর্জ্জনের ব্যাপার অবলোকন করিবার জন্য হাওড়ার বড় রাস্তায় আমার পরিচিত পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একত্রে রামরাজা প্রতিমার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিলে, প্রতিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার ইংরাজী বাজনা, অসংখ্য জয়ঢাক, কাড়া নাকড়া, বাইনাচ, খেমটা নাচ প্রভৃত্যো নয়ন গোচর হইলই না, অধিকন্তু একটী আলো পর্য্যন্তও প্রতিমার সম্মুখে দেখিলাম না। কেবল মাত্র কয়েকটী ঢাক্‌ ও কাঁসী এবং এক দল বালক হারমোনিয়ম প্রভৃতি সহযোগে গান করিতে করিতে যাইতে ছিল। আর গত বৎসরের কাগজের হাতী উঠ, রেলগাড়ী প্রভৃতি ও বাঙ্গালমাঝিদিগের অভিনয়রূপ শোভা যাত্রা বাহির করা হইয়াছিল, প্রতিমার যে স্থানে ব্রহ্মার আসন, সেই স্থানের উপরিভাগ একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রতিমা, খানি বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। অতঃপর অন্ধকারের ভিতর দিয়া কেবল মাত্র ইলেক্ট্রিক লাইটের সাহায্যে নগর সহর অন্ধকার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত সপার্ষদ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। আমিও

চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া, ঐদৃশ্য আর দেখিতে না, পারিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরে বিলম্বের ও প্রতিমা ভগ্ন হইবার কারণ জানিতে পারিলাম যে, প্রতিমা, গৃহের বাহির হইবার পরে ঠাকুর বাটীর নিকটেই গাড়ীর চাকা এরূপ বসিয়া গিয়াছিল যে, বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অতিকষ্টে অনেক চেষ্টার পর চাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র হাতে হাতে এই অধমের বাক্য সফল করিয়া, তাঁহার ইচ্ছা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক এবার যে, মহাসমারোহের সহিত বিসর্জ্জন না করিয়া, শোকে মুহ্যমানাবস্থায় প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর চিরকালের জন্য পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপনা করিলেই পরমানন্দ লাভ করিব।

প্রিয় পাঠকগণ! এখন কি বলিতে পারিনা যে, আজকাল লোকের প্রবৃত্তির স্রোতঃ বিসর্জ্জনের দিকে প্রবাহিত হইতেছে? এদিকে একপক্ষ অতীত হইতে না হইতেই কাশী, মৃজাপুর, পাট্না, এলাহাবাদ, দারভাঙ্গা, মতিহারী, মোজাফর-পুর, বালিয়া, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি বহুতর স্থানের লোক ভীষণ জলপ্লাবনে কষ্ট পাইল। রামরাজা বিজয়ার পরক্ষণ হইতেই এবৎসর সমগ্র ভারত জুড়িয়া প্রবল বারি বর্ষণে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি বহুতর নদনদী উজান বহিয়া গেল। এবার হরিদ্বার হইতেই যুক্ত প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমঞ্চলে বন্যার আবির্ভাব হইল। এই প্রবল বারি বর্ষণের পূর্ব্বে আমি আবার প্রলয় সদৃশ ভীষণ জলপ্লাবন স্বপ্নে দর্শন করিয়া, তিন বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্ন সত্য হওয়ায় সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য এবারও উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলে, কেহ কেহ বিশেষতঃ কর্ম্মযোগ প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আমার অত্যন্ত শ্লেষ্মা হইবে এইরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, সেবারও আমার শ্লেষ্মা হয় নাই, এবারও আমার শ্লেষ্মা হইবেনা। পরন্তু মাতা বসুমতীরই শ্লেষ্মা হইবে ইহা সকলেই দেখিতে পাইবেন। আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না, বলিয়া আমি ইহা অটল বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি। এখন বোধ হয় আমার সেই সকল হিতৈষী বন্ধুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম অথবা শ্রীরামচন্দ্র আমার মুখ দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। অধিকন্তু গত ৫ই আশ্বিনের প্রবল ঝড়ে সর্ব্বত্র সকলের

কতই ক্ষতি হইয়াছে। তাই বলি এখনও কি তোমাদিগের চৈতন্য হইবেনা? তোমাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা কি তোমরা এখনও নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করিবে না? এখনও কি সকলে আবাহন ত্যাগ করিয়া বিসর্জ্জন করিতেই শিখিবে? এখন দেখ দেখি সমগ্র জগত বিসর্জ্জনের পথে দাঁড়াইয়াছে কি না? তাই বলিতেছিলাম,—"আবাহন কি বিসর্জ্জন?" অলমিতি।

"গোপাল।"

মাধুর্য্যের ত্রিধারা।

(নাম-রূপ-ভাব)

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।

—:০:—

আজি, গোপালের নাম বড় ভাল লাগে।
নামে সুধা ঝরে, নামে মধু ঝরে, নামে কত ভাব হৃদে জাগে॥
শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট-শতোত্তর নাম।
সকলি রসাল, সবি প্রাণারাম,
গোপাল এ নাম, আনন্দের ধাম,
শোভা পায় পুরোভাগে।

---

* ভক্তি-পাঠকগণের সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে মহাশয়, ব্রজের রাখাল-রূপী গোপাল নামক শিশু-পুত্র-বিয়োগে, শোকাকুল-চিত্তে কয়েকটী অতি উপাদেয় গীত-কবিতা লিখিয়াছেন, প্রত্যেক কবিতাই, নিত্য-গোপালের সহিত সংযুক্ত থাকায়, ভক্ত মাত্রেরই উহা পরম আস্বাদ্য বস্তু হইয়াছে। ভক্ত-কবির পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়ী কবিতাগুলি আমরা প্রকাশ-যোগ্য মনে করিয়াছি। অদ্য একটী কবিতা পাঠক-মণ্ডলীকে উপহার প্রদান করিলাম। ক্রমে ক্রমে "গোপালের" প্রকট মূর্ত্তি, "ভক্তির" শ্রীঅঙ্গে বিভাসিত দেখিতে পাইবেন। (সম্পাদক।)

গোপালের নামে এত মধু আছে,
জানিনু, বুঝিনু, মরণের পাছে
শব্দ-ভাণ্ডারের অপরূপ ছাঁচে,
গড়া তনু, অনুরাগে।

গোপালের নামে গোপালের রূপ,
ফুটে হিয়া মাঝে অতি অপরূপ,
লাবণ্যের ছবি, রসের স্বরূপ,
শ্রুতির "রসোবৈসঃ" সম লাগে।

হইলে গোপাল নাম উচ্চারিত,
নিত্য গোপালের রূপ উদ্দীপিত,
হই বিচিত্র ভাবের প্রবাহে গলিত;
(ফুটে) কি চিত্র, ত্রিধারা যোগে।

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—:o:—

সত্যি, মিথ্যে ভগবান জানেন, তবে শুনেছি তখন থেকেই হিন্দু ধনীগণে মধ্যে যাঁরা, ওমরা, আমির্ শ্রেণীর লোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে কতকগুল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পাপ-প্রথা প্রবেশ ক'রেছিল। ইতিহাসের ছেঁড়া পাত থেকে জানা যায়, যে কোনও কারণেই হউক (অর্থাৎ) ভয়ে হোক বা নজী দেখে হোক প্রায় এই সময় হইতেই নারীর অবরোধ প্রথা হিন্দু সমাজে আসে যদিও শাস্ত্রে, কারণ হিসাবে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আদে আছে; তবু তাহার অবাধ প্রচলন ছিলনা। কিন্তু ক্রমে মুসলমানদের দৃষ্টাে ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ বা অর্দ্ধ বিবাহ করা এবং পুরবাসিনীদিগে

কঠিন অবরোধ করিয়া রাখা, সম্ভ্রম, এবং ওম্‌রাই চালের চিহ্ন স্বরূপ চলিত হ'ল। তারপর হ'লো দুশ্চরিত্রতায় শ্লাঘা, যে যতটা দেখাইতে পারিত সে সমাজে ততটা বাহাদুর। এমন কি কেহ কেহ বলেন, সে সময়কার অধিকাংশ কাব্যও বিশুদ্ধ রুচি সঙ্গত নহে'। সে সময় থেকেই তন্ত্রের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্ম্মের নাম ধরিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তারপর ধনীগণ নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবার চেষ্টায়, তোষামোদ, আত্মভাব গোপন এবং প্রবঞ্চনা করিতে সর্ব্বদাই বাধ্য হইতেন। তাহার ফলে সমাজে তোষামোদজীবিতা আত্মবঞ্চনা ও প্রবঞ্চণপরতা বেশ সজীব ভাবে প্রসারিত হইতে থাকে।

দূর হো'ক্ গে ছাই কি বল্‌তে ছিলাম, আর কি বল্‌তে লেগেছি একেই বলে "ধান্ ভাঙ্গতে শীবের গীত" আমাকে বাপু তোম্‌রা 'ছাড়ান' দাও। এই অপদার্থ বৃদ্ধকে লইয়া কেন ঝল্ খলি'তে পড়ে' ঝগড়া বাঁধাবে? হ্যাঁ কি বল্‌ছিলাম? তারপর ঐত' ব্যাপার। রাষ্ট্র হ'ল ফৌজ আস্‌ছে।

কিন্তু যাঁর জন্যে আস্‌ছে তিনি তখন কি করছেন জান? তিনি তখন—

"নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥

*　　*　　*

সুকৃতি যে হয় তারা দেখিতে হরিষ।

দয়াময় নিজ ভক্তগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। একদিন ভাবাবেশে "মুঞি সেই" রবে চিৎকার করিয়া, হুঙ্কার ছাড়িয়া শ্রীবাসের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

শ্রীবাস তখন, ঠাকুর ঘরে নৃসিংহ দেবের পূজা কর্‌ছিলেন। ওরে বাপ্‌রে!! প্রভু একেবারে দরজায় জোড়া পায়ের লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে হড় মুড় ক'রে গিয়ে সিংহাসনে বসে বল্‌লেন্—

"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া—
কাহারে বা পূজিস্ করিস্ কার ধ্যান?
যাহারে পুজিস্ তারে দ্যাখ্ বিদ্যমান।"

পণ্ডিত চোক্ চেয়ে দেখলেন সাক্ষাৎ নৃসিংহদেব সিংহাসনে বসিয়া মত্ত সিংহ গর্জ্জনে বলিতেছেন—

* * আরে শ্রীনিবাস।
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাঢ়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব পরিকরে॥
* * *
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোর স্তব।"

আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত, প্রেম পুলকিত অঙ্গে, যুক্ত করে, আনন্দ-ধারায় সিক্ত হইয়া দয়াময় প্রভুর দুটী শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিলেন।

আর একান্ত দাস্য ভাবে সেবক ভাবে একেবারে নিজেকে প্রভুর পদে লুটাইয়া দিয়া, অটল অচল স্থির বিশ্বাস স্বরে বলিলেন —

"নৌমিড্য তেহভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল বেত্র বিষাণ বেণু
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥"

এদিকে যখন এই ব্যাপার। তখন কিন্তু আর এক কাণ্ডের সূচনা। কি হ'ল? শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন। এই সময়ে সেইটা হয়। আজ কাল সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া শ্রীপ্রভু নদীয়ার বেশ আনন্দে আছেন। কেবল যা' একটু কষ্ট শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিরহে।

এই স্থানে বলে রাখি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ বৃন্দাবনের শ্রীবলরাম; সুতরাং শ্রীপাদ, আমার প্রভুর দাদা। তা' না হ'লে আগা গোড়ার কৈফিয়ৎ মিল হয় কি? অবধূত প্রভু, বীর-ভূমের এক চাকা গ্রামে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মাতা পদ্মাবতীর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।

আমার প্রভুর অগ্রজ দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়ে যখন তীর্থ ভ্রমণ করেন ইহাঁরা এক সঙ্গে, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, দ্বারাবতী, রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ, প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন।

শেষকালে নাকি বিশ্বরূপ দাদা শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত মহাশয়ের দেহে লীন হন। তবে মোট কথা আমার শ্রীনিমাই চাঁদ প্রভু চিরদিনই যে ওঁকে দাদা ব'লে এসেছেন, তাহা আমি বেশ জোর ক'রে বল্‌ছি। হ্যাঁ তারপর শ্রীপাদ দিন কতক শ্রীধাম বৃন্দাবনে রহিলেন। সেখান থেকে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে কেঁদে চেঁচা ছুট একেবারে এসে হাজীর শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে। এ সব লীলার কথা লীলাময়ই জানেন। এর মধ্যে একদিন প্রভু বলরাম ভাবে বলেছিলেন,—

"আর ভাই তুই তিন দিনের ভিতরে
কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে।"

তারপর দিন স্বয়ং প্রভু, সপার্ষদ, নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত। দেখলেন, ৩৪।৩৫ বৎসর বয়ক্রম, নীল বস্ত্র পরিহিত এক পরম গম্ভীর সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন। দুইজন দুইজনের দিকে খানিক চেয়েই রাইলেন। পরে শ্রীপাদ বল্লেন "কা কা কানায়ে নাকি তুইয়ে।"

বস্ মিলন হ'য়ে গেল।

"নিতাই নিমাই দুই ভাই
একে অন্য ভেদ নাই।"

জগতে প্রেম-বন্যার বান বড় জোর স্রোতে বহিবার সূত্রপাত হইল; ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞানও জ্ঞানীকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া, আকুল করিয়া; নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে চলিল। কি বল্‌ছ? ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, ও সব আবারপ্রভুর কথা বল্‌তে গিয়ে, ধর্ম্ম কথা আলোচনা কর্‌তে গিয়ে বল কেন? বটে!!

আর কি? ভালবাসাই এই কাঁটাঘেরা সংসারের মধ্যে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু; এ জিনিষটাই, ভগবানের অতিদয়ার দান। কিন্তু অভাগা আমরা, এই জিনিষটা নিয়েই, এই স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা নিয়েই অবাধে স্বার্থ, বদলের ব্যবসা চালাতে কম করিনা!

এত যে অপব্যবহার, তবু কিন্তু এর, সঞ্জীবনী শক্তির কথা তুমি, আমি, সংসারের ছেলে, বুড়ো যুবো, সকলেই কিছু না কিছু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি।

অনুভবে, উৎকর্ষণে, ক্রমানুসারে, সকলেই বুঝে, ভালবাসা বাদ দিলে, কিছুই থাকে না। পুরাণে, ইতিহাসে দৈনিক-জীবনে, সংসারের চারিদিকে চেয়ে দেখ, বুঝিবে জ্ঞানের ও জ্ঞানীর, শক্তি বা কতটুকু, আর ভালবাসা, প্রেম ভক্তিরই বা শক্তি কতটুকু। এই যে সংসারের বাঁধন গুলো এই যে জগতের গড়্ গড়ে চাকা, এটা চল্‌ছে জ্ঞানে না প্রেমে, ? নিজের নিজের বুকের ভিতর চেয়ে দেখ; দেখ্‌বে তোমাকে বাল্যকাল হইতে, কোন্ শক্তিতে পরিচালিত করিতেছে? তাহার মধ্যে কতটাই বা তর্কে, মীমাংসায় চলিতেছে আর কতটাই বা ভালবাসা, ভক্তি, প্রেমে চলিতেছে? বেশ বুঝবে জ্ঞান যেখানে খোঁড়া, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, সেখানে বায়ুবেগে প্রধাবিত। ভালবাসা বিহনে শিশু, বালক, যুবা বৃদ্ধ কেহই জীবন ধারণের ইচ্ছা পরিপোষণ করিতে পারে না। এর অভাবে সব শূন্য, সব শুষ্ক, সব মরু, সব হাহাকার। জ্ঞান নাকি? এই ভালবাসার, প্রেমের, ভক্তির ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশের অভাবে নিরাশায় কত শত জীব অকালে চোকের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চির বিদায় নিয়েছে! নিতেছে!! নেবে!!!

জ্ঞান, তর্ক, মীমাংসায় কেহ কি তাহাদের সে নিরাশ বেদন ঘুচাইয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে না পারে? এই ভাব থেকেই নিমগ্ন ভাবের সৃষ্টি। সেখানে আত্মবোধ ক্রমে হীন হয়ে, কেবল থাকে "সে"। "সে" সুন্দর, "সে" সৌন্দর্য্য জগতের আর কিছুতে আছে বলিয়া জানিতে পারে না। জগতের আর সমস্তই তখন তাহার সেই "সে"র কাছে যেন লীন হয়। ভালবাসা, বা প্রেমের এই শক্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানী কখনই অনুভবে আনিতে পারে না।

এই শক্তি ক্রমে কোথায় নিয়ে যায় জান? এই শক্তি নিয়ে যায় বিল্ব-মঙ্গলকে, দারুণ ঝটিকায়, উত্তালতরঙ্গে শবাশ্রয়ে, বিষধর আলিঙ্গনে চিন্তামণির কাছে। এবং তার কাছ থেকে সেই চির সুন্দর বৃন্দাবনের চটুল সুন্দর শ্যাম রাখাল বালকটির কাছে। বুঝ্‌লে কিছু? প্রেমের গতি কোথায়?

অবশ্য "অদল বদলের" কাঁটা বনে সর্ব্বদা আমরা এনিধি পাইনা। তবু ছিটে, ফোঁটা, ভাঙ্গা যা' মিলে তা'ই মধুর; তা'ই সুন্দর।

প্রকৃত খাঁটী জিনিষ, প্রেম; কিছু চায় না। তাঁর কাছে গণনা নাই। গণনা, হিসাবদারের, গণনা ব্যবসাদারের। "সে" যে পেয়েছে, তা'র মূলধন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন। তার কাছে "কেন" নাই। "কেন"? এই কথার উত্তর ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, দিতে জানেনা। প্রেম বলে, তাঁকে দেখ্‌তে চাই, কত যুগ কত বর্ষ দেখি আশা মিটেনা। কেন? তা'ত জানিনা।

প্রেম বলে আমার তাঁকে, চাইই চাই। সে জন্য দারিদ্রতা, মূর্খতা, দুঃখের বোঝা, আসুক কি ক্ষতি। আমি তাঁকে পাইবার জন্য সর্ব্ব দুঃখ সার করিব। গৈরিক আন, ভেক আন, আমি সর্ব্বস্ব ছাড়িব; ছাড়িবনা তাঁকে। কেন? তা'ত জানিনা।

প্রেম বলে "দিয়াছি সব দিয়াছি। দেহ, মন, মান, লজ্জা ধন, জন, বিদ্যা, গৌরব, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, আসক্তি, বৈরাগ্য সব দিয়াছি। কেন তা'ত জানিনা।

প্রেম বলে আমি কেবল তাঁর চরণে মাথা রাখিব। আমি তাঁর। সুতরাং আমার আলাহিদা আর কি আছে? আমার দেহ আমার মন, আমার প্রাণ ইহাত' সবই তাঁর। আমি আমার বলিয়া আর কিছু ভাবিতে পারি না, পারি কেবল তাঁর পায়ে লুটাইতে, কাঁদিতে, আর বলিতে চাই "আমি তোমার" "আমি তোমার"।

দূর হোক্‌ গে ছাই, কি বল্‌তে কি বল্‌ছি!! বৃদ্ধের স্বভাবই এই। দোহাই তোমাদের; গালা গালি করিওনা। হ্যাঁ তার পর, দিনকতক প্রভুর খুব ভাবাবেশ হ'তে লাগলো একদিন প্রভু করলেন কি, ভাবাবেশে বিষ্ণু সিংহাসনে বসে বল্‌লেন—

"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।"

হৈ হৈ কাণ্ড। বৃদ্ধ আচার্য্য স্তব সুরু করলেন। প্রভু ঠাণ্ডা হ'য়ে বল্‌লেন—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি
বিস্তর আমার আরাধন কৈলে তুমি।

শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতরে
নিদ্রা ভঙ্গ মোর, তোর প্রেমের হুঙ্কারে।

*　　*　　*　　*

যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে।

কিছু বুঝ্‌লে কি? লীলা! লীলা!!

ক্রমশঃ—

শ্রী—

বাঁশীর আহ্বান।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ।)

—ঃ০ঃ—

যমুনার তীরে　　ধীরে—অতি ধীরে
বাজিছে শ্যামের বাঁশী।
বাঁশীরব শুনে　　গোপ বধূগণে
পরিল প্রেমের ফাঁসি॥
সংসার ধরমে　　গৃহের করমে
মন আর নাহি সরে।
বাঁশরীর তান　　গোপিকার প্রাণ
সতত ব্যাকুল করে॥
চির অবোধিনী　　সরলা গোপিনী
ছলা কলা নাহি জানে।
হে নিঠুর শ্যাম!　　এই তব কাম
গোপিজনে মার প্রাণে॥
তোমার চরণ—　　সরবস ধন,
বিকায়েছে তব পায়।
দেছে মনঃ প্রাণ　　গেছে কুলমান
রাখ গোপিজনে রায়॥

হতাশে-আশ্বাস।

(লেখক—শ্রীযুক্ত নকড়ি রায় গুপ্ত।)

—:•:—

কে যেন সাঁজের বেলা আমার হৃদয়ে গায়;
কি যেন জীবনে কিছু হ'লোনা হ'লোনা হায়।
সকাল বেলায় দেখে' চারিদিক্ আলোময়;
কত আশা ক'রেছিনু কিন্তু এবে সব লয়।
বেঁধেছিনু খেলা ঘর সযতনে সঙ্গোপনে;
ভেবেছিনু মন সুখে খেলিব সাথির সনে।
এবে দেখি ক্রমে ক্রমে কে কোথায় চলে যায়;
আমি শুধু পড়ে একা করিতেছি হায় হায়।
অনন্ত আকাশ তলে শীতল কৌমুদী কোলে;
মলয় সোহাগে ক্ষীণা কুসুমিত লতা দোলে।
ভেঙ্গে কূল তরুমূল মদমত্ত গরিমায়;
স্ফীত বক্ষে তীব্র বেগে সিন্ধু পানে নদী ধায়।
আপন নিয়তি বশে সবে হয় আগুয়ান;
অতৃপ্ত বাসনা ল'য়ে আমি শুধু ম্রিয়মাণ।
এখন সাঁজের বেলা, ভাবিলে কি হবে আর;
বুঝেও বোঝনা মন, হরির চরণ সার।

নিরুক্তি।

—:•:—

হে গৌরাঙ্গ :—

সকল সাধ্যে সাধনা বিহীন কি আর করিবে যাচনা—
চূর্ণ করে দাও! "আমি ও আমার" ঘুচে যা'ক্ "আমি" গণনা।
ভেঙ্গে দাও নাথ! মন-ভাব মোর মিশে যাই শত অণুসনে
তাহে হয়ত কখনো মিটিবে গো তৃষা পাব পরশণ শ্রীচরণে।

তুমি ভকতের পূজা আকুল আহ্বান শুনি' যবে যাবে ছুটিয়া,
মোরে পথে-পড়া-শত-ধুলি-কণা-সনে যেতেও পার গো দলিয়া।
যদি কঠিন "আমার" কোনও অণুকণা ব্যাথা দেয় তব চরণে!
তবে কি কাজ তাহায় কর দ্রব তারে মিশে যাক্ বিশ্বে, জীবনে।
তাহে হয়ত কখনো অনন্ত প্রবাহে ভাসিয়া, ডুবিয়া, উঠিয়া—
কোনও পুতক্ষণে নিমেষের তরে শ্রীপদে পড়িবে আসিয়া।
সকল তেজঃ দীপ্তি আধার! লভিলে তোমারি স্পর্শ—
তব তেজে দ্রব নবীন জীবনে, জাগিবে তেজ হর্ষ।
হর্ষে খেলিবে মঙ্গল মরুত অনন্ত ব্যোম শূন্যে
"আমার" নিরুক্তি শ্রীপদ-সেবন নাহি কাজ কিছু অন্যে।

দীন—নিত্যানন্দ

শ্রীগরুড়ের মোহ ও সৎসঙ্গ-প্রভাব।

(লেখক—শ্রীধামনবদ্বীপ-বাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস।)

—:০:—

ত্রেতাযুগে শ্রীরাম অবতারে যে সময়ে ইন্দ্রজিত শ্রীরাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন করেন, তখন দেবর্ষি নারদ শ্রীরাম লক্ষ্মণের পূর্ব্বোক্ত বন্ধন ছেদন করিবার জন্য গরুড়কে প্রেরণ করিলেন। গরুড় আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বন্ধন ছেদন করিয়া মনে করিলেন,—

"ব্যাপক ব্রহ্ম বিরাজ বাগীশ।
মায়া মোহ পার পরমীশ॥
সো অবতার সুনে উঁজগ মাহী।
দেখে উসো প্রভাব কিছু নাহি॥"

ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি ব্যাপক ও ব্রহ্মরূপে বিরাজিত, বেদপতি এবং মায়া মোহের অতীত পরমেশ তিনিই জগৎমধ্যে শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাই শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার কোন প্রভাব দেখিতে পাইতেছিনা যাঁহার নামে জীবের ভব বন্ধন মোচন হয়, রাক্ষসগণ তাঁহাকে নাগপাশে বন্ধ

করিয়াছে, আর সেই বন্ধন ছেদন করিতে আমি আসিলাম, তবে কি রামচন্দ্র, ব্রহ্ম স্বরূপ পরমেশ নহেন?

গরুড়ের এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইল। সংশয় হইবারই কথা। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী লীলাশক্তির বৈচিত্রী প্রভাবে কাহার না সংশয় হয়? মায়া বদ্ধ জীবতো সেই লীলা রহস্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যাঁহারা মায়াতীত নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত তাঁহারাও লীলা শক্তির বৈচিত্র্য ভাব দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া মোহিত হন। এমন কি ভগবান পর্য্যন্ত নিজ লীলায় নিজেই মোহিত হন।

এই হেতু দেব-লীলা অপেক্ষা মানব-লীলা ভগবানের এত প্রিয়। যে লীলায় ভগবান মোহিত হন, সেই লীলায় ভক্তগণ মুগ্ধ না হইবেন কেন? সচ্চিদানন্দময়ী ও বৈচিত্র্যময়ী লীলা-শক্তির গুরুত্ব এবং প্রভাবত্বাদি প্রকাশ করিবার জন্যই ভগবান নিজ লীলায় নিজে মুগ্ধ হইয়া ভক্তগণকে মোহিত করেন, তাই মুক্ত ভক্তের সংশয় হয়। অথবা বদ্ধ জীবের সংশয় দূরী করণার্থ ভগবদিচ্ছায় ভক্তের সংশয় হয়।

যাহা হউক গরুড়ের এই প্রকার সংশয়রূপ মোহ হইলে তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া নিজের সংশয় জানাইলেন। শ্রীনারদ গরুড়কে ব্রহ্মার নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন। গরুড় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে মহাদেবের সহিত গরুড়ের সাক্ষাৎ হওয়াতে মহাদেবকে প্রণামানন্তর নিজ সংশয় কহিলেন। মহাদেব গরুড়কে বলিলেন, হে গরুড়! নিলগিরি পর্ব্বতে ভুষণ্ডি কাকের নিকট গমন কর। সেখানে প্রত্যহই পক্ষিগণ আসিয়া ভুষণ্ডি কাকের মুখে শ্রীরামচরিত শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হয়। ভুষণ্ডী কাকও পক্ষী আর তুমিও পক্ষী; উভয়েই পক্ষী জাতী বলিয়া উভয়েই উভয়ের হৃদয় গত ভাব এবং ভাবানুগত ভাষা বুঝিতে পারিবে। ভাবানুগত ভাষা, ভাষাতেই ভাব প্রকাশ হয়। অতএব তুমি ভুষণ্ডি কাকের নিকট গমন কর।

অতঃপর গরুড় নিলগিরি পর্ব্বতে ত্রিকালজ্ঞ ভুষণ্ডি কাকের সমীপে গমন করিল। স্থান-মাহাত্ম্যে গরুড়ের সংশয়-রূপ-মোহ আপনা হইতেই যেন বিদূরিত হইল। ভুষণ্ডি কাক গরুড়কে সমাগত দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক,

যে জন্য গরুড় আসিতেছেন সেই আগমন বৃত্তান্ত যেন কিছুই জানেন না, এরূপ ভাব প্রকাশ করতঃ, সাধারণ ভাবে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন, এবং উপবেশন করিতে বলিলেন। অন্যান্য পক্ষীগণের মধ্যে গরুড় উপবিষ্ট হইয়া, নিজের মোহ ও মোহের কারণ এবং তাদৃশ মোহের বিনাশ প্রভৃতি সকল কথাই আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন, গরুড়ের মোহ বৃত্তান্ত শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করতঃ ভূষণ্ডি কাক, গরুড়কে শ্রীরাম চরিত্র বলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম চরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে গরুড়ের মোহান্ধকার দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীভগবানের চরিতরূপ সূর্য্য উদিত হইলে কি মোহান্ধকার থাকিতে পারে? বোধ হয় শ্রীভগবানের চরিত্র-সূর্য্যই একমাত্র মোহান্ধকার নাশক, ইহাই যেন বদ্ধ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য গরুড়ের তাদৃশ মোহ হইয়াছিল। নচেৎ মুক্ত জীবের আবার সংশয় বা মোহ কি? এই হেতু শৌনকাদি ঋষিগণকে সূত বলিয়াছেন—

"পুরাণার্কোঽধুনোদিত" এই কলির অজ্ঞানান্ধকারে শ্রীভাগবত সূর্য্যের উদয় হইল। শ্রীরাম চরিত্র শ্রবণ প্রসঙ্গে জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া গরুড় ভূষণ্ডি কাককে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভূষণ্ডি! জ্ঞান এবং ভক্তি উভয়ের কিছু ভেদ আছে কি? যদি ভেদ থাকে তাহা বলুন, যদি না থাকে তাহাও বলুন।

ভূষণ্ডি কহিলেন হে গরুড়! জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই ভবদুঃখ বিনাশ করেন, অতএব উভয়ের সাধারণতঃ ভেদ না থাকিলেও জ্ঞানও ভক্তির কিছু ভেদ আছে, অবশ্য শীকার্য্য, কি ভেদ তাহা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

শাস্ত্র যে সকল জ্ঞান, বিরাগ, যোগ ও বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হইলেও উহারা সকলেই পুরুষ। পুরুষের প্রবল প্রতাপ সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্ত্রীগণ দুর্ব্বলা এবং সহজেই পক্ষপাতী।

যে পুরুষ বিরক্ত, যাহার মতি স্থির হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। যে পুরুষ বিষয় কামী এবং ভগবৎ বিমুখ, তাদৃশ পুরুষই নারীর বশীভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু নারী যখন নিজ মায়া প্রকাশিত করে, তখন জ্ঞান নিধান তাদৃশ মুনিও মৃগ নয়নী নারীর চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া বিকল হইয়া পড়েন। তখন তাহার জ্ঞান

বিরাগ যোগ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই থাকেনা। নারীর মোহিনীরূপা মায়া স্রোতে সকলেই ভাসিয়া যায়।[১]

হে বৎস গরুড়, আমি কাহারও পক্ষপাতী হইয়া কোন কথা বলিবনা। বেদ পুরাণ ও সাধুগণের যাহা অভিপ্রায়, তাহাই নিরপেক্ষ ভাবে তোমাকে বলিব—

হে গরুড়! তোমায় অপূর্ব্ব যুক্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর। নারীর রূপ কখন নারীকে মুগ্ধ করিতে পারেনা বরং নারীর রূপে পুরুষই মুগ্ধ হয়।

সকলেই জানেন, মায়া এবং ভক্তি উভয়ই স্ত্রীজাতী, অতএব নারীরূপ মায়ার রূপে নারীরূপা ভক্তিদেবী মুগ্ধ হয়েন না, বরং পুরুষরূপ জ্ঞান, বিরাগ যোগ কামাদি ইহারা মায়ারূপে মুগ্ধ হয়েন। বিচার করিয়া দেখ, ভক্তিদেবী ভগবান্ রঘুনাথের প্রিয়া, আর মায়া কৌতুকী। ভক্তিদেবী মায়ার অতীত বলিয়া শ্রীরঘুনাথ প্রাপ্তির অনুকুলা। আর মায়া কৌতুকী বলিয়া শ্রীরঘুনাথ প্রাপ্তির প্রতিকুলা।

হে গরুড়, সর্ব্বদা বিঘ্ন দ্বারা অনভিভূতা, নিরুপমা নিরুপাধী ভগবদ্ভক্তিতে শ্রীরামচন্দ্র বিরাজিত হয়েন, মায়া ইহার দর্শন করিয়া সঙ্কুচিত হওতঃ নিজ প্রভাব কিছুই বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। এই সকল বিচার করতঃ জ্ঞানিগণ, যোগিগণও মুনিগণ সকল গুণের-খনি-স্বরূপা ভক্তিদেবীকে প্রার্থনা করেণ।

হে গরুড়! ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি উন্মুখ কারিণী ভক্তিদেবীর গূঢ় রহস্য কেহই জানেনা। রামচন্দ্রের কৃপা ব্যতীত ঐ গূঢ়তত্ত্ব কেহই জানিতে পারেনা। যাঁহার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে তিনিই ভক্তিদেবীর গূঢ় রহস্য জানিতে পারেন, কৃপাহীন ব্যক্তি পারে না। যিনি ভক্তিদেবীর রহস্য জানিয়াছেন তাঁহার স্বপ্নেও মোহ উৎপন্ন হয়না। হে প্রবীন গরুড়! এক্ষণে আমি তাদৃশ জ্ঞান ও ভক্তির উভয়ের পার্থক্য বা ভেদের কথা বলিব তাহা তুমি শ্রবণ কর। যাহা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি উৎপন্ন হইবে।

হে বৎস, যে সকল কথায় মর্ম্ম বোঝা যায়, কিন্তু বলা যায় না, তাদৃশ বর্ণনাতীত অব্যক্ত বাক্য সকল তোমার নিকট বর্ণন করিব। শ্রবণ কর। জড়াংশ ও চেতনাংশ নামে ঈশ্বরের সাধারণত দুইটী অংশ আছে। জড়াংশ বলিতে মায়া আর চেতনাংশ বলিতে জীব। ঈশ্বরাংশ তাদৃশ জীব অবিনাশী, চিৎ,

নির্ম্মল এবং স্বাভাবিক সুখরাশী প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন হইয়াও মর্কট বন্ধন সদৃশ মায়ার অধীন হয়েন।

কামনার অধীন হইয়া যখন জীব মায়ার অধীন হন তখনই চেতন জীবের উপর জড়রূপা মায়ার গ্রন্থী, (গৌড়া) আপতীত হয়, তাহাতেই চেতন জীবের বন্ধন হয়। যদ্যাপি তাদৃশ বন্ধনটী মিথ্যা হয় তথাপি সেই মিথ্যা বন্ধন ছেদন করা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেই বন্ধন হইতেই জীব সংসারী হয়েন জীবের সংসার হইলে আর মায়া গ্রন্থীও বাসনা এবং সুখলাভও ভাগ্যে ঘটেনা। সাধুসঙ্গের এমনই মহিমা যে, ভুষণ্ডীর নিকট এই সকল শুনিয়া গরুড়ের মোহ দূর হইল।

পল্লীবাসী লিখিত "নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোসাঞি।)

—:•:—

অনেকদিনের পর সেদিন আমার কোন বন্ধু ২৪শে শ্রাবণের "পল্লীবাসী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র আমাকে দেখিতেছেন, উহাতে "শ্রীমঃ" লিখিত "নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ দেখিলাম। প্রবন্ধে "আমার বক্তব্যের অনুকূল বা প্রতিকূলে কাহারও কোন কথা থাকিলে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে একটা শাস্ত্র সঙ্গত মীমাংসা পক্ষে চেষ্টা দেখা যাইতে পারে। তবে যদি কেহ কোন কথা না বলিয়া নীরব থাকেন, তাহা হইলে প্রথম পক্ষের মতই যে সর্ব্বথা গ্রহণীয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কাহারই কোন অবকাশ থাকিবে না।"—এই প্রাগল্‌ভোক্তি দর্শনে নাম রহিত ভীত ব্যক্তির প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রয়োজন বোধে, ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আলোচিত হইলেও পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকায় বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এবং এ বৎসর যে পাপনাশিনী

হইবেনা” তাহাও ১০ই আষাঢ়ের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ঢাকা আরিয়াল নিবাসী বৈষ্ণব ব্যবস্থাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন গোস্বামি শিরোমণি মহাশয়ের শিষ্য শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস মহোদয় শাস্ত্রযুক্তিতে আলোচনা করিয়াছেন তথাপি সিদ্ধ সাধন বা পিষ্টপেষণ দোষে দুষ্ট হইলেও এরূপ ভ্রান্ত মতের প্রচারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য বোধে, বিজ্ঞ পাঠকগণের অবগতির জন্য পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ লিখিতে হইতেছে।

লেখক কারিকার যে ভাবে অর্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে “শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস” গ্রন্থ যে গুরুর নিকট যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত না হইয়া যায় না। যেহেতু এবৎসর পাপনাশিনী হবে কি না। এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিতেন না।

এ বৎসর যে “পাপ নাশিনী হইবে না” তদ্বিষয়ে, আমাদের কোন সংশয় নাই এবং যাঁহারা বৃথা পণ্ডিতাভিমানী না হইয়া সমাহিত চিত্তে শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের আলোচনা করেন তাঁহাদের কোন সংশয় নাই। আর যাঁহারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইয়াও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মিলিত মত গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ঐক্য মতে কলিকাতা “ভাগবত ধর্ম্ম মণ্ডল” হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণবব্রত তালিকা সাধারণে প্রতিবৎসর বিতরিত হইয়া থাকে, তল্লিখিত দিনে তাঁহারা নিসংশয়ে ব্রতাচরণ করিতে পারেন। এই বৈষ্ণবব্রত তালিকায় শ্রীধামবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামি সর্ব্বভৌম, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী গোস্বামি ভাগবতবেদান্তাচার্য্য ও মাড়ো নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ গোস্বামি বেদান্তভূষণ এবং গদাড্ডিনিবাসী বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্তস্থিধর চট্টরাজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যখন এবৎসর পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উল্লেখ করেন নাই তখন আমরা কিরূপে পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী স্বীকার করি।

তৎপরে আমার নিজের যতটুকু শাস্ত্রজ্ঞান আছে তাহাতে শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের উক্ত মহাদ্বাদশী নির্ণয়স্থলের আলোচনায় কোন ক্রমে বুঝিতে পারিলাম

না যে, নাম প্রকাশে ভীত লেখক মহোদয় কিরূপে মহাদ্বাদশী স্থলে নক্ষত্রের মান দ্বাদশীর সহিত গ্রহণ করিতে হইবে লিখিলেন।

পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী মহাশয় ত্রয়োদশ বিলাসে প্রথমে অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা সাধারণভাবে লিখিয়া "অথ ঋক্ষ প্রযুক্তানাং ব্রত কর্তব্য যথা। জয়াদীনাং চতসৃণাং তথাব্যক্তং নিরূপ্যতে॥" ইহা বলিয়া ভান্বর্কোদয় কারিকার আরম্ভ করিলেন যথা—

"ভান্বর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানিচেৎ।
সমান্যূনানি বাবস্যুস্ততোঽমীষাং ব্রতোচিতী॥
কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানিচেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষা ব্রতাচরণ যোগ্যতা॥
শ্রবণাখ্যতারক্ষেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমন পর্য্যন্তং কার্য্যং দ্বাদশ্যপেক্ষণং॥
শ্রবণেত্বস্তমনতঃ প্রাগ্‌দ্বাদশ্যাং সমাপ্তিতাং।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতযোগ্যোচিততা ভবেৎ॥"

এখানে এই কারিকাতে "ভানি অর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তানিচেৎ, অধিকানি, সমানি ঊনানি, বাবস্যু ততঃ অমীষাং ব্রতোচিতী। কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তানি চেৎ অধিকানি সমানি বা তদাপি এষাব্রতাচরণ যোগ্যতা।" ইহাই কারিকার অর্থ।

এখানে নক্ষত্রের সাম্যাদির পরিমাণ শব্দের কোন অবলম্বনে লেখক দ্বাদশীর সহিত গ্রহণ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয়তঃ নৃসিংহ পরিচর্য্যা গ্রন্থেও—

"আদিত্যেন জয়াচ্যুতেন বিজয়া পুষ্যেণ পাপানহা।
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি চতসৃষ্ঠক্ষং দিনাদের্ভবেৎ॥
পূর্ণং চোনমথাধিকঞ্চ হরিভ্যধিক্যে তু ভান্তর্ভুজি।
ঋষাধিক্য সমত্বয়োস্তু দিনতঃ প্রাগ্‌ন্তে চ পশ্চাদ্‌ব্রতং॥

এই কারিকাতেও দিনতঃ শব্দ হইতে দিনের সহিত নক্ষত্রের প্রবৃত্তির উল্লেখ দেখা যায়, এবং লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত "অস্যার্থঃ" বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তার নিজকৃত কারিকার যে অর্থ উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে "জয়াদিষু" পদের সহিত

"পূর্ণাদি" পদের অন্বয় কি করিয়া করেন? বিশেষতঃ যখন তৎপূর্ব্বেই "দিনাদেঃ প্রবৃত্তং" এইরূপ পদ রহিয়াছে তখন সন্নিকৃষ্টাদি পদকে পরিত্যাগ করিয়া অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বাদশী পদের কল্পনা করায় অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কারণ গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং কারিকার কি অর্থ করিলেন তাহা দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তিনি "অয়মর্থঃ" বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে "হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যালোচনায় নক্ষত্র ন্যূনত্ব সাম্যাধিক্যেষু সংস্বপি রোহিণী চেৎ ষষ্টি ঘটিকাভূত্বা পারণ দিনে বর্দ্ধেত।"—এখানে যদি এই নক্ষত্রের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বাদশীর হইতে গৃহীত হইত তাহা হইলে "ষষ্টি ঘটিকা ভূত্বা পারণ দিনে" এইরূপ লিখিতেন না। শ্রবণা ব্যতিরেকে নক্ষত্রান্তরের যোগস্থলে দ্বাদশীর সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতির অপেক্ষার বিষয় লেখার কোনই সার্থকতা থাকিত না।

এক্ষণে বিজ্ঞপাঠকগণ বিচার করিবেন। আমরা কোন ক্রমেই তিথির সহিত নক্ষত্রের সাম্যাদির গ্রহণ করিয়া আগামী ২১শে ফাল্গুন সোমবার পাপ নাশিনী মহা-দ্বাদশী স্বীকার করিতে পারি না। অলমিতি।

সমালোচনা।

(পাগল রাধামাধব (প্রথম খণ্ড)।)

শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে সম্পাদিত।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর।)

—:•:—

অনুরোধে এই উত্তম গ্রন্থখানির সমালোচনা করিতে সাহসী হইলাম। ইহার সমালোচনা সমাধানে আমাকে তিনটি মহাত্মার নাম কীর্ত্তন ও সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। পাগল রাধামাধব, পাগল হরনাথ ও শ্রীমান রসিক লাল দে। শ্রীমান রসিক লাল আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ইনি "রাঙ্গা পা দু'খানি", "প্রেমের ডালি" প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থের প্রণেতা এবং প্রায় সমুদয়

শ্রীপত্রিকার লেখক। নিবাস, বাঁকুড়া, সোণামুখী। ইনি তথায় গরীব ভাণ্ডার, স্থাপন করিয়া জীবে দয়ার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসার অমৃতে পড়িয়া আমি জীবনের অনেক দুঃখ পাসরিয়া গিয়াছি। ইনি উচ্চশিক্ষিত ভক্ত "বাঁকুড়ার ঠাকুর"। ভক্ত-মহিমা গানে ইহার লেখনী বংশী স্বরূপ। ইনি বৈষ্ণব-তত্ত্ব-নিচয় একে একে কবিতাছন্দে সুন্দর গাঁথিয়া ভক্ত-কণ্ঠে পরাইতেছেন। ইঁহার কবিতা সকল প্রাচীন পদানুকরণে না হইলেও রসাল, প্রাণস্পর্শী, প্রেমবর্ষী। এই পাগল রাধামাধবের উপদেশাবলী সঙ্কলিত করিতে যাইয়া তৎগ্রন্থে ইনি তাঁহার ভাববর্ণনচ্ছলে যে সকল কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সে সব অমূল্য মধুপ্রত রত্নরাজী, সন্দেহ নাই।

রসিকের ভক্তি ও প্রয়াসে পাগল শ্রীরাধামাধব এখন বৈষ্ণব বঙ্গে অপরিচিত নহেন। কিছুকাল ইনি রসিকের সুপ্রতিষ্ঠিত গরীবাশ্রমে অতিথি হন। রসিক রাধামাধবকে তখন সুন্দর চিনিয়াছেন এবং তাঁহার দুর্লভ সঙ্গে অনেক পরমার্থ লাভ করিয়াছেন। রসিকের কৃপায় আমার সঙ্গে রাধামাধবের পরিচয় ঘটে। তৎসূত্রে তত্ত্ববিষয়ক অনেক লেখালেখি হয়। তাঁহার মতের সর্ব্বাংশের অনুমোদন না করায় রসিক আমার প্রতি সময় সময় বিরক্ত হইয়াছেন; ইহাও আমাকে লিখিতে হইল। রাধামাধব নিজদৈন্যে মাদৃশ অধমকে "দাদা" সম্বোধন করিতেন, আমিও তাঁহাকে দাদা বলিতাম।

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।"

তখনও রাধামাধবকে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীমান রসিক সম্পাদিত এই গ্রন্থপাঠে এই মহাপুরুষের কতক পরিচয় পাইলাম। ইঁহার উপদেশোক্তি গুলি সমুজ্জ্বল-রসমাণিক। কিবা রস! কিবা প্রভা!! সত্যই উপদেশোক্তি পাঠে আমি লব্ধবান্ হইয়া লুব্ধ ও মুগ্ধ হইয়াছি।

শ্রীরাধামাধবের উপদেশ, অমিয়া কষাগ্নিত খাঁটি সোণা। তাহা দিয়া আবার আমার প্রিয়তম রসিক কারিকর অলঙ্কার গড়াইয়াছেন, রঙ্ দিয়াছেন। এমন দিব্যোত্তম সুন্দর আদরের সামগ্রী বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার লোভ কাহার না জন্মে?

শ্রীগ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। পাঠে ধূলি সদৃশ মাদৃশ কীটাধমের

* আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাগল হরনাথ অসাধারণ মনুষ্য। ইনিও বাঁকুড়ায় আবির্ভূত হন। ইনি একজন বি, এ। কাশ্মীর মহারাজের দেবার্চ্চনবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এইরূপ জানি। ইঁহার বহু সুশিক্ষিত শিষ্য আছেন। হরনাথ দাদার পরমার্থ সম্বন্ধ সূত্রে চুচুঁড়ার শ্রীমান বাবা নন্দলাল পাল, কলিকাতা আহিরীটোলার জমিদার দাদা শ্রীযুক্ত রাধা বল্লভ শীল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আমাদের খুব অন্তরঙ্গ। হরনাথ দাদার কতকগুলি কথামৃত শ্রীমান রসিক "শ্রীগৌরাঙ্গ" পত্রিকায় ক্রমশঃ আমাদিগকে উপহার দিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন উপদেশের দোষোল্লেখ করিলে রসিক আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, আমাকে সত্যের অনুরোধে লিখিতে হইল। বিরক্ত হইবার কারণ এই যে, প্রিয়জনের দোষ শ্রবণ প্রকৃত বন্ধুর অসহনীয়। দু'টি আদর্শ রসিকের ধর্ম্ম-জীবনের পরিপোষক।—ঐশ্বর্য্য মণ্ডলে হরনাথ, তৎপরিপাক মাধুর্য্য মণ্ডলে রাধামাধব। আজ সেই রসিকও হরনাথকে ছাড়েন নাই। মাধুর্য্যমণি পাইলে ঐশ্বর্য্য কাচের যত্ন ও সেবা কে করে? ভাগ্যবান্ রসিক। হরনাথ দাদার "উপদেশামৃত" গ্রন্থ আমি পাঠ করি নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পাগল হরনাথ পত্রাবলী গ্রন্থ সমূহ উপহার পাইয়া পাঠ করিয়াছি। এই পত্রাবলী অতি সরল ভাষায় শ্রীনাম মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আজ সেই রসিক লাল "পাগল রাধামাধবে" একবারে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও হরনাথ দাদার উপদেশের, তীব্র ভাষায়, দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কীর্ত্তন না করিলেই ভাল হইত।

ভাগ্যবান্ রসিক রাধামাধবে মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদময়ী গম্ভীরা লীলা প্রকট দেখিতেছেন এবং তদ্দর্শনে সফল হইবার জন্য দয়া পরবশ হইয়া জগজ্জীবকে আহ্বান করিতেছেন। রসিকের মর্ম্মব্যথায় সবে বধির, কেহ কর্ণপাত করিল না, সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়া যেন সবে অধন্য। এ জন্য রাধামাধবের প্রাণব্যথা ততোধিক।—এবড় কৌতুহল জনক বটে। আবার বিস্ময়করও। কারণ রসিক এবং অপর দুই চারিজন বৈ ওদেশে কি এমন মানুষ নাই যাহারা রাধামাধবকে অসাধারণ প্রতিভাবান্ প্রেমিক ভক্ত মনে করিতেছে। রাধামাধব বৈষ্ণব সেবা প্রণালী শিক্ষা প্রদান মানসে একসের চাউল ও একআনা পয়সা দৈনিক ভিক্ষা চাহিতেছেন, পাইতেছেননা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে নিষ্কিঞ্চন

ভক্তের জীবিকা সঙ্কুলানই ভিক্ষা। রাধামাধবের এই আবদার ভিত্তিমূলক, স্বত্বমূলক। কত লোক অপাত্রে তোড়া ঢালেন।

পাগলের উপদেশগুলির আলোচনা করা যাউক। ইহাতে অপরাধ হইবে কিনা জানিনা; জানি, প্রেমময় রসিকদাদার আদেশ পালন।

"নিরপরাধ নামসঙ্কীর্ত্তন" দুর্লভ ভক্তিলাভের উপায়। নিরপরাধ হইবার সঙ্কেত নিজকে পতিত জ্ঞান করা। জন্মই পাপ। সুতরাং জীব মাত্রই পাপী। আমি পাপী, অথচ পাপী বোধ না করা অহঙ্কার মূলক। অহঙ্কারের ধার দিয়া প্রভু আসেননা। আমি পাপী (পতিত) এই ধারণা দৃঢ় হইলে চিত্তে কাতর বা আশ্রিত ভাব আসে। আমার ঠাকুর দৈন্য-ধনের কাঙ্গাল। "আমি পতিত" জ্ঞান জাগরিত হইলেই, পতিত পাবনের আসন টলে—আসিয়া কোল দেন, উদ্ধার করেন। "আমি পতিত"—জ্ঞান জাগাইবার যে প্রয়াস তম্মাত্র সাধন। কলির জীবের অপর সাধন ভজন নাই। কেবল ভাব "আমি পাপী।" মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ইহাই মূলমন্ত্র, মর্ম্ম ও ভিত্তি এই দৈন্য সমাচারই রাধামাধবের উপদেশমালা গাঁথিবার স্বর্ণসূত্র। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতসিন্ধুর পয়ারশুক্তিনিচয়ের গর্ভনিহিত মুক্তারাজীর সমুদ্ধারই রাধামাধবের এ সকল ভণিতি। তিনি তোড়ার জটিল বন্ধন খুলিয়া মোহর দেখাইতেছেন। আমরা পাথরের মনে করিয়া কাচের চশমা চক্ষে ধারণ করিয়াছি। কিন্তু রাধামাধব যথার্থই পাথরের চশমা চোখে দিয়াছেন। অনুরাগের চশমা বিনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি বাস্তবিক অনুরাগাঞ্জন দ্বারা নেত্রদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য সাধন করিয়াছেন। তিনি নূতন কথা কিছুই শুনান নাই। তিনি কেবল খাটি নিঃস্বার্থ ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছেন। তবে কিনা তাঁহার রঙ্গে মালিন্য আছে ও আনুসঙ্গিক প্রসঙ্গের খাদ আছে। আমার অফুটন্ত ক্ষুদ্র জ্ঞাননেত্রের কলিত ছবিতে আবরণ দিব না।

"নির্গুণ, সগুণ হইতে পারেন, কিন্তু সগুণ, নির্গুণ হইতে পারেন না; দুগ্ধ দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি কভু দুগ্ধে পরিণত হয়না।" এই যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়না। বিজ্ঞানোৎকর্ষফলে দধি পূর্ব্বাবস্থায় আনীত হইতে পারিবে আশা আছে। সগুণ দধি নির্গুণ দুগ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় বটে; নচেৎ সাধন কি, জ্ঞান কি, আধ্যাত্মিকোন্নতিই বা কি? সাধন-গতি প্রতীপ। কেন?—

"খল্বিদং ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত বা প্রতীত। এই যে জলস্থল,—উহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম নিগুর্ণ, এবং উহাই জলস্থলাদিরূপে প্রতীত। ধরুন্ ব্রহ্মকেই জল বলিতেছি; অথচ জীবের আধ্যাত্মিক বিকাশ সহকারে ঐ জল পুনঃ ব্রহ্ম বলিয়াই অনুভূত হয়। অর্থাৎ সগুণ নিগুর্ণ হয়। এই অনুভূতির নাম ব্রহ্ম জ্ঞান। তবে রাধামাধবের এই আলোচ্য উক্তির ভিত্তি এই মাত্র গৃহীত হইতে পারে যে, নিগুর্ণের সগুণত্ব সার্ব্বজনীন, সগুণের নিগুর্ণত্ব বৈশেষিক।

"পুণ্যবানের সেবাধিকার নাই।"—ইহা সুবর্ণ সত্য। সেবার স্বভাব নিঃস্বার্থ। সেব্যজনের সুখতাৎপর্য্যেই সেবা; সুতরাং পুণ্য-কর্ম্ম-পরায়ণ সকাম ব্যক্তির উহাতে অধিকার নাই। পবিত্রতা-সাধক কর্ম্মই পুণ্য। স্বকীয় পবিত্রতালাভের প্রয়াস পর্য্যন্তও ব্যবসায় গন্ধ বটে—উহা তাই ভগবৎ সেবা বিরোধী। "এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে বড় বড় অনেক পণ্ডিতের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।"—কেন? এ বিশ্বাস শুরু ভক্তির এক উপাদান।

"পুণ্যবানের দল ঘোর নামাপরাধী; তাঁহাদের আত্মধ্বংস অনিবার্য্য।" নামাপরাধী জন যে ধ্বংসমুখে দোদুল্যমান এবাক্যের প্রতিবাদ নাই। কিন্তু পুণ্যবান্ ব্যক্তির নামাপরাধ অনিবার্য্য বা পুণ্য ও নামাপরাধ যে একার্থব্যঞ্জক তাহা কেমনে প্রতিপন্ন হয়? পুণ্যের স্বভাব পবিত্র, কিন্তু নেশার বশে গর্ব্বিত। নেশার বস্তু সেবন না করিলে পুণ্য পবিত্রই; তখন পুণ্য নিরপরাধ। এই নিরপরাধাবস্থার নাম সন্ন্যাস—ফলাসঙ্গশূন্যতা। সন্ন্যাসীরাই হরিনাম প্রচার করিয়াছেন।

"—উহা চন্দনের ন্যায় সুশীতল ও সৌরভময়। যতই ঘর্ষিত হয়, ততই সৌরভ বাহির হয়।"

"আঙ্গুর ফল যেরূপ মধুময়, রসে ভরা, পাগল মানুষের এ বাণীও ঠিক্ তদ্রূপ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"পাপপুণ্যময় দেহ, সকলি অনিত্য এই"

"পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম

পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।"—

"পুণ্য" শব্দে ঐহিক-পারত্রিক সুখোৎপাদক কর্ম্মবিশেষ বুঝায়। বৈষয়িক সুখের ধাম-পুণ্য; এই জন্য প্রেমিক ভক্তের পক্ষে উহার অনুষ্ঠান করা দূরে

থাকুক্ তাহার নাম করা পর্য্যন্তও নিষেধ! প্রকৃত পুণ্যবানের 'শেষ প্রাপ্তি স্থান—ঐশ্বর্য্যধাম, মাধুর্য্যধাম নহে। বর্ত্তমান কলিযুগে প্রকৃত পুণ্যবান্ কেহ থাকিতে পারেন না। পুণ্যবান্ বলা অহঙ্কার প্রকাশের নামান্তর। পুণ্যবান্—সকাম, স্বসুখকামী, প্রবৃত্তি মার্গীয়। দুরন্ত বালকের ন্যায় তাঁহারা চান, "ক্ষীর কই, মিঠাই কই, ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" কিন্তু পতিত, পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শরণাগত; 'যা করেন প্রভু" এই ভাবে অনুপ্রাণিত।"—এ চিত্র অতিমনোজ্ঞ। এই প্রতিচ্ছবিতে "পুণ্যবান্" ব্যক্ত। এই সুন্দর আলেখ্যের সোণাল ছটার স্তরে স্তরে আঁধার-লোকের দু একরেণু আবৃত আছে। তদুদ্ঘাটন করা তেমন অসঙ্গত নয়। অঙ্কন নৈপুণ্যের উপর দিয়া বর্ণ ফলাইতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।—এচিত্রে পুণ্যবানের মুখে কালির ভাগ বেশী পড়িয়াছে; রাধামাধব পুণ্যবানের মর্য্যাদা রাখেন নাই, অথচ "প্রকৃত পুণ্যবানকে" স্বর্ণসিংহাসন দিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান কলিযুগে প্রকৃত পুণ্যবান্ কেহ থাকিতে পারেননা।" লেখকের ভাব পূর্ব্ব যুগত্রয়ে প্রকৃত পুণ্যবান্ মিলিত। কলিতে পুণ্যবান্ মিলে এবং সেই পুণ্যবান্ বড়ই অধন্য। রাধামাধবের মতে বোধ হয় কলির পুণ্যবান্ নিন্দার্হ। প্রকৃত পুণ্যবানের সংজ্ঞা এ গ্রন্থে পাই নাই। তিনি পুণ্যের মহিমা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় প্রেমিকের পক্ষে পুণ্যবান্ সর্ব্বযুগেই হীন, অপকৃষ্ট।

পুণ্যবান্ ভাল কি পাপী ভাল, তদ্বিষয়ে লেখক স্পর্শ করেন নাই। এক দিকে যেমন পুণ্যবান্, অপর দিকে পাপীর উল্লেখ থাকিলে বেশ রুচিকর হইত। "পাপ" এর পরিবর্ত্তে "পতিত" একটী কথা পাই। "পাপ স্মরণ করিয়া পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শরণাগত; "যা করেন প্রভু এই ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া দ্বারা পতিত" এর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইলেও, এই কর্ত্তব্য দ্বারাই "পতিত" এর সংজ্ঞা সুন্দর স্থাপিত হইয়াছে। "পতিত"ও "পাপী" এক নয়। পাপী অন্ধ, পতিত চক্ষুষ্মান্; পাপী তমঃ প্রধান, পতিত সত্ত্ব-প্রধান। পাপী—পাষাণ পতিত—কর্দ্দম। যে লোটাইয়া পড়ে, সে পতিত। পাপী, অতর্কিত, পিছলিয়া পড়ে, পতিত সতর্ক, মর্য্যাদায় লোটাইয়া পড়ে। সুতরাং সকল পাপী পতিত নয়। পাপী মস্তকের উপর পড়ে, পতিত পড়িলেও জানুর উপর পড়ে, পাপী

চেয়ে পুণ্যবান্ শ্রেষ্ঠ ইহা অগ্রাহ্য, অবিতর্ক। কিন্তু আবার পুণ্যবান্ চেয়ে পতিত শ্রেষ্ঠ ইহা এক অভিনব সত্য, মধুর সত্য। অসার রাশির মধ্যে দুই এক খণ্ড কাচও হয়। পাপীগণের মধ্যে দুই একজন পতিত দাঁড়ায়। কেবল অহঙ্কার দোষ চাপাইয়া পুণ্যবানকে খর্ব্ব করিতে পারিনা। পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়েই দুই রঙ্গের অহঙ্কার বরং ভীষণ। পুণ্যের অহঙ্কার যেমন বলিরাজে, হরিশ্চন্দ্রে; পাপের অহঙ্কার যেমন হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল প্রভৃতিতে। পুণ্য জন্য গর্ব্বে ঈশ্বর একবারে অদৃশ্য হন না, পাপ জন্য গর্ব্বে ঈশ্বরবিস্মৃতি; তার পর নাস্তিকতা। অহঙ্কার তুল্য পাপ নাই। এমন কি অহঙ্কারই সর্ব্বপাপ বীজ। পুণ্যবানের যে অহঙ্কার, তাহা পাপের সূচনামাত্র। পাপীতে উহা বেশী দূর গড়ায়। জগাই মাধাই, মহাপাপী, নিতাইচাঁদের কৃপায় পতিত গণ্য হইলেন, তার পর উদ্ধার। নিতাই আগে পাপী ধরিয়া পতিত বানান, তৎপর গৌরাঙ্গ উদ্ধার করেন। "আমি পাপী" ইহা জানি বা না জানি, "আমি-পাপী" এই জ্ঞান চিত্তে জাগরিত হইলে, এই জ্ঞানের গুরুভারে পাপী বড়ই নোয়াইয়া পড়ে; তখন এই অবনমিত দীন কাঙ্গাল জীবের আর্দ্র নামটি "পতিত।" এই অমৃত ভাবাপন্ন জীব নিরহঙ্কার বলিয়া নিষ্পাপ। বিষ কোন বিশিষ্টাবস্থায় যেমন অমৃত হয়, পাপীও তেমন পতিত হয়। পুণ্যবান্ পাপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, অহঙ্কৃতি দুষ্টতা নিবন্ধন পতিত চেয়ে অতিহীন। নিম্নভূমিতে জলের গতিবৎ, পতিতে ঈশ্বর আশ্রয় করেন। তাই রসিক লিখিয়াছেন—

"আমি পাপী" স্মরণ হইলে, অনুতাপ আসে, তখন প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ জানিতে পারিয়া কোল দেন; তাই "ভগবান্ গৌরহরি পতিত পাবন।"—কি আশা ভরসার কথা! কহিতে শুনিতে পড়িতে প্রাণ শীতল হয়! জীবের সাধন ভজন আর কি? একমাত্র "আমি পাপী" ভাবনা দৃঢ় করা। পাগলমানুষের মতে গিণ্ডি লেনাদেনার সহিত প্রেমময় ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই।—ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত।

"সেবার অধিকারী" নয় পুণ্যবান্" সত্য, কিন্তু "শুধু জপতপ পুণ্যবানের কার্য্য" একথা পোষণ করিতে আমাদের আপত্তি আছে। জপতপকারী ঐশ্বর্য্যকাঙ্ক্ষা শূন্যও হইতে পারেন। "নাহি চান তাঁরা ব্রজের মাধুর্য্য" আমরা এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, কারণ হয়তো চান। কতকগুলি কর্ম্ম ভক্তির

অনুকূল; সুতরাং সে সব পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষিত হইবে কি?—"নিজ পাপস্মরণে হইয়ে পতিত" "পতিত" এর খাটি সংজ্ঞা এইটি রসিক গাহিয়াছেন "বর্ণাশ্রমে নাই প্রেমের গূঢ়মর্ম্ম," এগানে কে না মুগ্ধ হইবে?

পাগল মানুষের "সৃষ্ট মানুষ মাত্রেই পাপী" উক্তিতে বিসংবাদিতা থাকিতে পারেনা। এই মহাত্মার ঈদৃশী ছাকা কথাগুলি অমূল্যরত্ন পাথা সন্দেহ নাই। ইনি বলিতেছেন "সত্যযুগ হইতে অসংখ্য যুগে মহাপাপ করিয়াছ, সেই পাপ স্মরণ করিয়া—" এস্থলে আমাদের সন্দেহ গুরুতর। সুতরাং তর্ক করা ধৃষ্টতা হইবে মনে করিনা। প্রথমতঃ, আমরা ক্ষীণ জীব, কেমনে আমরা একবারে সত্যযুগ হইতেই, দুচারি জন্মে নয়, অসংখ্য জন্মে, আবার পাপ নয় মহাপাপ করিয়াছি। এ উক্তি দর্শন সমর্থিত হইতে পারে কিনা? এতদ্বারা বিশ্বাস জন্মে মহাপাপ স্রষ্ট্র পুরুষের অর্পিত কোনও সামগ্রী। দ্বিতীয়তঃ, সেই মহাপাপ সকল স্মরণ করিবার উপায়ও সুবিধা কি আছে? তবে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও মানিয়া নিলেই হয় "কলির জীব সকলেই পাপী।" পক্ষান্তরে কেহই পুণ্যবান্ নহে" একথা কেমনে বিশ্বাস করি? পুণ্য আছে পাপ নাই, বা পাপ আছে পুণ্য নাই—এ দুইয়ের কোনটি সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের যেমন দুই হাত, তেমন পাপও পুণ্য উভয়কে পাপ মনে করিয়া দৈন্যাশ্রয় করাই কল্যাণ পথ।

ক্রমশঃ।

সুখ্যাতি।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশ ভট্টাচার্য্য।)

—:০:—

বিশ্ব-ব্যাপিয়া র'য়েছ তুমি
তবু তোমার আছে বিপক্ষ।
কায়-মনোপ্রাণে সাধিছে সকলে
(জানিনা) কখন কোথায় কর সখ্য॥

(ভক্তি পঞ্চদশবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ১৩২৩ সাল পৌষ মাস।)

প্রাণের কথা।

বেদান্তসার বলিয়াছেন ;—"উপাসনানি সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপার রূপানি।" অর্থাৎ, সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মনের ক্রিয়া-বিশেষের নাম উপাসনা। কেবল বেদান্তসার কেন, সকল শাস্ত্রই নানাভাবে জীবকে উপদেশ দিতেছেন যে, সর্ব্বসুখাধার পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা-বলেই জীব ভীষণ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, জরা-জন্ম-মৃত্যু-শোকতাপের অতীত যে পূর্ণানন্দময় অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এক্ষণে সহজে এই উপাসনার বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক।

* * *

এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, "যে অবস্থা লাভ করিলে জীবের কোন রূপ অভাব, কোন রূপ চিন্তা থাকে না, সেই অবস্থা লাভের জন্য যে আচরণ তাহাই উপাসনা।" উপাসনা শব্দের ধাত্বর্থ—অতি সন্নিধানে থাকা। উপ এই উপসর্গের অর্থ সন্নিধি, আর আস ধাতুর অর্থ থাকা সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা বলিলে তাঁহার সন্নিধানে থাকা বুঝিতে হইবে।

* * *

উপ+আস+অন্+আ=উপাসনা। অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে জীব পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রেম-সিন্ধুর গভীর তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, যে অবস্থার বলে জীব ভূমানন্দের অধিকারী হয় তাহার সাধনোপযোগী যে কৌশল তাহার নামই উপাসনা। ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যকার উপাসনার একটী অতি সুন্দর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ;—"উপাসনং তু যথাশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্।" অর্থাৎ, যথাশাস্ত্র কোনও পথ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভগবানে চিত্তবৃত্তি তন্ময় করাকেই উপাসনা বলে।

* * *

এক্ষণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এরূপভাবে নিজের সত্ত্বাকে ভগবানের সত্ত্বায় ডুবাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, জীবের সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। অর্থাৎ, আমরা বহু সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পরেও করিব। শ্রীভগবান জীবোপদেশচ্ছলে নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সমস্তই অবগত আছি। কিন্তু হে পরন্তপ! তোমার জ্ঞানশক্তি আবৃত থাকায় তুমি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছ না।

* * *

জীব, কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ অর্থাৎ "আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা, আমিই সকল করিতেছি" এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম-দ্বারা জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আপন স্বরূপ গোচরিভূত হইতেছে না, আমি যে কে, এবং কাহার শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া হৃদয়ে বল বুদ্ধি সঞ্চার করিতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। যতদিন এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হৃদয়ে বলবতী থাকে ততদিনই জীব সাংসারিক নানাবিষয়ে বিভোর হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং "আমিই সুখী আমিই দুঃখী এই প্রকার অনুভব করে।

* * *

কষ্ট বোধ হইলে যেমন কষ্ট শূন্য অবস্থা মনে পড়ে এবং অন্ধকার দেখিলেই যেমন আলোকের অস্তিত্ব আপনা হইতে মনে জাগে সেইরূপ এই সুখ দুঃখ ক্ষয় বৃদ্ধির অতীত যে জীবের নিত্য প্রীতিময় অবস্থা ও নিত্যানন্দময় ধাম আছে তাহা এই জাগতীক ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখাদি দ্বারাই বেশ অনুভূত হয়। যে পরমধামের শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া তাহারই প্রতিচ্ছায়া দ্বারা এই জগৎকে প্রতিবিম্বিত করিয়া এত মধুময় করিয়া তুলিতেছে সেই ছায়া ধরিয়াই কায়াকে পাওয়া

যাইবে এই যে ছায়া ধরিয়া কায়াকে লাভ করিবার উপায় বা পন্থা ইহাকেই উপাসনা নামে অভিহিত করা যায়।

* * *

এই উপদেশ প্রকার ভেদে অনেক রকম দেখা যায়। যে কোন প্রকারেই হউক সেই পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত একটী সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়া আপনাপন গুরুদেবের উপদেশানুসারে কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ এমন দেবগণ-বাঞ্ছিত মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া কেবল শৃগাল কুকুরের মত ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ;—

"লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং
তত্রাপি পুংস্তং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্ম মুক্তৌনযতেত মূঢ়ধীঃ
সহ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্য সদ্‌গ্রহাৎ ॥"

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

অনুযোগ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ।)

—ঃ০ঃ—

ওগো তমালবনের আলো!
ওগো, গোঠের রাখালরাজা ব্রজের নয়নমণি কালো!
অসময়ে থেকে থেকে
বাঁশীর তানে ডেকে ডেকে
উদাস প্রাণে কেন গো আর প্রেমের আগুন জ্বালো?
ঘরেতে আর রইতে নারি,
ছল করে যাই আনতে বারি
সেথায়, নদীর-কূলে কদম-তলে তোমায় দেখে বাসি ভালো॥

ওগো নিঠুর পাষাণ হরি!
সেইকো অসাধ আস্‌তে হেথা; কলঙ্কে যে বড় ডরি।
বুঝেও তুমি বুঝনা যে,—
যখন থাকি গৃহকাজে
ভুলেও তুমি তখন যেন ডেকোনা হে বংশীধারী!
ডাকলে পরে আপন-হারা
ছুট্‌বো পথে পাগল-পারা
সবাই কবে, কলঙ্কিনী হ'লো বুঝি কুলনারী।

বিভু।

(লেখক—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ।)

হেরি আলোকে হেরি আঁধারে
হেরি সাগরে হেরি ভূধরে
হেরি নগরে হেরি কাননে
হেরি পুলকে হেরি রোদনে
হেরি, ইন্দ্র-ধনুর বরণে,
হেরি প্রখর-রবি কিরণে,
হেরি, দামিনী-দীপ্ত, তারকা-লুপ্ত,
অমার নৈশ গগনে।
রহ, অনলেতে তুমি গলিয়া,
থাক, বিমানে সদা মিশিয়া,
তুমি, স্থূল ভুবনে, সূক্ষ্ম কারণে
ভ্রমিছ সদা ভ্রমিয়া॥

হেরি নিকটে　　　　হেরি সুদূরে
হেরি ভিতরে　　　　হেরি বাহিরে
হেরি গোপনে　　　　হেরি গোচরে
হেরি অধিরে　　　　হেরি গরলে
হেরি বিশ্ব ব্যাপিছ হাসিয়া,
সদা, অমেয় রূপেতে সাজিয়া,
তুমি, চন্দ্রমা তারা,　　　　মুক্তার পারা,
আকাশে রহ শোভিয়া।
তুমি, আমার মাঝে বসিয়া,
তবে, কেন হে মরি ভ্রমিয়া,
মোরে, প্রজ্জ্বল কর,　　　　কল্মষ হর,
মোহ আঁধার নাশিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ।*

(প্রথম প্রস্তাব)

(লেখক—শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য।)

—:০:—

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—দ্বাপর যুগের অসংখ্য সৈন্য সামন্তের ভারে আক্রান্তা হইয়া পৃথিবী দেবী মনে মনে লোক-পিতামহ পদ্মযোনী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি অশ্রুমুখী গাভীরূপ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন।

---

* গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের মাঝে মাঝে বঙ্গ-বিশ্রুত বক্তা ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসন্ন মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন মহোদয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

গো, ব্রাহ্মণ, এবং যাগ-যজ্ঞ-দ্বেষী, ভক্ত-নিন্দুক, পরশ্রীকাতর পাপাচার পরায়ণ কংশ ও তাঁহার অনুগত কেশী, প্রলম্ব, প্রভৃতি মানব বেশধারী দুর্দ্দান্ত দৈত্য-গণের অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি একেবারেই অসক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভগবান্ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ধরণীর এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচন শিব, ও অন্যান্য দেবগণ ধরার সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন সৃষ্টি করা আমার কার্য্য—কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা ও পালন করা ভগবান বিষ্ণুর কার্য্য সুতরাং তাঁহার নিকটে এসকল কথা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য সেখানে তিনি সমাগত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক বেদমন্ত্রে দেবাদিদেব সর্ব্বদুঃখ-বিনষ্টকারী সর্ব্বশুভদ মঙ্গলময় ভগবান বিষ্ণুর স্তব, স্তুতি ও আরাধনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই ভগবান বিষ্ণুর আদেশ আকাশবাণী স্বরূপ শ্রবণ করিয়া দেববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে স্বর্গধাম নিবাসী অমরগণ! যদি অমরত্বলাভের অভিলাষ থাকে তবে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের যে কথা শুনিতে পাইলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ অন্তর্য্যামী,—তাঁহাকে কি আবার বলিয়া জানাইতে হয়? তিনি আমাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই দৈত্য পীড়িতা ধরণীদেবীর সমুদয় সন্তাপ ও দুঃখ ক্লেশের কথা জানিতে পারিয়াছেন। তিনি আপনার বাক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মর্ত্তলোকে প্রকট বা প্রকাশ হইয়া আপনার কাল-শক্তি দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত ভূভার হরণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন ততদিন তোমরা নিজ নিজ অশেষ অংশের সহিত তৎসহচর যদু ও পাণ্ডবগণের পুত্র পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিবে। পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরি স্বয়ংই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ জ্ঞানবান্ বসুদেব গৃহে আবির্ভূত হইবেন। সুতরাং দেবপত্নীগণ সেবা পরিচর্য্যাদি দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত এবং তদীয় হ্লাদিনী শক্তিরূপিনী শ্রীরাধা ও রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতির দাসীত্ব করিতে জন্ম গ্রহণ করুন। এমন কি বিশ্ব-সম্মোহিনী ভগবতী বিষ্ণু মায়াও সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন।

এখানে আমরা নরবপু ও মানবতার সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। দেবতা-গণ ও দেবপত্নীগণকে পর্য্যন্ত চরম ভোগ-ভূমি সুখময় ধাম স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ত্ত্য ভুবন নরবপু ধারণ করিয়া মানুষ হইয়া আসিতে হইতেছে।

ইহাদ্বারা দেব-জন্ম অপেক্ষা মানব-জন্মের বিলক্ষণ প্রাধান্য, গৌরব ও সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

যখন লীলা করণের সমুদয় বন্দোবস্ত, সমস্ত আয়োজন ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন।

অনাদি অনন্তকাল হইতে, সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর সংযোগে পবিত্র সামবেদ যাঁহার আগমনী সঙ্গীত গাইয়া আসিতেছেন সংযম-কঠোর যাজ্ঞিকের হোমানল-প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞের পবিত্র ধূমপুঞ্জ যাঁহার চরণ কমল অন্বেষণ করিয়া কত যুগ যুগান্তর, কতকাল মন্বন্তর, নীল নভোস্থলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে;—প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণার অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া যোগিগণ যাঁহার জন্য নিবীড় অরণ্য ও তিক্তকষায় ফল পত্র সার করিয়াছেন; সমুদয় বাসনা কামনায়, সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিব্রাজকেরা—দুরারোহ পাহাড় পর্ব্বতে—দুর্গম তীর্থে তীর্থে যাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিয়া মানব জীবন সার্থক করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য সংসার বিরাগী তাপসগণ সংসার স্ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যের ঝুলি স্কন্ধে লইয়া অনশন অর্দ্ধাশনে দেহমাত্র রক্ষা করিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে অশ্রুভরা নয়নে দিবা রজনী অতিবাহিত করিতেছেন; দৈত্যকুল চূড়ামণি প্রহ্লাদের প্রাণের সখা, সুনীতি-অঞ্চল-নিধি ধ্রুবের হৃদয়-নিধি—পদ্মপলাসলোচন,—বিপন্ন গজেন্দ্রের উদ্ধার কারী, মানবজীবনের পরমার্থ ধন আজ উপস্থিত! কত যোগী যতি, কত জ্ঞানী বৃদ্ধ, কত সিদ্ধ চারণ যাঁহার পাদপদ্ম লাভের আশায় উর্দ্ধ দৃষ্টে ছল ছল নেত্রে তাকাইয়া কত বন্দনাগীতি কত নিবেদন প্রার্থনা করিতেছেন,—যাঁহার কোটি চন্দ্র বিনিন্দিত চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার আশায় কত দেবর্ষি মহর্ষি কত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি—জীবনের সমুদয় ভোগ-লালসা পরিহার পূর্ব্বক গভীর ধ্যানে—ভাব সমাধিতে নিমগ্ন আছেন—সেই তিনি আজ জীবের সৌভাগ্য আকাশে সমুদিত! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁহার আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রতি দিবা রজনী মাস বর্ষ রৌদ্র বৃষ্টি মেঘ প্রভৃতি সম্পন্ন করিতেছে, পবনদেব যাঁহার অখণ্ডনীয় বিধান ও অতুলনীয় মহিমার কথা স্বন্ স্বন্ স্বরে সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় রাত্রি দিন সমভাবে অক্লান্ত বদনে গাইয়া বেড়াইতেছেন,

রত্নাকর যে রত্নবরকে বক্ষে লাভ করিয়া উত্তাল তরঙ্গে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতেছে, আনন্দের গভীরতায় ও মত্ততায় আপনা আপনি উচ্চ কণ্ঠে কল্লোল-গীতি গাইয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেছে তিনি আজ কংশের রাজধানী মথুরা নগরে উপস্থিত !

আজ মানবের সৌভাগ্যের সীমা নাই, অন্ত নাই। ভগবান্ আসিলেন, কিন্তু কোথায়—কখন্ তিনি আসিলেন ? যেখানে ঐশ্বর্য্য মদমত্ত ধনশালী রাজন্য বর্গ, প্রজাবর্গের বুকের রক্ত সদৃশ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া সুশোভিত—স্বর্গ-মণ্ডিত মেঘস্পর্শী উন্নত শির মন্দিরে—আপনাদেরই ন্যায় সেবা পূজার, রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন,—বেতন ভোগী পূজারী ব্রাহ্মণ নানাবিধ বসন ভূষণে সাজ সজ্জায় মাল্য চন্দনে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিত্য নূতন সাজে সাজাইয়া শত সহস্র দর্শকের প্রশংসা ও বাহবা অর্জ্জন করিতেছেন কিম্বা প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় উদাত্ত গভীর সামমন্ত্র ঝঙ্কারে মুখরিত শত শত তপোনিষ্ঠ ঋষির আশ্রমারণ্যে, অথবা যেখানে কর্ম্মকাণ্ড নিরত যাজ্ঞিকের যজ্ঞীয় ধূম পুঞ্জ কুণ্ডলায়িত ভাবে উঠিয়া উঠিয়া আশ্রম বৃক্ষ পত্রকে কৃষ্ণায়িত ও কজ্জল মণ্ডিত করিতেছে, কত বেদপাঠ, কত মন্ত্রোচ্চারণ, কত শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার, কত আয়োজন, কত পূজার সম্ভার, কত শঙ্খ ঘণ্টার আবাহন—সেখানে তিনি আসিলেন না ! আসিলেন কংশকারাগারে।

বর্ষাকাল, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময়ী রজনী, আকাশ ঘন-ঘোর-কৃষ্ণ মেঘাবলীতে আচ্ছন্ন, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে,—গুড় গুড় শব্দে মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জন হইতেছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে—যোগমায়া ভগবতী বিশ্ব চরাচরকে আপনার যোগ-নিদ্রায় অচৈতন্য করিয়াছেন। রাজপথে, রাজবাড়ীর দ্বারে দ্বারে অস্ত্রে সস্ত্রে সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত নগর রক্ষক—প্রহরীর দল গভীর নিদ্রায় অচেতন। দেব মন্দিরের মঙ্গল প্রদীপ নির্ব্বাপিত ! দেবল ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা আরতি সমাপন করিয়া,—নৈবেদ্য ও ভোগের সামগ্রিগুলি বস্ত্রের পুঁটলীতে বাঁধিয়া লইয়া দেবালয়ের দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ আপন গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। নগরী নীরব—নিস্পন্দ। পত্র পতনের—শৃগাল কুকুরের শব্দ পর্য্যন্ত যখন নাই। এমন সময় শতকোটি চন্দ্রের স্নিগ্ধ শীতল জ্যোতি পরাস্ত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র কংশের কারাগারের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত !

যেখানে অপরাধীগণ, দস্যু, তস্কর, দোষী, পাপীগণ দারুণ কায় ক্লেশ ও নির্য্যাতনে বেদনা-বিদ্ধ হইয়া নিরন্তর নয়নজলে নির্জ্জন কারাকক্ষ ভাসাইয়া দেয়, যেখানে আমরা ঘৃণার সহিত অপরাধীগণকে আবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার কঠোর শাস্তিতে জর্জ্জরিত করি, সেই পতিত পাপী অনাথ নিরাশ্রয় অপরাধীগণের কারাগৃহে পতিত-পাবন, পাপীর-শরণ, অনাথ-নাথ, বিশ্বম্ভর হরি আসিয়া উপস্থিত। কারাগার হইলে কি হইবে, ভক্ত বসুদেব দেবকীর যাতনা যে তাঁহার পক্ষে অসহ্য। বসুদেব দেবকীর অন্তরের ডাক যে সেই অন্তর্য্যামী হরির নিকট পহুঁছিয়াছে, তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভক্ত-বৎসল কি ভক্তের বেদনা স্বচক্ষে দেখিতে পারেন? ভক্ত অনন্য-শরণ হইয়া কাতরে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে ডাকিলে যে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। আমরা মনে করি দেবালয়ে, মেঘস্পর্শী উচ্চশির মন্দিরে, তীর্থ ক্ষেত্রে—বৈকুণ্ঠেই শুধু তাঁহার বাস করিবার স্থান। এ কথা যে সত্য নয়,—ভক্তের জন্য যে তিনি যে কোনও স্থানে গমন করিতে প্রস্তুত, ভক্তের মান রক্ষার জন্য তিনি যে স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন—পতিত-পাবন—পাপী-তারণ যে পতিত পাপীকে উদ্ধার করিয়া ক্রোড়ে লইবার জন্য ছল ছল নেত্রে তাহাদের পাপ-কক্ষে ও পিশাচ-লীলা-নিকেতনে মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন—তাহাই প্রমাণিত করিবার জন্য হরি আজ কংশ-কারাগারে অপরাধী বন্দীগণের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। পাপীর চক্ষু নাই, তাই সে ভুবন মোহন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে না, কর্ণ নাই তাই তাঁহার অমিয়-ক্ষরিত স্নেহ পূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পারে না। তারা না দেখুক—না শুনুক, তিনি নিশ্চয়ই আসেন। পাপী ভুলুক তিনি ভুলিতে পারেন না। জীব সে সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তার এত দুর্দ্দশা, এত দুঃখ, এত ক্লেশ। মায়ার এমন প্রাণান্তকারি বন্ধন!

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

* * *

নিত্য-বদ্ধ, কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্য-সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জারি তারে মারে॥
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ।)

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ।)

প্রভু যে শুধু মন্দিরেই যান না, কারাগারেও যান, প্রভু যে শুধু মন্ত্রেরই বশ নন, ব্যাকুল আহ্বানেরও বশ, প্রভু যে শুধু সাধু পুণ্যবান ও ভক্তের পবিত্র গৃহেই আগমন করেন না পাপী তাপীর নিকটে কারাগারেও যে তিনি যাইয়া থাকেন, তাঁহার যে সর্ব্বত্রই গমনাগমন আছে ও হইতে পারে তাহাই ভালরূপে মন্ত্রতন্ত্রাভিজ্ঞ বচন-বাগীশ অভিমানী বিপ্রগণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রভু আজ কারাকক্ষে উপস্থিত! আর বাসুদেব দেবকী? "প্রথম জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দেবকীর নাম ছিল পৃশ্নি, আর এই নিষ্পাপ বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে প্রজা-সৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করিলে তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

বর্ষাবাতাতপহিমঘর্ম্মকালগুণানন্নু।
সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ॥
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহথুঃ॥
এবং বাং তপ্যতোর্ভদ্রে তপঃ পরমদুষ্করম্।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩৪—৩৭ শ্লোক।)

বর্ষা, বাত, রৌদ্র, শিশির, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কাল-গুণ সকল তাঁহাদিগের উপর বহিয়া যাইতে লাগিল। প্রাণায়াম দ্বারা তাঁহাদের মনোমল দূরীভূত হইয়াছিল, বৃক্ষের গলিত পত্র ও বায়ু মাত্র আহার করিয়া ভগবানকে পুত্র-প্রাপ্তি কামনায় কঠোর আরাধনা করিয়াছিলেন। ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সুকঠোর

তপস্যা করিতে করিতে দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর গত হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে তাঁহারা ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

জলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত-লাগি ধায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥

সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কংশ-কারাগারে উপনীত হওয়া আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন—

ভক্ত-রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার॥
অকর্ত্তব্য করে প্রভু সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষি বালী বধ সুগ্রীব নিমিত্তে॥ (৩য় অধ্যায়, অন্ত্যলীলা)

আবার শ্রীভগবান শ্রীমুখেও বলিয়াছেন :—

ভক্ত-বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্ত-বশ স্বভাব আমার॥

(১ম অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্ত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভক্ত-চূড়ামণি অম্বরিষ রাজার প্রসঙ্গে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন :—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত-জনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, আমি ভক্তাধীন, সাধুগণের সাধুতায় আমার হৃদয় অভিভূত ও পরাজিত—ভক্তিতে ভক্তগণের আমি অতিশয় প্রিয়। মদ্ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি আমার আত্ম-বশ নহি; সাধুগণই আমার হৃদয়, আর সাধুগণের হৃদয়ই আমি—তাহারাও আমা ভিন্ন অন্য জানে না, আমিও

তাহাদের ভিন্ন জানি না, তাহাদের আমিই গতি আমারও তাহারাই গতি। তাই ভগবান্ আজ ঘৃণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগৃহে ভক্ত-রক্ষার নিমিত্ত আবির্ভূত! সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং সাধু-ভক্তগণ-বিদ্বেষী পাপাত্মাগণের বিলোপ-উদ্ধার-সাধন উদ্দেশ্য ভগবান্ এই রূপেই যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মৎস্যাদি অবতারগণেরও এই কারণই আবির্ভাব হইয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে আসিলেন! মানুষ তাঁহাকে কত সুরে, কত ছন্দে, কত আকুলি বিকুলি করিয়া ডাকিয়াছে, তাঁহার জন্য কত সুন্দর সুন্দর, কত গগন-স্পর্শী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া কত ঝাড় লণ্ঠন, কত রত্ন দীপ কত আলোক রোস্নাই জ্বালাইয়াছে তিনি তথায় তখন আসিলেন না, তিনি আসিলেন প্রাবৃটের ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর তমিস্রা ভরা রজনীতে সকলে যখন নিদ্রামগ্ন! সুখ শয্যায় শায়িত! কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার অবসর পাইল না, সেই চিরপ্রিয়তমের রক্তোৎপল চরণ যুগল নয়নের জলে ধৌত করিয়া দিয়া কেশজালে মুছাইয়া দিবার সময় পাইল না। তিনি অন্ধকার কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের কাল সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পরম রমণীর শোভা ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও অন্যান্য গ্রহতারকা শান্ত ভাব ধারণ করিল। দিক্ সকল প্রসন্ন ও গগন মণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রগণ প্রকাশ হইতে লাগিল। পৃথিবীস্থ পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ এবং আকর সকল বহুল মঙ্গলময় হইতে থাকিল। নদী সকলের জল প্রসন্ন হইল, হ্রদ সকল কমল-মালায় শোভাশালী ও বনরাজী সমূহ পক্ষি ভ্রমরাদির কলরবে পরিপূর্ণ, পুষ্প-স্তবকে শোভিত হইয়া উঠিল। পবন সুখস্পর্শ হইয়া পুণ্য গন্ধ দশদিক আমোদিত করিয়া বহিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দুন্দুভি ধ্বনিত হইল, গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান, সিদ্ধচারণ নিকর স্তব এবং অপ্সরাগণের সহিত বিদ্যাধরগণ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল, দেব ও ঋষিমণ্ডলী হর্ষান্বিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, মনের আত্যন্তিক আনন্দে জলধর সমূহ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল—এমন সময় পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংশকারা-গৃহে সমুদিত হইলেন। কিবা তাঁহার অপূর্ব্ব ভুবন-মনোমোহন রূপ;—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥

মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষক্ত সহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, দশমস্কন্ধ, ৩য় অধ্যায় ৯।১০ শ্লোক)

পদ্মপলাস তুল্য সুন্দর লোচনদ্বয়, শঙ্খচক্র গদাপদ্ম প্রভৃতি আয়ুধ শোভিত—সুকোমল চতুর্ভুজ, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজমান—কণ্ঠদেশে কৌস্তুভ-মণি,—পরিধানে পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধর তুল্য শ্যামসুন্দর, মহামূল্য বৈদূর্য্য মুকুট ও কণক কুণ্ডল শ্রীমুখের শোভা বৰ্দ্ধন করিতে যাইয়া নিজেরাই পরম শোভন হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মানুষের কি ভ্রম! যুগযুগান্তর যাঁহার শ্রীমুখকমল ধ্যান করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত বাৎসল্য প্রেমের অভিনয় করিয়া আসিতেছেন—সেই বসুদেব দেবকী আজ তাঁহাকেই চিনিতে পারিতেছেন না। কত স্তব, কত স্তুতি বন্দনা করিতে লাগিলেন "হে বিভো! অখিলেশ্বর! তত্ত্ব-দর্শীরা বলেন—আপনা হইতেই এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতেছে—অথচ আপনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী। আপনি ত্রিলোকীর প্রাণনাথ, স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণান্বিত রক্ত বর্ণ গ্রহণ করেন এবং প্রলয় সময়ে কৃষ্ণবর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন। হে বিভো! আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন!"

ভক্ত-কথামৃত।*

(লেখক।—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।)

—০—

মহাপ্রভুর নিত্যলীলা, সর্ব্বকাল স্বয়ং প্রকাশ আছেন।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

---

* সহৃদয় পাঠকগণ! এই প্রবন্ধটীর সকল স্থানের সহিত আমাদিগের মতের মিল হয় না। তথাপি, ভক্ত কথামৃত বলিয়া প্রকাশ করিলাম। যদি প্রবন্ধ পাঠে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে তবে তিনি উহা লিখিয়া পাঠাইলে ভক্তিতেই যথাযথ প্রকাশ হইবে। (ভক্তি সম্পাদক।)

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে করিয়াছেন দৃঢ়॥"

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রেমের বাধক শুভকর্ম্ম, তজ্জন্য হরিভক্তিবিলাস স্মৃতি ইত্যাদি কোন শাস্ত্র মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার বিধি প্রকাশ্যভাবে দেন নাই; মহাপ্রভু, স্বতঃ স্ব-প্রকাশ, অজ্ঞান তমঃ নাশ হইলেই সর্ব্বত্র মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইবেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে কোন ভক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে পূজা বিড়ম্বনা হয়। কোন ব্যবসায়ী গুরু, অর্থ উপায়ের জন্য শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যভিচার করিয়াছেন, পঞ্চম বেদ, আত্ম সমর্পণকারী ভক্ত ভিন্ন বেদ বিধি দ্বারা মহাপ্রভুর পূজা হয় না; "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দ লালা।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতের সকল গ্রন্থের সার, উহা পঞ্চম বেদ বলিয়া কীর্ত্তিত। আচণ্ডালে প্রেম দানই, উহার উদ্দেশ্য; এই গ্রন্থে, সকল জীবের সমান অধিকার, তবে পতিত হওয়া চাই।

অনুরাগী গুণাতীত, কর্ম্মাতীত, বাহ্য জগতে থাকেন না। তাঁহারা অধ্যাত্ম জগতে, নিকুঞ্জ লীলা দর্শন ও আস্বাদন করেন। রাগ মার্গ সাধারণের দৃশ্য নহে, ভাবের গোচর; যথা—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥" (চরিতামৃত।)

বাউল বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই; অপ্রাকৃত দেহে, কৃষ্ণ প্রেমে, দিব্যোন্মাদ হইলে বাউল হয়। প্রাকৃত ধর্ম্ম ধ্বজী, বাউল নহে; উহারা নকল বাউল। "তুমি এক বাউল, আমি দ্বিতীয় বাউল, অতএব তুমি আমি হই সমতুল।" চরিতামৃতের এই বাউলই বাউল। এ বাউলের অনুকরণ হয় না। বাহ্য জগতে নিরপরাধ নাম সংকীর্ত্তন, অধ্যাত্ম জগতে রস আস্বাদন। এই অধ্যাত্ম ভাব কেবল স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহ দেখিতে পান নাই, দেখিলেও বুঝিতে পারেন নাই। উহা অত্যন্ত নিগূঢ়।" "বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।" "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল জ্ঞানে নহে মোর প্রীত॥"

"কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগ মার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥"

এই ভাব অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত বহির্জ্জগতে পাইবার উপায় নাই।

"দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মাদি বিচার।
সাধন ভক্তি এ চারি বিচারের পার॥
সর্ব্ব দেশ কাল দশা জনের কর্ত্তব্য।
গুরু পাশ সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য॥"

মায়াতীত না হইলে মাধুর্য্য-ভাব অনুভব হয় না; মায়াতীত হইবার জন্য প্রথমতঃ মহামায়া যোগ মায়ার সাধনা করিতে হয়; তাহা বাক্য মনের অগোচর, অব্যক্ত, সাধু সঙ্গ লাভগম্য; সম্প্রদায়ী বাউলগণ সাধুসঙ্গের অভাবে রাগ মার্গ আচ্ছাদন করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে কলঙ্ক আনিয়াছেন। উহারা মহাপ্রভুর মত লইয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসহ একটু স্বমত সংযোজিত করিয়া সত্য পথটীকে কলঙ্কিত করিয়াছেন এক কলস দুগ্ধে একবিন্দু সুরা দিলে সমুদায় দুগ্ধই নষ্ট হয়। "নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে, শুক্ল বস্ত্রে যেন মসী বিন্দু।" এই সকল বাউল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতরূপ মহাসত্যপথে বিবর্ত্ত-বিলাসরূপ একটী কল্পিত মেঘ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিবর্ত্ত বাদ মহাপ্রভুর মত নহে; পরিণাম বাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বতঃ স্বপ্রকাশ ভাব গ্রহণের হেতু ধর্ম্ম স্থাপন; "অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর" বাহিরে রাধাভাব। প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতি হইতে হইবে; যেরূপ কাঁচপোকা আরসলাকে নিজ রং ধরায়, তদ্রূপ। বাউলগণ বিপরীত কার্য্য করিতেছেন, প্রকৃতিগুলিকে শ্রীমতি সাজাইয়া প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতের অনুকরণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মহাকবি চণ্ডিদাস প্রভৃতি স্বয়ং শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি হইয়াছিলেন। "পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হব, এক দেহ হৈয়া নিত্যেতে যাব।" ইঁহাদিগকে শরণাগত, পতিত, অকিঞ্চন হইতে হইবে। কিন্তু শিক্ষার দোষে সকলে সাধু মহান্তিরূপে ব্যবসায়ী গুরু হইয়া অনেক অবলার জীবন নষ্ট করিতেছেন।

ইঁহারা যদি কোন প্রকারে সাধুসঙ্গ পায়, তাহা হইলে সমুদ্রে নদীমিলনের ন্যায় সমুদায় উপধর্ম্মগুলি মহাপ্রভুর শরণাগত হয়। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মত অদ্বৈতবাদ, উহা এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও মায়া মিথ্যা, ইহাতে নির্ব্বাণ হয়; সেব্য সেবক ভাব থাকে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিণাম বাদ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বে জগৎ ও মায়া, সত্য ও নিত্য। জীবের দেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। "কৃষ্ণ নিত্য দাস জীব তাহা ভুলি গেল। সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥" দাস প্রভু সম্বন্ধ ভিন্ন ভক্তির পথে যাওয়া যায় না।

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥"
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞী।

*　　*　　*

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে জল মিশায়।
চিনি হওয়া ভাল নয় খেতে ভাল বাসি।
কৌতুকে প্রসাদ্ বলে, করুণা নিধির বলে
চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাব্‌লে এলোকেশী॥"

অচিন্ত্য ভেদাভেদ—এইরূপ, প্রেমের বলে শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের মিলন, ইহা অভেদ, আর বাহ্যে ভেদ; চিন্তা দ্বারা এ ভাবের অন্ত পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অচিন্ত্য। চক্ষে এ ভাব দর্শন করিলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়।

ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে পূজা বিড়ম্বনা হয়। অর্থ উপায়ের জন্য শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রকাশ, ধর্ম্মের ব্যভিচার।—প্রেম ব্যতীত, বেদ বিধি দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা হয়না। "বিনা প্রেমসে নাহি-মিলে নন্দলালা।"

নব ছিদ্রবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দেহ দ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি। বংশীধ্বনির বাহিরে বিষজ্বালা, অন্তরে আনন্দ। বাহিরে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি হইতে থাকে, পাষণ্ডগণের উহাতে হৃদ্‌কম্প হয়, এই ধ্বনির স্বর এইরূপ—"প্রলয়কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে, জন-মনোহরা শমনসোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে।"

আবার ভক্তগণের নিকট উহা—"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন ধ্বনি জিনি, যার গানে কোকিল লাজায়। যার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে, পুনঃ কাণ বাহুড়িয়া যায়।"

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

শব্দ ব্রহ্মের পারগামী এবং পরব্রহ্মে নিমগ্ন ভক্ত ব্যতীত গুরু হওয়া যায় না।

"অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কন্মীকে কি কর্ম্ম ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ।
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোর চুরী করে,
তুমি যাও পরের ঘরে, এ তো বড় রঙ্গ॥"

শ্রীগুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, নাম, সর্ব্বকালই সত্য; নিত্য নূতন সত্যের মাহাত্ম্য নাই। কাজেই মিথ্যা গুরু কেহই করিবেন না।

প্রেরিত পত্র।*

মাননীয়—শ্রীভক্তি পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

ভক্তি ভাজন সম্পাদক মহাশয়!—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় আজ কাল চারিদিকেই ভক্তি-মত প্রচারিত এবং ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, ইহা অবশ্যই সুখের বিষয়, কিন্তু দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় আমরা প্রাচীন যে কয়েকজন হতভাগা আছি এই প্রচারের মধ্যে সবতা অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিলে

* ময়মনসিংহ, সেরপুর টাউন হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দাস মহাশয় এই পত্রখানি আমাদিগকে লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ভক্তিতে প্রকাশ করিলাম। এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন কিছু বক্তব্য থাকে তাহা পাঠাইলে আমরা সাদরে ভক্তিতেই প্রকাশ করিব। (ভক্তি-সম্পাদক।)

প্রাণে বড় বাজে। আবার তাহাই যদি কেহ গৌরব করিয়া সমর্থন করেন তবে নিতান্তই অসহ্য বোধ হয়। অনেক দিন হইতেই অনেক কথা শুনিতেছিলাম। ভাবিতাম সহিয়াই যাইব, কিন্তু প্রভু তাহা দিলেন না।

আপনি নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুতরাং আমাদিগের বড়ই আদরের পাত্র, আপনার ভক্তি-নিষ্ঠা দেখিয়া যেমন বড়ই সুখ হয়, তেমনই আপনার কাগজে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ প্রবন্ধ দেখিলে আবার ততোধিক মনোকষ্ট পাই।

গত বর্ষের চৈত্র মাসের সংখ্যায় ভক্তিসাগর মহাশয়ের লিখিত "কি আনন্দ শ্রীচন্দ্রশেখরে" নামক প্রবন্ধ বাস্তবিকই নিতান্ত সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। শ্রীএকাদশী দিবসে মহোৎসব কোন্ বিধি অনুসারে হইল? প্রাচীন নিত্য-সিদ্ধ শ্রীহরিনামের পরিবর্ত্তে নূতন হাত গড়ান নাম দ্বারা অষ্ট প্রহর নির্ব্বাহ ইহাইবা কেমন বিচার?

নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না এরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব কি কেহ আছেন? প্রবন্ধ পড়িয়াই বোধহয় যেন সরল বিশ্বাসী কোমল শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে ক্ষেপাইবার জন্যই ভক্তিসাগর মহাশয়ের এ কল্পিত পরিবাদ। সম্ভবত কোন সজ্জন বৈষ্ণব অরুণাচলের বাবু সন্ন্যাসীদিগের মোসলমানি জারিগানের সুরে প্রচারিত নূতন ধরণের 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' নামে অষ্টপ্রহর সম্পন্ন হওয়ার প্রতিবাদ করিয়া থাকিবেন। সত্য হইলে প্রতিবাদ ঠিকই হইয়াছিল। যদি শ্রীনিতাই গৌরের নাম দিয়াই অষ্টপ্রহর করিতে হয় তবে তাহারও প্রাচীন গান আছে, যথা- শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তিত "জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরাঙ্গ" এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের" শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোর চন্দ্র" প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত চরণ দাস বাবাজি মহাশয় ভজন শীল মহাত্মা ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্ব মহাজনদিগের প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যদি নূতন ছাঁচে নাম ঢালিয়া থাকেন তবে উহা "মেকী" নয়তো কি?* নামের মহিমায় অতি

---

* যদি "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরে রাম" এইটী হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তবে উহাকে "মেকী" বলা চলে। কিন্তু ঐ নামটী ঐরূপ নহে ঐনাম স্বয়ংই ভজনীয় তত্ত্ব ও জপের মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, যথাঃ—
"ভজ, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" (ভক্তি-সম্পাদক।)

আকুল এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক মেকী নামে ভুলিতে পারে কিন্তু রসজ্ঞ ভক্ত মাত্রেরই মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে উহা শেল সম বাজিবে।

কথা নিয়া নারা চারার অভ্যাস বা সময় আমার নাই। বহু কাগজে নূতন নূতন বহু প্রকারের কথাই বাহির হইতেছে কিন্তু আপনার কাগজেও এইরূপ স্বেচ্ছাচারী প্রবন্ধ দেখিয়া এত গুলি কথা লিখিয়া ফেলিলাম। কৃপাকরিয়া আমার এই পত্রখানি আমূল প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

আর একটী কথা বলি, উচ্চ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া অষ্ট প্রহর নির্ব্বাহ প্রাচীন রীতি নহে * পূর্ব্ব দিবস সায়াহ্নে অধিবাস করিয়া রাখিতে হয় তৎপরে যথা কালে শেষ রাত্রে নিশান্ত লীলা ও কুঞ্জ ভঙ্গাদি অষ্ট কালীন সমগ্র লীলা গান আরম্ভ করতঃ অহোরাত্র কীর্ত্তন করিয়া তৎপর দিবস নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা নগর ভ্রমণ অন্তে শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গনে ফিরিয়া আসিয়া সমাপন গীতিকা এবং শ্রীমহান্ত বিদায় প্রভৃতি গান-দ্বারা উৎসব সমাপন করিতে হয় ইহাই প্রাচীন আচার। নতুবা অরুণাচলের বাবু সন্ন্যাসীদিগের প্রচারিত বিকট চিৎকারে সজ্জাজন রক্ষা পায় না। অলমিত বিস্তরেণ।

ভক্তির সাধন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ সরকার, এম, এ, বি, এল।)

—:০:—

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন;—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তি স্ততো ভাব স্তত প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

---

* লীলা এবং উচ্চ নাম কীর্ত্তন উভয় প্রকার সদাচারই প্রচলিত আছে। বরং সাধারণস্থলে লীলা কীর্ত্তনের নিষেধই দেখা যায়। (ভক্তি-সম্পাদক।)

অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে প্রেম আবির্ভাবের পূর্ব্বাপর ক্রম এইরূপ :—(১) শ্রদ্ধা (২) সাধুসঙ্গ (৩) ভজন ক্রিয়া (৪) অনর্থ নিবৃত্তি (৫) নিষ্ঠা (৬) রুচি (৭) আসক্তি (৮) ভাব (৯) প্রেম। উক্ত শ্লোকের অর্থে শ্রীমৎ জীব গোস্বামীপাদ অভিপ্রায় করিয়াছেন যে, প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা ও তাহা হইতে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। তাহার পর ভজন রীতি শিক্ষার নিমিত্ত পুনশ্চ সাধুসঙ্গ। অতএব প্রথম তিনটী অবস্থা সর্ব্বতোভাবে সাধুসঙ্গের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য আদৌ সাধুসঙ্গই প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীকে ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাতেও সাধুসঙ্গের প্রথম স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যথা—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণ-সেবা, ভাগবত, নাম,
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান।

শাস্ত্রের নানাস্থানে ভক্তিলাভ সম্বন্ধে সৎসঙ্গের মহিমা উচ্চরবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন, যথা—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি॥

অর্থাৎ সাধুদিগের সংসর্গে আমার শক্তি সম্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা হইতে থাকে, সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কাহারও মতি সংসার বাসনা নাশের উপায় যে ভগবানের চরণপদ্ম তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৃহন্নারদীয় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।

ভক্তি, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ—

রবিশ্চ রশ্মিজালেন দিবা হন্তি বহিস্তমঃ।

সন্তঃ সূক্তিমরীচ্যোঘৈশ্চান্তর্ধ্বান্তং হি সর্ব্বথা॥

সূর্য্য, কিরণমালা দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, কিন্তু সাধুগণ তাঁহাদের সদুক্তিরূপ কিরণজালের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভিতরের অন্ধকার নাশ করেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্ত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনীটীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—"তত্র বহুষু অপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ আদাবিতি দ্বয়েন" অর্থাৎ ভক্তির বহুবিধ ক্রম আছে তাহার মধ্যে "আদৌ শ্রদ্ধা" এই শ্লোকদ্বয়ে প্রায়িক একটী মাত্র ক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তি শাস্ত্রের বিভিন্ন আচার্য্য মুখ্য ও গৌণভাবে ভক্তির অভ্যুদয়ের বিভিন্নরূপ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ-রামানুজাচার্য্য ভক্তি সাধনের কিরূপ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বৌদ্ধ-বিপ্লবে যখন সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত ও কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়োন্মুখ হইতেছিল, তখন ভট্ট কুমারিল ও স্বামী শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানপথ প্রকটন পূর্ব্বক সেই বিপ্লব বিদূরিত করেন। কিন্তু তখনও ভক্তের হৃদয়ধন, ভাবুকের কণ্ঠমণি বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিহিত ছিল। অদ্বৈতবাদীর দুর্ব্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিত ব্রহ্মসূত্র ভক্তি-সঞ্জীবনী সুধার দ্বারা সঞ্জীবিত করিবার মানসে, বৌধায়ন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভাষ্য রচনা করিয়া পরম দার্শনিক ভক্তচূড়ামণি শ্রীরামানুজাচার্য্য ভক্তিমার্গ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সন্তানরূপ ধ্রুবা স্মৃতিই ভক্তিপদ বাচ্য। এই ধ্রুবানুস্মৃতিরূপ ভক্তির সাধন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:—"বাক্যকারশ্চ ধ্রুবানুস্মৃতে বিবেকাদিভ্য এব নিষ্পত্তিমাহ তল্লব্ধ-বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া-কল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ, সম্ভবাৎ নির্ব্বচনাচ্চ।" অর্থাৎ বাক্যকার ও বিবেকাদি নিমিত্ত হইতে ধ্রুবানুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন;—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ এই সপ্ত কারণ হইতেই সেই ধ্রুবানুস্মৃতি লাভ করা যায়।

১। বিবেক :—জাত্যাশ্রয়-নিমিত্তাদুষ্টাদন্নাৎ কায়শুদ্ধির্বিবেকঃ।

অর্থাৎ জাতিদোষ, আশ্রয়দোষ ও নিমিত্তদোষ দ্বারা দূষিত আহার্য্য হইতে শরীরকে রক্ষা করাই বিবেক। যে অন্ন উক্ত দোষত্রয়ের কোনও দোষ-দ্বারা কলুষিত সে অন্ন ভোজন করিতে নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ" আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয় ও সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবাস্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে যে A man is what he eats অর্থাৎ মানুষের ভোজনানুরূপ তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। জাতি আশ্রয় ও নিমিত্ত দোষ দ্বারা আহারীয় দ্রব্য দূষিত হইতে পারে। দ্রব্যের স্বভাবগত গুণজনিত যে দোষ তাহাই জাতি দোষ, যেমন পেঁয়াজ, রশুন, মাংসাদি। কোন আগন্তুক কারণে দূষিত অন্নকে নিমিত্ত দুষ্ট বলে, যেমন কেশনখাদি অথবা রাস্তার ধূলি বা অন্য কোন আবর্জ্জনা মিশ্রিত অন্ন। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে সেই দ্রব্যের মধ্যে সেই ব্যক্তির গুণাগুণ অদৃষ্টভাবে অনুগত হইয়া থাকে। সাধুব্যক্তির দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নে তাঁহার সদ্গুণ এবং অসাধুব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্নে যেমন তাহার অসদ্গুণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ অসৎব্যক্তির আশ্রয়দোষে যে অন্ন দূষিত হইয়া থাকে তাহাকে আশ্রয়দুষ্ট বলে। সেইরূপ অন্ন যথাসম্ভব পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

২। বিমোক।—বিমোকঃ কামানভিষঙ্গঃ।

কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম বিমোক। অন্যাভিলাষ শূন্যতা ভক্তের একটী প্রধান লক্ষণ। হৃদয়ে বিষয়াদির প্রতি আসক্তির লেশমাত্র থাকিলে উত্তমা ভক্তি কদাচ সে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায় না।

৩। অভ্যাস—কোন শুভবিষয় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত্ত সমাবেশ শিক্ষার নাম অভ্যাস। আমাদের জন্মজন্মান্তরের মূলীভূত সংস্কার বশতঃ মন সর্ব্বদা শব্দাদি বিষয় সমূহের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। কোন শুভ বিষয়ে চিত্ত সংযোগ করিলেই মনোবৃত্তি বহির্মুখী হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। পুনঃ পুনঃ এইরূপে ব্যাহত হইয়াও বিক্ষিপ্ত বৃত্তি সকলকে সংগ্রহ করিয়া ইষ্ট বিষয়ে তাহাদিগকে অভিনিবিষ্ট করা সাধকের কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানও গীতায় এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥১২।৯

৪। ক্রিয়া—শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন, "শক্তিতঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়া।" শুধু ধর্ম্মসাধকের জন্য কেন গৃহস্থ মাত্রের পক্ষেই পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বমত সমর্থন জন্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন। (বৃঃ দাঃ ৪।৪।২২)

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক্ত (ভোগতৃষ্ণারাহিত্য) দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই যজ্ঞ। যুগবিশেষে সাধনার বিভিন্নতা আছে।

কৃতে যং ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাং ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ যাজন করিয়া, দ্বাপরে পরিচর্য্যা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিকালে তাহা একমাত্র হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ (বৃহন্নারদীয়পুরাণ।)

অতএব কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তনই শাস্ত্রানুমোদিত প্রকৃষ্ট ক্রিয়া। রামানুজাচার্য্য তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কলিকালের পক্ষে যথোপযোগী বলিয়া মনে হয়না।

৫। কল্যাণ—সত্যার্জ্জব-দয়াদানাহিংসাভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি। সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিন্তা) ইহাই কল্যাণ।

৬। অনবসাদ—দেশকাল বৈগুণ্যাচ্ছোকবস্ত্বাদ্যনুস্মৃতেশ্চ তজ্জং দৈন্যমভাস্বরত্বং মনসোঽবসাদঃ। তদ্বিপর্য্যয়োঽনবসাদঃ।

এ সংসারে আমরা যাহা চাই তাহা পাইনা, যাহা পাই নিয়তির বিধানানুসারে তাহা আবার হারাইয়া ফেলি। কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ও প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদে আমাদের দুঃখদুর্ব্বল হৃদয়ে যে অপ্রসন্নতা বিরাজ করে তাহার

নাম অবসাদ। অবসাদের বিপরীত অনবসাদ। ভক্ত বীতরাগ ও বীতশোক হইতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই অনবসাদ সাধন।

৭। অনুদ্ধর্ষ—"তদ্বিপর্য্যয়োঽনুদ্ধর্ষঃ।"

কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি জনিত হৃদয়ে যে স্ফূর্ত্তি হয় তাহার নাম উদ্ধর্ষ, তাহার অভাব অনুদ্ধর্ষ। ভক্ত এই সংসারে উর্দ্ধশীর্ষ গিরিরাজবৎ বিচরণ করিবেন, সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে তাঁহার হৃদয় অবসাদে সেরূপ উদ্বেলিত হইবেনা, কৃতকার্য্যতার প্রফুল্ল রবিকিরণেও তাহা সেইরূপ উদ্ধর্ষে স্ফীত হইয়া উঠিবে না।

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। গীতা ২।৫৬

যখন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, সুখেতেও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, আর যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। শ্রীহরির চরণসরোজে যাঁহার মানসভৃঙ্গ মধুপানে মত্ত, সংসারের হাসি কান্না, আলোছায়া, ঘাত প্রতিঘাত কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ভক্তিসাধনের যে সাতটি ক্রম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সকলগুলিকে ঠিক সাধন বলা যায় না; কতকগুলি অবস্থা ভক্তের লক্ষণ। বিশেষতঃ ভক্তিসাধনের মধ্যে সাধুসঙ্গের কোন প্রসঙ্গ না থাকায় ইহা নিতান্ত অসম্পূর্ণতাদোষে দুষ্ট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভক্তপ্রবর রামানুজাচার্য্য এ সম্বন্ধে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভক্তগণের নিকট নিতান্ত উপেক্ষনীয় হইবে না বলিয়া এস্থলে তাঁহার মত যথাসাধ্য সঙ্কলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বক্তব্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধ বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রন সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি জন্য আগামী ১লা মাঘ হইতে ভক্তির মূল্য বাৎসরিক ১৲ এক টাকা স্থলে ১॥০ দেড় টাকা ধার্য্য করা হইল, বর্ত্তমান সংখ্যার কভারের ২য় পৃষ্ঠায় সবিশেষ আলোচনা হইল, এবং আগামী বারেও হইবে। (ভঃ সঃ)।

প্রাণের কথা।

বেদনা যখন লাগে, প্রাণ যখন হতাশের কঠোর কষাঘাতে কণ্ঠাগত হয়, তখন আর কিছুতেই মন স্থির হইতে চায়না। যে সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে যাইয়া কত নিরীহ-নিপীড়িতের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোলে বসুন্ধরা একদিন কাঁপিয়াছিল তাহা যেন এখন মরুভূমি বলিয়া মনে হয়, যে প্রিয়তম পুত্রের মুখ-চুম্বনে একদিন স্বর্গসুখ অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হইত তাহা যেন এখন শত শত বিশ্চিকদংশনের ন্যায় বোধ হয়, যে অর্থউপার্জ্জনের জন্য একদিন পাপ পথে, জাল জুয়াচুরির পথে প্রাণ আনন্দে প্রধাবিত হইত, বিবেকের শত শত নিষেধ বাণী কিছুতেই শুনিতনা তাহা যেন এখন ভস্মস্তুপের মত জ্ঞান হয়। এই ভাব আসে, কেবল তোমার আমার নয়, জগতের যাবতীয় মনুষ্যেরই প্রাণে যখন একটা বেদনা, যখন একটা বর্ণনাতীত যাতনা অনুভব হয়, তখন এইভাব আসে। তখন আর কিছুতেই প্রাণ স্থির মানেনা, সত্য সত্যই তখন সকল ভুলিয়া, সকল ছাড়িয়া কাতর প্রাণে কেবল বলিতে ইচ্ছা হয় ;—

ব্যথার ব্যথি হরি কে আছে আমার বেদনা জানাব কারে।
(আমার) ধরম করম, ভজন পূজন, সকলি গিয়াছে দূরে ॥
ধুলো-খেলা-ছলে বন্ধুগণসনে,
হাসিতে খেলিতে আনুআলাপনে,
দিন ব'য়ে গেল, কিছুই না হ'ল (এখন) ভাবনা হ'ল যে অন্তরে ॥
উঠিয়া প্রভাতে মনে করি আমি,
ভাবিব তোমারে ওহে অন্তর্য্যামী,
(কিন্তু) যত বাড়ে বেলা, তত হয় জ্বালা, সকলি ভুলায় সংসারে ॥
ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী,
তেমনি ক'রে এসে বাজাও হে মুরলী,
(যদি) দেখা নাহি দিবে, বল কেন তবে, আশাতে ভুলালে আমারে ॥

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নের জীবনী-প্রসঙ্গ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।)

(গুরু ও পুরোহিত সংস্কার।)

—:o:—

হিন্দু সন্তানের গুরু ও পুরোহিত না হইলে ইহলৌকিক—কি পারলৌকিক কোন সংস্কার সুসম্পন্ন হইবার উপায় নাই। প্রকৃত গুরু ও পুরোহিত বাস্তবিক হিন্দুর অনন্ত মঙ্গলের আকর। যাহাতে সেই আদর্শ বজায় থাকে ভক্তপ্রবর সাধক পণ্ডিত দীনবন্ধুর প্রাণ সে জন্য কাতর হইত। তাই তিনি গুরু ও পুরোহিত সম্প্রদায়কে আদর্শের অনুরূপ হইবার জন্য, সাধারণ সভা-সমিতিতে নানাভাবে উপদেশ দিতেন। সে উপদেশ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্রাহ্মণের অযথা কুৎসা বা কল্পিত নিন্দা করা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

লোকের মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব শিথিল হওয়ার একটি প্রধান কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে তিনি বলিতেন—

"দোষ কাহার? কাহার পাপে সেই সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের আজ এমন দুর্দ্দশা ঘটিল। কেন লোকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ ভুলিয়া পশু-প্রকৃতির অনুকরণ করিতে উদ্যত হইল। সেই রবি শশী, সেই জাহ্নবী-যমুনা, সেই বেদ-বিধি রহিয়াছে, অথচ ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ফল হয় না কেন?" রাগ করিও না, তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তোমাদের সমাজের অধঃপতিত অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া বহু রূঢ় ভাষার প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু যাহাদের দোষে তোমাদের এই অবস্থা আসিয়াছে, যাহাদের অধঃপতনে তোমাদের সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল, যাহাদের কুব্যবহারে তোমাদের মতিগতি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের কিরূপে শাস্তি বিধান করা যাইতে পারে।

তাঁহারা কে জান কি? তাঁহারা কলির প্রত্যক্ষমূর্ত্তি সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞান-হীন কতিপয় গুরু ও পুরোহিত এবং কপট ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী।

এই সকল ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের বিকৃত ভাবাপন্ন ব্যবহারে, ইহাদের অকথিত অত্যাচারে, ইহাদের মুর্খতা ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন আচরণে, আজ এই বিরাট হিন্দুসমাজ বিকৃত ও অধঃপতিত। যে ব্রাহ্মণ সরলতার আধার, যে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ দেবতা স্থানীয় যে ব্রাহ্মণ লোকশিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক ও জ্ঞানদাতা বলিয়া অতীত কালের ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, সে মহত্ত্ব আজকালের উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কয়জনের আছে? যে গুরু, শিষ্যের সকল সন্তাপ হরণ করিতেন, যে গুরু, ভবার্ণবে একমাত্র সহায়, সে দয়াল গুরুর সাক্ষাৎলাভ আজকাল কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? যে পুরোহিত সংসারীদিগের হিতকামনায় প্রণোদিত হইয়া ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, সে পুরোহিতের দল কোথায় গেলেন?

সকল গুরু-পুরোহিতই যে এই শ্রেণীর, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে অধিকাংশ ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী যে এই শ্রেণীর, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহারা সমাজ ও দেশের কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, ধর্ম্মের নামে কি ভয়ানক অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরক্ষর লোকদিগকে বিকৃত শাস্ত্রোপদেশ দান করিয়া কি ঘোর অজ্ঞানতার প্রচার করিতেছে, তাহার একটু আভাস দিতেছি, শ্রবণ কর।

সংসারী লোক নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য পুরোহিত ও গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম, আত্মার সদ্গতির জন্য সাধনাদি ব্যাপার পুরোহিত ও গুরুর নিকট শিক্ষা করিতে হয়। এই গুরু ও পুরোহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, অলোভী, অক্রোধী ও আনন্দময় ছিলেন বলিয়া অতীত কালের লোকে ইঁহাদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিত। ইঁহারাও সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন।

এখনও দেশময় ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সরলতা, সে শাস্ত্রালাপ, সে সদাচার তাঁহাদের নাই। এখনও লোকে সেই গুরু ও পুরো-হিতের আদর্শ বলিয়া ব্রাহ্মণের শরণাগত হয়, এখনও লোকে সমাজ ও

ধর্ম্মোপদেশের জন্ত ব্রাহ্মণের সহায়তা প্রার্থনা করে। কিন্তু আর কতদিন কপটাচারীদিগের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে? কতদিন আর এমন করিয়া অজ্ঞ লোকদিগকে ভুলাইয়া গুরু ও পুরোহিতেরা আপনাদিগের পৈতৃক ব্যবসায়ে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন? কেমন করিয়া লোকে, নিরন্তর মর্ম্ম-বেদনায় অস্থির হইয়া, আত্মপ্রতিম বা আপনার অপেক্ষাও অধম ব্যক্তিকে গুরু বা পুরোহিতরূপে বরণ করিবে? অবিকৃত চিত্তে তাহাদের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিবে? নীরবে তাহাদের স্বার্থলোলুপ ব্যবস্থার অনুমোদন করিবে?

দোষতো তোমাদেরই, তোমরা তো আপন বুদ্ধি ও বিবেচনার অভাবে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছ? যখন বাজারে যাও, তখন দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় এদোকান ওদোকান যাচাইয়া তবে দ্রব্য ক্রয় কর; আবার যাহা ক্রয় কর; তাহা নকল কি আসল তাহা পরীক্ষা করিয়া লও। অধিকন্তু, ক্রয় করিবার পরেও বলিয়া-থাক যে, যদি ক্রীত দ্রব্যে কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে ফেরৎ দিবে বা পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু ধর্ম্মের বাজারে তোমরা এমন অন্ধ হইয়া বেড়াও কেন? কেন তোমরা আসল ও নকল ব্যবসায়ীর পরীক্ষা কর না। পূর্ব্বপুরুষ যে দোকান হইতে ক্রয় করিতেন, সেই দোকানদার যদি অসাধু হয়, তাহা হইলে তাহার নিকটে কি তোমার নীরবে দ্রব্য লওয়া উচিত? হয়, তাহাকে সাবধান করিয়া দাও, না হয় অপর সাধু-প্রকৃতির লোকের দোকানে যাও। পুরোহিত যদি শাস্ত্রজ্ঞান হীন হয়েন, তাহাকে বলিও—"ঠাকুর! আপনি শাস্ত্রমতে ক্রিয়া কর্ম্ম না করিলে, আপনি যথারীতি শাস্ত্রপাঠ না করিলে, আপনার দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইব না, এবং আপনি যদি আপনার বংশধরদিগকে শাস্ত্রাভ্যাস না করান তাহা হইলে আমরা তাহা-দিগকে আহ্বান করিব না, অন্য কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যথারীতি পৌরহিত্যে বরণ করিব।" গুরু যদি মূর্খ হয়েন, কেবল ইন্দ্রিয়সেবী ও কদাচার সম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিবে,—"ঠাকুর! আর এমন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিবেন না। যে মন্ত্র দীক্ষা দিবেন, আমাদিগকে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে, আপনি তাহা পারিবেন তো? যদি না পারেন, তাহা হইলে আমাদের প্রাণে শান্তি আসিবে কিরূপে, আমরা মন্ত্রের ধারণা করিব কিরূপে? আপনি বৎসরান্তে একবার দর্শন দিয়া থাকেন,

আমাদের আর্থিক অবস্থার সংবাদ লয়েন ও তৎসঙ্গে আপনার বার্ষিকের কথাটারও ইঙ্গিত করেন। কিন্তু আমাদের পারমার্থিক উন্নতি কতদূর হইল, আমরা সাধন পথে কতটুকু অগ্রসর হইলাম, তাহার অনুসন্ধান করেন না বা করিবার প্রবৃত্তিও হয় না। তবে কি জন্য আপনাকে অর্থ দান করিয়া প্রবঞ্চনার সহায়তা করিব। যদি আপনার ও আমাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি দেশের ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে চাহেন, যদি প্রকৃত গুরুস্থানীয় হইয়া সংসারী জীবের সন্তাপ হরণ করিতে চাহেন, যদি ব্রাহ্মণের সেই প্রাচীন মহত্ত্ব পুনঃস্থাপন করিতে চাহেন, তাহা হইলে শাস্ত্রাভ্যাস করুন, সাধন-ভজন-পথে অগ্রসর হউন ও তখন প্রকৃত শিক্ষক হইয়া আমাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন, আমরাও অবনত মস্তকে আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য করিব।

আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অধঃপতন হইবার কারণ কিছু বলিলাম বটে, কিন্তু কিরূপে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিরূপে আবার এই দেশে কর্ম্মী-গুরু, নিষ্ঠাবান জ্ঞানবান, পুরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাও কিছু বলি শোন,—

যদি দেশের লোকের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, যদি হিন্দু সন্তানকে পুনরায় হিন্দু-ভাবাপন্ন ও প্রকৃত মনুষ্য পদের যোগ্য করিতে হয়, যদি বিকৃত পাশব-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বার উন্মেষ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে উন্নত হইতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সমাজ-গুরু, তাঁহারা ধর্ম্মের পরিচালক। গৃহের ছাদ ফাটিয়া বৃষ্টির জল প্রবেশ করিলে কয়দিন সে গৃহের অস্তিত্ব থাকিতে পারে? তোমাদের ও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। মাথা বিকৃত হইলে অন্যান্য অবয়ব বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। এই বিকৃত-মস্তিষ্কের চিকিৎসা—জ্ঞান।" স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে।"

সুতরাং ব্রাহ্মণসন্তান জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া লোকদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দিলে লোকের মতের পরিবর্ত্তন হইবে। তাঁহাদের অবসর যথেষ্ট, গুরু ও পুরোহিতদিগকে চাকুরী করিতে হয় না। তাঁহারা যজমান ও শিষ্যদিগকে অনায়াসে সংশিক্ষা দান করিয়া ও তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, সমাজের মঙ্গল সুচিত হইবে। তাঁহারা আপন

অর্জ্জিত জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞ লোকদিগের কুসংস্কার দূর করিবেন সামাজিক জীবনে জ্ঞানের বিকাশ করিবেন।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে ব্রাহ্মণদিগকে, গুরু ও পুরোহিত-দিগকে ব্রহ্মশক্তি সম্পন্ন হইতে হইবে, সেইজন্য একথা বার বার বলিতেছি। ধনী না হইলে দান করিতে পারে না, কাঙ্গাল নিজেই খাইতে পায় না, সে কোথা হইতে দান করিবে? সেইরূপ ব্রাহ্মণ, গুরু বা পুরোহিত নিজে শিক্ষিত না হইলে কিরূপে লোক-শিক্ষক হইতে পারিবেন? অশিক্ষিত লোকে শিক্ষকের কার্য্য করিলে যে ফল হয়, সমাজে শাস্ত্র-জ্ঞানহীন গুরু ও পুরোহিতের দ্বারা সেইরূপ বিষময় ফল ফলিতেছে। লোকে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে কুসংস্কারগ্রস্ত হইতেছে ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ আচার্য্যদিগের ব্যবস্থা পালন করিয়া দিন দিন অশান্তি ও দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে।

এ দুর্দ্দশা একদিনে হয় নাই, বহুশত বৎসর ধরিয়া বিবিধ বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাতে লোকের চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রাহ্মণসন্তানেরা নানাকারণে হীনবীর্য্য হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদিগের পূর্ব্ব আধিপত্যটুকুর গৌরব ছাড়িতে পারেন নাই। ছাড়িবার প্রয়োজনও নাই, তবে কথাটা এই যে, পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানবান ও শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে, কতদিন আর তাঁহাদের এ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে?

ফলও সেইরূপ হইতেছে; লোকে দেখিতেছে, তাহারা যে সকল সদাচার পালন করে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাও পালন করেন না। সুতরাং তাহাদের হৃদয় হইতে ব্রাহ্মণভক্তি বিদূরিত হইতেছে। তাহারা ব্রাহ্মণ দেখিলে আর সেরূপ ভক্তিভাবে প্রণাম করে না বা করিবার প্রবৃত্তিও হয় না। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যদি প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, তাহা হইলে আগ্রহ সহকারে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করেন। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রভেদ দেখিয়া, নামধারী ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের কি চৈতন্য হইবে না, তাঁহারা কি আপনাদিগকে অধঃপতিত বলিয়া অনুতাপ করিবেন না ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবার জন্য প্রয়াস পাইবেন না?

আরও দেখ, মূর্খ পুরোহিত শিষ্যের বাটীতে কর্ম্ম করিতে আসিলেন। শিষ্য শিক্ষিত, সুতরাং পুরোহিতের অশুদ্ধ উচ্চারণ বা ভ্রষ্ট পাঠ শুনিয়া সে

কিরূপে স্থির চিত্তে তাঁহাকে দিয়া কর্ম্ম করাইতে পারে ? তাহার মনে এই গুরুদিগের প্রতি তিলমাত্র ভক্তির উদয় হয় কি ? অনেক স্থানে এইজন্য পুরোহিতেরা সদর বাটীতে বড় একটা যাতায়াত করেন না, বা শিক্ষিত যজমানের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে সাহস করেন না, অন্দর মহলে গৃহিনীর নিকট নানারূপ চাটুবাক্য ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিবিধ ব্যবস্থা দান করিয়া, আত্ম-অর্থাগমের উপায় করিয়া থাকেন। কিন্তু সে পথও বন্ধ হইতে চলিয়াছে। মূর্খ পুরোহিতদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও চরিত্র দোষে, লোকের বিশ্বাস কমিয়াছে, তাহারা পশুভাবাপন্ন কাণ্ডজ্ঞানহীন পুরোহিতকে আর অনায়াসে বাটীর ভিতর যাতায়াত করিতে দিতেও সম্মত হয়েন না।

তাই সময় থাকিতে সাবধান করিয়া দিতেছি ও বলিতেছি যে পুরোহিত, গুরু সম্প্রদায় যদি আপনাদের ব্যবসা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, যদি সমাজে পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বাসনা করেন, যদি লোকের নিকট হইতে ভক্তি ও সম্মান পাইবার প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে আর কালবিলম্ব করিবেন না, আপনাদের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেশের ও দশের দুর্গতির আলোচনা করিয়া, সৎপথে বিচরণ করুন, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হউন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করুন। আর তাঁহাদের কৃপায় দেশে জ্ঞানের বিস্তার হউক, দেশে শান্তিময় ধর্ম্ম-ভাবের উদ্দীপনা হউক, হিন্দু-সন্তান ভগবৎ সম্পদের পরিচয় পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করুক।

বড় দুঃখ হয়। তোমাদের দুর্দ্দশা অনুভব করিয়া প্রাণ বড়ই কাতর হয়। বলিব কি, কোন্ ব্যাপারের আলোচনা করিব ? জীবনের যেদিক দিয়া দেখি, সমাজের যে অধ্যায় আলোচনা করি তাহাতেই অজ্ঞানতা জনিত ঘোর কুসংস্কারের ছায়া পড়িয়াছে দেখিতে পাই। জানি না, ভগবান কতদিনে তোমাদের সুমতি দিবেন, জানি না এ তাঁহার কেমন খেলা ! আমার মনে হয়, তোমরা এই কুসংস্কারগ্রস্ত হইয়াছ বলিয়া, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়াছ বলিয়া মানব জীবনের মহৎ আদর্শ হারাইয়াছ বলিয়া, আজ সংসারে শান্তি নাই, সমাজে শৃঙ্খলা নাই। তোমাদের করযোড়ে মিনতি করিয়া বলি, অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কর্ম্ম করিও না, বা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল কতকগুলি গুরুদিগের ব্যবসা রক্ষার প্রলাপে ভুলিও না। নিজে বুঝিতে না

পায়, যোগ্য ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া লইবে, তাহাতে যদি কেহ আপত্তি করে, তাহা গ্রাহ্য করিও না। কারণ সৎকর্ম্মে বাধা উপস্থিত হইলে তাহা কদাচ গ্রাহ্য নহে।

তোমাদের দেশে এমন একটা কুসংস্কার আছে যে, গুরু যে মন্ত্র দিবেন, শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা শুনাইবেন, তাহা আর কাহারও নিকট বলিতে নাই। হায়, হায়! ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানতা আর কি হইতে পারে। গুরু যদি বেদজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে এ কথা বলিতাম না। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে, গুরুশ্রেণীর মধ্যে বহু বহু কেবল সূত্রধারী ব্রাহ্মণ সন্তান আছেন, তখন একথা বলিতে কোন আপত্তি বোধ করি না। কারণ সেরূপ গুরু যে মন্ত্র দিবেন, তাহা তো বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা মন্ত্রের স্বরূপ জানেন না, অথচ শিষ্যকে দীক্ষা দিতে যান। দুঃখের কথা বলিব কি, অনেক স্থলে শিষ্যদিগের মুখে শুনিয়াছি, গুরু কি মন্ত্র দিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাল শুনিতে পায় নাই। আবার কেহ বা গুরু মুখ-নিঃসৃত অশুদ্ধ শব্দ শুনিয়া তাহাই ইষ্ট-মন্ত্ররূপে জপ করিতেছে। হায়! হায়! জন্মকাল ধরিয়া এইরূপ অশুদ্ধ মন্ত্র জপ করিলে তাহার কি সদ্গতি হইবে? এ মন্ত্র জপে কি তাহার রুচি হয়? কেবল লোক দেখানো জপ করিতে হয় বলিয়া তাহারা জপ করে মাত্র। ইহা অতিরঞ্জিত নয়, সত্য কথা, যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি। একজন শিষ্য গুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর একবার আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল যে, তাহার ইষ্টমন্ত্র জপে রুচি হয় না। তাহাতে আমি পরীক্ষা করিয়া জানিলাম যে, মন্ত্র অশুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার ক্ষেত্রে সে বীজ সুপ্রকাশিত হইতে পারে না। অবশ্য এই ভ্রম সংশোধিত হইবার পর তাহার প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছিল সে ভগবৎ চিন্তায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিল।

কিন্তু তোমাদের দেশে এরূপ করিবার যো নাই। গুরু "রং" "বং" "ক্লং" যাহা হউক একটা মন্ত্র দিয়া গেলেন ও যাহাতে কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করিয়াও গেলেন। অথচ হৃদয়ে সেই বীজ ধারণে, তোমাদের কোন অঙ্কুর উঠিল কিনা তাহার সন্ধান লইলেন না। আর তোমরাও মন্ত্র জপ করিয়া প্রাণে শান্তি পাও না এবং সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহসী হও না। কাজ তাই দুঃখ, কাজ তাই হাহাকার। যদি গুরু-সম্প্রদায় অধিকারী

বিবেচনা করিয়া অন্তর্দৃষ্টি বলে শিষ্যের হৃদয়ের পরিচয় লইয়া বীজ মন্ত্র দান করেন, তাহা হইলে কি তাহা ব্যর্থ হয়? তাহা হইলে কি মন্ত্র জপে, শিষ্যের প্রাণে অশান্তির কণামাত্র থাকিতে পারে? যদি শিষ্য গুরুকে অকপট-চিত্তে তাহার প্রাণেরভাব জ্ঞাপন করেও মন্ত্রের স্বরূপ-তত্ত্ব জানিয়া জপ করিতে বসে, তাহা হইলে তাহার জীবন যে কি আনন্দময় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা ধারণা হয় না। সে তখন সেই পরম আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে ও আত্মহারা হইয়া দয়াল গুরুর উদ্দেশে বার বার জয়োচ্চারণ করিবে।

কবে আবার সেদিন হইবে, কবে গুরু সম্প্রদায় আবার লোকসমাজ উন্নত করিবে? আর কি হিন্দু-সন্তান আপনার আত্মার সদ্গতির জন্য লালায়িত হইবে না, পারলৌকিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে না এতো দুদিনের সংসার, যেখানে চিরদিনের সম্বন্ধ তাহার ব্যবস্থায় মনযোগী হইবে না?"

সহৃদয় পাঠকগণ! বেদান্তরত্ন মহাশয়ের জীবনী এইবারে বিস্তৃত ভাবে শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে, আমরা আর ভক্তিতে ইহা বাহির করিবনা।

জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য।)

—:০:—

কোন কোন সাধক পণ্ডিতের মতে জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু। আবার কোন কোন সাধক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, জ্ঞান স্বতন্ত্র, ভক্তি ও স্বতন্ত্র। যে বিষয়দ্বয় লইয়া সাধক পণ্ডিতগণের মধ্যে উক্তপ্রকার মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, মীমাংসার জন্য তাহার একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক। আলোচনার সামর্থ্য আমার নাই। সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিই আমার হৃদয়ে

জাগরূক হইয়া, এই কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। সুতরাং আলোচনায় দোষ বা গুণ পাঠকগণই বিচার করিবেন।

"যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎসর্ব্বং ন ময়াকৃতম্।
ত্বয়া কৃতং হি ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ?"

এক্ষণে দেখা যাউক জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয় শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ কি ? জ্ঞা—ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে টন্ প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা; "তত্ত্ববস্তুর" যথার্থ উপলব্ধির নাম জ্ঞান। জ্ঞান একটি সাধন মার্গ। এই মার্গের অনুসরণ করিলে "তত্ত্ববস্তুর" উপলব্ধি হয়। ভজ—ধাতুর উত্তরে ভাববাচ্যে স্ত্রীলিঙ্গে ক্তিন্ প্রত্যয় করিলে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভক্তির অর্থ ভজন প্রবৃত্তি। "তত্ত্ব-বস্তুর" ভজনে (অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে অভিপূজনে) যে "স্বাভাবিকী" প্রবৃত্তি তাহার নাম ভক্তি। "স্বাভাবিকী" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্ববস্তু যথার্থ উপলব্ধি হইলে, তাঁহাকে ভজনা না করিয়া থাকা যায় না। ভক্তি একটি সাধন মার্গ। এই মার্গের অনুসরণ করিলে "তত্ত্ববস্তুর" প্রতি ভজন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান এবং ভক্তি ইহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ, ইহারা কি বস্তু, এবং ইহাদের অনুসরণে কি ফল, তাহা পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতে এক কথায় জ্ঞান এবং ভক্তির অর্থ এবং অনুসরণ ফলের বিষম পার্থক্যই দৃষ্ট হইল। তবে যথার্থ বস্তু নির্ণয়ে মাত্র একতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ উভয়ই সাধন মার্গ। বস্তুতঃ উভয়ে এক হইলেও অর্থ এবং অনুসরণ ফল যখন পৃথক হইতেছে, তখন উভয়কে সর্ব্বাবয়ব-সিদ্ধ এক বস্তু বলা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে সকল পণ্ডিতগণ উভয়কে এক বলেন, তাঁহারা কোন্ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন ? তাঁহাদের যুক্তি এই যে,—"সাধ্য বস্তু যখন এক, তখন জ্ঞান ভক্ত্যাদি সাধন মার্গ সহস্রটী থাকুক না কেন, আপাততঃ তাহারা কিঞ্চিত বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও গন্তব্যস্থানে পহুঁছিয়া তাহাদের এ বিভিন্নতা আর দৃষ্ট হইবে না।"

উত্তম কথা! যুক্তি ও আপাততঃ মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে এই যে,—তত্ত্ব-

বস্তু যদ্যপি তত্ত্বতঃ একরূপ হন, তাহা হইলে, যে মার্গের সহিত যে মার্গের যতই বিভিন্নতা থাকুক না তাহাদিগকে এক বলিতে হইবে। কিন্তু "তত্ত্ববস্তু" একমাত্র হইয়াও "বিভিন্নস্বরূপে" তাঁহার প্রতিভাত হওয়া যদ্যপি "স্বভাব" হয়, তাহা হইলে, এক এক মার্গ অনুসরণের দ্বারায় তাঁহার "প্রতিভাত" এক এক "বিভিন্ন স্বরূপের" উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলে মার্গগুলিকে এক বলা সুযুক্তি সঙ্গত হইবে না। কোন এক মার্গ অবলম্বনে তাঁহাকে কোন এক "প্রতিভাতস্বরূপ" মাত্র অবগত হওয়া যায়; ইহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে তাঁহাকে (তত্ত্ববস্তুকে) "প্রতিভাত জ্ঞান স্বরূপে" এবং ভক্তিমার্গ অবলম্বনে তাঁহাকে (তত্ত্ববস্তুকে) "প্রতিভাত ভগবৎ স্বরূপে" অবগত হওয়া যায়। সুতরাং "তত্ত্ববস্তু" একমাত্র হইয়াও "বিভিন্নস্বরূপে" প্রতিভাত হওয়া প্রমাণিত হইলে, জ্ঞান এবং ভক্তির মার্গ দুইটি ও বিভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক "তত্ত্ববস্তু" নির্ব্বাচন উপলক্ষে শাস্ত্র কি বলেন— শাস্ত্রকে আমরা সর্ব্ব প্রথমেই বলিতে দেখিতে পাই "নমস্তে বহুরূপায়" অর্থাৎ "তত্ত্ববস্তু" বহুরূপ। তাঁহার "বহুরূপবত্ত্বের" প্রমাণ স্বরূপে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা;—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীভাগবত বলিতেছেন,—"যেটি অদ্বয় জ্ঞান (যথার্থ তত্ত্ববস্তু) তত্ত্ববাদীর নিকট সেইটিই 'তত্ত্বরূপে' জ্ঞানীর নিকট সেইটিই 'ব্রহ্মরূপে' যোগীর নিকট "পরমাত্মা" রূপে এবং ভক্তের নিকট "ভগবানরূপে" প্রতিভাত হন। অতএব জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইহারা একটি একটি পৃথক্ মার্গ এবং ইহাদের অবলম্বনে "তত্ত্ববস্তুর" এক একটি পৃথক্ পৃথক্ "প্রতিভাত এক বিধ স্বরূপের" উপলব্ধি হয়। তত্ত্ববাদীগণ কোন্ মার্গ অবলম্বনে অদ্বয়জ্ঞানকে "তত্ত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার কোন আভাস এই শ্লোকে পাওয়া না গেলেও জ্ঞানাদির দ্বারায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের সকল গুলির উপলব্ধি তত্ত্ববাদীগণ যে আপন মার্গ অবলম্বনে করিয়া থাকেন, তাহার আভাস সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। তত্ত্ববাদীগণের মার্গ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

উক্তশ্লোকের দ্বারায় এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই তিনটী মার্গ অবলম্বনে "তত্ত্ববস্তুকে" ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিনরূপে জানা যায়। এবং তত্ত্ববাদীগণের মার্গ যাহাই হউক্ সেই মার্গ অবলম্বনে অসংখ্য প্রতিভাত স্বরূপের সহিত "তত্ত্ববস্তুর" যথার্থ স্বরূপ জানা যায়।

এবং তাঁহার "বহুরূপত্বে"র প্রমাণ স্বরূপে শাস্ত্রীয় ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তবে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণ স্বরূপে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া গেল না। সে শ্লোকটি এই—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—"হে উদ্ধব! যোগ, জ্ঞান, স্বাধ্যায়, তপ এবং ত্যাগাদি মার্গ অবলম্বনে আমি তাদৃশ সাধ্য হই না, আমাতে উর্জ্জিতা ভক্তি মার্গ অবলম্বনে যেরূপ সাধ্য হই। উক্ত শ্লোকের দ্বারায় ইহাই প্রমাণিত হইল যে,—জ্ঞানাদি বিভিন্ন মার্গ দ্বারায় আমি ব্রহ্মাদি "বিভিন্নস্বরূপে" প্রতিভাত হই। তন্মধ্যে ভক্তের হৃদয়ে আমি যেরূপে প্রতিভাত হই, আমি আমার অসংখ্য প্রতিভাত স্বরূপগণের মধ্যে সেই স্বরূপকে অধিকতর ভালবাসি। সুতরাং প্রমাণিত হইল জ্ঞান এবং ভক্তি এক বস্তু নহে। জ্ঞান স্বতন্ত্র। ভক্তি স্বতন্ত্র। তত্ত্ববস্তু স্বভাবতঃ একরূপ হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হন॥ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার একরূপ এবং ভক্তির দ্বারা আর একরূপ জানা যায়; জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির মর্য্যাদা অধিক। যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি সাধ্য "স্বরূপ" জানা যায় না; কিন্তু ভক্তি দ্বারায় জ্ঞান সাধ্য—"ব্রহ্মকে" অনায়াসে জানা যায়। ইহার শাস্ত্র প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে; প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধারে ক্ষান্ত রহিলাম।

ভক্তির উপরেই হউক, কিম্বা ভক্তির অন্তর্গতই হউক্ কোন একটি সুনির্ম্মল এরূপ মার্গ আছে, যদ্দারা 'তত্ত্ববস্তু'' অসংখ্য প্রতিভাত স্বরূপের সহিত যথার্থভাবে জানা যায়। কিন্তু জ্ঞান ইত্যাদি অসংখ্য মার্গ অবলম্বনেও তাঁহাকে সে রূপে জানা যায় না। এক্ষণে তত্ত্ববস্তুর কিঞ্চিত আলোচনা আবশ্যক হইতেছে। শাস্ত্রানুসারে "তত্ত্ববস্তু" বহুরূপ হইলে তাঁহাকে যে স্বরূপে যিনি দর্শন করিবেন তিনি সেইস্বরূপকেই তাঁহার একমাত্র নিত্য সত্য সনাতন স্বরূপ

বলিয়া জ্ঞান করিবেন। অপর সহস্রটী স্বরূপ থাকিলে ও তিনি তাহা জানিলেন না, না জানার কারণ সুতরাং মানিবেনও না। কিন্তু শাস্ত্র বাক্য না মানিয়া পথ নাই। যিনি যে স্বরূপ অবগত হন, শাস্ত্রও যদ্যপি সেই স্বরূপটিকে নিত্য সত্য সনাতন একমাত্র স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া অপরগুলিকে একেবারে অস্বীকার করেন তবে উক্ত সাধকগণ আপন "দৃষ্টস্বরূপে" শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের সহিত অধিকতর বিশ্বস্ত হইয়া সুখী হইতে পারেন। কিন্তু তাহা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। কারণ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে তৎ তৎ সাধক দৃষ্ট তৎ তৎ স্বরূপকে নিত্য একমাত্র স্বরূপ অঙ্গীকার করিলেও সকল শাস্ত্র সর্ব্বাংশে তাহা কখনই অঙ্গীকার করেন না। এই কারণে অধিকাংশ সাধকগণ আপাততঃ আপন আপন "ইষ্টস্বরূপে" কিয়ৎকালের জন্য স্থির বিশ্বস্তের ন্যায় প্রতিভাত হইলেও নানা শাস্ত্রের নানাংশে বিভিন্ন নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বিচলিত হইতে দেখা যায়। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ "রাম প্রসাদের" মুখে শুনা যায়— "জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়, কাল মেঘের বরণ করিয়া ধারণ (শ্যামা) কখন কখন পুরুষ হয়।" জগন্মাতার "স্বরূপটী" যে যথার্থ "তত্ত্বস্তুর" একমাত্র নিত্য সত্য স্বরূপ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে তাহা স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যান্যাংশ দৃষ্টে সাধক বিচলিত হইলেন। এইরূপে বিচলিত হইয়া সৌভাগ্যহীন সাধকগণ "তত্ত্বস্তুর" স্বরূপ সম্বন্ধে দুইটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম—তিনি বহুরূপীর (গিরগিটী জাতীয় জন্তু বিশেষ) ন্যায়। অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ এক এক স্বরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছেন; যাঁহার দৃষ্টিতে যে স্বরূপটী পড়িতেছে, সে সেইটিকে তাহার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু যে সাধক একান্তে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সকল গুলি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে "একমাত্র স্বরূপে" নির্দ্দেশ না করিয়া "বহুরূপ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

দ্বিতীয়—"তত্ত্বস্তু" বাক্য মনের অগোচর। সুতরাং সাধকগণের মনে তাঁহার যে যে স্বরূপের উদয় হয়, সে গুলির কোন একটিই তাঁহার স্বরূপ নহে। জীব তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না।* স্বরূপ লইয়া যে দ্বন্দ্ব সেটা অলীক। সুতরাং মনে মনে তাঁহার কোন একটা স্বরূপ কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে প্রণাম ও স্তুতি করাই যুক্তি সঙ্গত।

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোহসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥

ক্রমশঃ—

* তাঁহার কৃপায় জীব সকলই জানিতে পারে। (ভক্তি-সম্পাদক।)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হোলী।

(লেখক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহা দাস।)

——:০:——

কিশোরী সহিত খেলে কিশোর রঙ্গিয়া;
আজি "হোলী" মহোৎসবে, মাতিয়াছে গোপী সবে,
আবীর লইয়া খেলে করি কত ভঙ্গিয়া,
সুখের তরঙ্গে সবে উঠিছে নাচিয়া।

রতন আসনে শোভে কিশোরী কিশোর;
চৌদিকে সঙ্গীগণ, নাচে গায় অনুক্ষণ,
বাজায় সারঙ্গ বীণা ভাবেতে বিভোর,
প্রেমানন্দ বারিধীর নাহি সীমা ওর।
আবীর কুমকুম ফিকে প্রিয় সখীগণ;

পিচ্‌কারী আনে কেহ, ভুলিয়াছে দেহ গেহ,
সুগন্ধি সলিলে গুলি বিবিধ রঞ্জন,
লক্ষ্য করি দুহুঁ অঙ্গে ছুড়ে ঘন ঘন।
ললিতা বিশাখা আর সুচিত্রা চম্পকা;

নিজ নিজ দল লয়ে, ভজে কানু বিস্ময়ে,
জয় রাধে ধ্বনি দিয়া মারে আঁকা বাঁকা,
আবীরে রঞ্জিত আজি বৃন্দা তরু শাখা।
কোন সখী, নানা ফুল করিয়া চয়ন;

আনন্দে গাঁথিছে মালা, সাজাইতে প্রাণ কালা,
কেহ বা পরায় গলে সস্মিত আনন,
জয় রাধে ধ্বনি উঠে পুরি বৃন্দাবন।

হেন ভাগ্য কবে মোর হইবে উদয় ;
সখীর অনুগা হ'য়ে, ভজিব দোঁহারে যেয়ে,
দেখিব সে "হোলী" খেলা অতি সুখময়,
ভক্তগণ কৃপা করি দাও পদাশ্রয়।

অকিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্ত।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

ধন্য তুমি ভক্ত বর, ধন্য ধরাতলে,
তোমার মহিমা বর্ণে হেন সাধ্য কার ?
প্লাবিত বদন বক্ষ তব, প্রেম জলে,
ভুবন-বিমুগ্ধ-কর, স্বরূপ তোমার।
সংসারের শত কষ্ট অম্লান বদনে,
সহিতেছ, বহিতেছ, কত দুঃখ ভার,
তথাপিও ক্ষুণ্ণ নহে ; শ্রীকৃষ্ণচরণে
অর্পিয়াছ কর্ম্ম ফল, যত আপনার।
বিষয় বিপত্তি বাধা করি উল্লঙ্ঘন,
আনন্দধামের পথে চলিয়াছ হায় !
ভজন কণ্টক বিঘ্ন, কষ্ট অগণন,
অনায়াসে অবিরত, ঠেলিয়া দুপায়।
প্রেম পরসম জ্যোতি মাখা শ্রীবদন,
সতত তোমার সাধো ! দেখি হয় জ্ঞান,
এ রাজ্যের লোক নহে, তুমি এক জন,
শোকে তাপে চিত্ত তব নহে পরিম্লান।
দারুণ দারিদ্র্য আসি তোমার উপর,
নিরন্তর করিতেছে কত অত্যাচার,

রোগ শোক জরা আদি অপ্রীতি নিকর,
লইতেছে পদে পদে পরীক্ষা তোমার।
অভিমান, অহঙ্কার, কারে জানি কয়,
কিছুই জাননা তুমি, এমনি সরল!
ভীতি শূন্য শান্তি মাখা তোমার হৃদয়,
তোমার আরাধ্য সাধ্য ভকতি কেবল।
নগণ্য জঘন্য অতি নীচ মূর্খ জন,
কেহ যদি ভাবে, তুমি রুষ্ট নহ তা'তে;
"তৃনাদপি" শ্লোকে যত ভক্তের লক্ষণ,
প্রত্যক্ষ করিনু আজি, সকলি তোমাতে।
সকল প্রাণিকে দেখ, আপনার সম,
সকল মানবে তব সম সমাদর,
বৈষ্ণবের নাহি কর জ্যেষ্ঠ লঘু ক্রম,
সকলি সন্তুষ্ট সদা তোমার উপর।
নাহি তব শাস্ত্র পাঠ, ভেক কোলাহল,
নাহি জান তর্ক যুক্তি বৃথা বাক্য ব্যয়,
প্রেম ভক্তি মাখা তব চিত্ত নিরমল,
সাধু গুরু বৈষ্ণবের পদ তবাশ্রয়।
অটুট বিশ্বাসে পূর্ণ তোমার হৃদয়,
অনুরাগ, নিষ্ঠা শান্তি আনন্দ আধার,
ভজনের রস ভরা, ব্রজ ভাবময়,
জ্যোতির্ম্ময়, দিব্যধাম, শূন্য অন্ধকার।
সম্পদ সম্ভ্রম কিম্বা কামিনী কাঞ্চনে,
করিতে পারে না তব চিত্তকে চঞ্চল,
রিপুর খাটেনা দর্প তোমার সদনে,
মুখে নাহি অন্য কথা, শুধু "হরিবোল।"
বিলাস বাসনা রসে নহে কভু রত,
চিন্ময় আনন্দ ঘন, রূপের খেয়ানে,

প্রেমমত্ত, নিমগ্ন চিত্ত, তোমার সতত।
প্রাণ মাতা দিবানিশি, হরিগুণ গানে।
দৈন্য-বিনয়ের খনি তুমি মহাশয়,
তোমার বচনে ক্ষরে অমৃতের ধার,
সর্ব্বদা মনেতে তব অপরাধ ভয়,
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা কিঙ্করী তোমার।
চিনেনা তোমাকে কেহ, স্বদেশে-বিদেশে
করে না জিজ্ঞাসা কেহ, অতিহীন জ্ঞানে,
কে জানে মজিয়া আছ, তুমি কোন্ রসে,
কে জানে রয়েছ তুমি কি রূপ ধেয়ানে।
নিবিড় পল্লীর এক নিভৃত কোণেতে,
তোমার বসতি অতি নগণ্য প্রদেশে।
না চিনুক লোকে, অপচয় কিবা তা'তে?
না আসুক কাছে কেহ, কিবা যায় আসে?
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ, কিন্নর চারণ,
বাঞ্ছা করে সদা যাঁর চরণ পঙ্কজ,
তোমার হৃদয় মাঝে সে আরাধ্য ধন,
বলিছে বিজয় ধন্য তোমার জীবন।

শ্রীগৌরাঙ্গের মোহন রূপ।

গীতিকা

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।)

—:০:—

হৃদয় নির্ম্মল হ'লে, ফুটে এ মোহন রূপ; সে কি—রূপ?
না মিলে তুলনা।
মনোময় রূপ ওই, বিরাজে মনের মাঝে, এ কেগো
চিন্ময় রূপ, নহে ত কল্পনা॥

রাধা-ভাব-কান্তি যুত এ যে রূপ সুললিত,
ঝলকে ঝলকে সুধা বর্ষে।
চিত্তের মালিন্য ছুটে, অন্তর ফুটিয়া উঠে,
মায়ার অতীত ভাব-স্পর্শে॥
পরাণ আলোক করা, দিব্য সুষমায় ভরা,
ওই রূপ কি লাবণ্যময়!
ভাবদ্যুতি ছড়াইয়ে, হিয়া দেয় জুড়াইয়ে;
নবযুগে নব ভাবোদয়॥
শ্রীরাধাভাবের দ্যুতি—সম্বলিত রূপ-ভাতি,
ভাবুকের চিন্তনীয় ধন।
সদানন্দ প্রেমঘন, এ রূপের এক কণ,
অনুভবে প্রীতি অতুলন॥
মনের মানুষ-রূপে "পাগল মানুষ" মোর,
আয় ছুটে, আয় ওরে আয়।
মিলনে ভাব-তরঙ্গ, হৃদয়ে করুক্ রঙ্গ,
ডুবে যাই প্রেমের বন্যায়॥
নব-বৃন্দাবন-মাঝে, রমনীর নব সাজে,
এ রূপ্ ফুটুক অন্তরেতে।
নিরুপম-রূপ-খনি, মানস প্রতিমা খানি,
রাখি যেন অতি যতনেতে॥

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ"

(লেখক।—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।)

—:০:—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌরলীলা-সমুদ্রের মন্থনোত্থিত অমৃত। ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিত জীবের পক্ষে উহা মহামৃত স্বরূপ। কত ভবঘুরে জীব এই অমৃত পান করিয়া অমর হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। চরিতামৃতের প্রত্যেকটী

কথাই মূল্যবান ও উপাদেয়। বহুমূল্য রত্ন-কতের সহিত তাহার তুলনা হয় না। যিনি না পড়িয়াছেন, তাঁহাকে বুঝান যায় না। দুগ্ধ দেখিয়া যেমন তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন করা অসম্ভব, সেইরূপ চরিতামৃত না পড়িয়া আমার এই সামান্য লেখার দ্বারা রসাস্বাদন করা ততোধিক অসম্ভব।

প্রেমই এই চরিতামৃতের বর্ণিতব্য বিষয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে প্রেমের বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসাইয়া ছিলেন, চরিতামৃতে তাহার একটী যথাযথ আলেখ্য উঠিয়াছে। ফটোগ্রাফের ন্যায় তাহা অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। অশরীরি প্রেম একবার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় তাহা আবার ভারতের কোমল কলিজা স্বরূপ আমাদের এই বঙ্গদেশে। সেই মূর্ত্তি-মান মহাপ্রভুর প্রেম-মূর্ত্তি এই চরিতামৃতে অমৃত প্রলেপ দিয়া অঙ্কিত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট শিল্পী যেমন সুনিপুন ভাবে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করে, চরিতামৃতকারও শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ ও প্রেমোন্মাদ বিরহের দশম অবস্থা ও উৎকণ্ঠার শেষ দশা যেমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেম-মূর্ত্তিটী সান্ধ্য-আকাশের তারকা-স্তবকের ন্যায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রেমেতে অঙ্কিত মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলেও প্রাণ জুড়ায়। চরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে প্রেম-মূর্ত্তি তুলি দিয়া আঁকা হইয়াছ, সেই মূর্ত্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হই। এ প্রেম পণ্য দ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম। দানেই এ প্রেমের সুখ। প্রতিদান চাহিয়া কেহ কখনও এ উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে না। ফুলের সৌরভ বিনামূল্যে বিতরিত হয় চাঁদের জ্যোৎস্না, মলয় সমীরণ ক্রয় বিক্রয়ের সামগ্রী নহে। প্রাতঃ সূর্য্য রশ্মি শীতকালে কত মধুর। কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার কোনও মূল্য নাই। বনের কুন্দ যূথি, জাতি, গোলাপ সুন্দরীগণ হইতে কম মূল্যবান নহে। কিন্তু উহারা পণে বিক্রয় হয় না। এ প্রেমও তেমনি অমূল্য। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক কবি প্রেমভরে উন্মত্তভাবে যাঁহাকে পাইবার জন্য, এমন সুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া, যমুনার মৃদু তরঙ্গ-তাড়িত নীপ তরু-মূলে শ্যাম তমলাবৃত কুঞ্জে বসিয়া দার্শনিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

হায়! বঙ্গের সেই এক দিন শুভ দিন ছিল, যেই দিন বঙ্গ ভাষায় চরিত লেখার সূত্রপাত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর মহিমান্বিত আদর্শ হইতেই বঙ্গ সাহিত্যে চরিত লেখার সূত্রপাত হইয়াছে। সেকালে চরিতাখ্যানগুলি সংস্কৃতের কোলে ঘুমাইতে ছিল। তাহাদিগকে বঙ্গ ভাষার ছাঁচে ফেলিয়া গড়িতে তখন পর্য্যন্তও কোন বাঙ্গালী চেষ্টা করে নাই। ভাষা চিরদিনই ভাবের নিকট পরাজিত। তাঁহার প্রেমের উদ্দাম দৃশ্য দেখিয়া বাঙ্গালী আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই প্রথমতঃ বৈষ্ণব বাঙ্গালী কবিগণ মহাপ্রভুর সেই আদর্শ প্রেমময় পূণ্য জীবন বঙ্গ ভাষায় লিপি বদ্ধ করেন। যেহেতু মানুষ যখন ভাবে তন্ময় হইয়া যায়, তখন সে বিদেশীভাষার 'ভাসা ভাসা" বুলিতে মনের সম্পূর্ণভাব ফুটাইতে পারে না। তাই বাঙ্গালী কবি মহাপ্রভুর আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্ট করিতে লেখনী ধরিলেন। সেইদিন কি বঙ্গ ভাষার শুভদিন নহে?

দীনা বঙ্গভাষা বৈষ্ণব তুলিতে অঙ্কিত মহাপ্রভুর প্রেম-চরিত-ধারা বহন করিয়া গঙ্গা ধারার ন্যায় পবিত্রা হইয়াছেন। তাই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন "এই গীতি কাব্য যদি আমরা ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্য প্রদর্শণীতে দেখাইতে পারি, তবে, আত্মগরিমার রাজ্যে আত্মবিস্মৃতির কথা শুনাইয়া জগৎবাসীকে মুগ্ধ করিতে পারি, সন্দেহ নাই।"

এই দার্শণিক তত্ত্ব সম্বলিত প্রেমময় মহাকাব্যের রচক ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর। তিনি ১৪৯৬ খৃঃ বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভগীরথ অল্প বয়স্ক কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মাতা সুনন্দা এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রদ্বয়কে লইয়া বড় বিপদে পতিত হইলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কতিপয় দিবস পরে সুনন্দা দেবীও কালগ্রাসে পতিতা হইলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস পিতৃস্বসার গৃহে প্রতিপালিত হন।

আজীবন কষ্ট বুকে করিয়া তিনি দরিদ্রতার কোলে লালিত পালিত ও সংবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে যেন বড় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। সংসারে কোনও দিনই তিনি সুখের মুখ দেখেন নাই। সংযত চিত্ত কৃষ্ণদাস

দার পরিগ্রহ করিয়া ভবে সুখের আশা করিতে পারেন নাই। সুতরাং আজীবন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাসের জীবন শরিৎ-কমলবৎ নির্ম্মল ও পবিত্র ছিল।

এই সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ঝামটপুর গ্রামে আগমন করেন। আজন্ম দুঃখী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের উদ্দাম প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। এই সংসার হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য এক সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষের উপর পড়িল সুতরাং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধামবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। নিস্বম্বল কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা পাথেয় সংগ্রহ করিয়া শ্যামসুন্দরের কোন নিকেতনে পৌঁছিলেন।

সেইস্থানে পৌঁছিয়া তিনি রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামী প্রভুগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। সেকালে বৃন্দাবন বাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এক হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" পাঠ করিতেন। কিন্তু উহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তলীলা বিশদভাবে বর্ণিত নাথাকায় বৃন্দাবন প্রবাসী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মহাপ্রভুর অন্তলীলা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সময়ে বৃদ্ধ কবিরাজ ৭৬ বৎসরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে তিরোধামের অবশিষ্ট দিনগুলি গণিতে ছিলেন। এই বিষম অনুরোধে তিনি একটু গোলমালে পতিত হইলেন।

পুজারি আসিয়া গোবিন্দজীউর আদেশমাল্য হস্তে দিয়া গেল। এই অত্যাশ্চার্য্য ভগবদ্ কৃপা যেন বৃদ্ধকে যুবকের ন্যায় শক্তিশালী করিয়া তুলিল। তিনি আর আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিলেন না।

কিন্তু কবিরাজ এই সময়ে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। লিখিতে হস্ত বারং বার কাম্পিত হয়। অশরীরি জরা আসিয়া তখন তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি শিথিল করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় তিনি যে গ্রন্থ লিখিয়া যাইতে পারিবেন এমন তাঁহার ভরসা ছিল না। প্রতিপদে পদে তিনি নিরাশার তীব্র যাতনানুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ৮৫ বৎসর বয়সে ৯ বৎসরের সমবেত পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ সমাধা করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সংস্কৃত নানাবিধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ

স্বরূপ যে শ্লোক উঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রসংশা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। (অনুসন্ধান, ৫ম সংখ্যা) আমরা তাহা নিম্নে লিখিয়া দিতেছি।* এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বরচিত শ্লোকও গ্রন্থ মধ্যে অনেক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে এতগুলি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণায়ক গ্রন্থ রচনা করা বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষেও বিস্ময়াবহ ঘটনা সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে বৈষ্ণবোচিত কেমন বিনয় ও দীনতা, ভক্তির কেমন নির্ম্মল ব্যাখ্যা, প্রেমকে কেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক উন্নত প্রণালীতে সুসংবদ্ধভাবে সংযোজিত করার নৈপুণ্য প্রদর্শণ করা হইয়াছে! এই বহুগুণ সমলঙ্কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এক স্বর্গীয় বস্তু। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি এই চরিতামৃতের অমৃত-ধারা যিনি একবারও পান করেন নাই। তাঁহার

* (১) অভিজ্ঞান শকুন্তলা (২) অমর কোষ, (৩) আদি পুরাণ (৪) উত্তর চরিত (৫) উজ্জ্বল নীলমণি, (৬) কাব্য প্রকাশ (৭) কৃষ্ণ কর্ণামৃত (৮) কৃষ্ণ সন্দর্ভ (৯) কূর্ম্ম পুরাণ (১১) ক্রম সন্দর্ভ (১২) গরুড় পুরাণ (১৩) গীত গোবিন্দ (১৪) গোবিন্দ লীলামৃত (১৫) গৌতমীয় তন্ত্র (১৬) চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক (১৭) জগন্নাথ বল্লভ নাটক (১৮) দানকেলি কৌমুদী (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র (২০) নাটক চন্দ্রিকা (২১) নৃসিংহ পুরাণ (২২) পদ্মাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্ম পুরাণ (২৫) পাণিনি সূত্র (২৬) বরাহ পুরাণ (২৭) বিষ্ণু পুরাণ (২৮) বিদগ্ধ মাধব (২৯) বিশ্ব প্রকাশ (৩০) বীর চরিত (৩১) বৃঃ গৌতম তন্ত্র (৩২) বৃঃ নারদীয় পুরাণ (৩৩) ব্রহ্ম সংহিতা (৩৪) ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ (৩৫) বৈষ্ণব তোষিণী (৩৬) (৩৭) গীতা (৩৮) ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (৩৯) ভক্তি সন্দর্ভ (৪০) ভক্তি লহরী (৪১) ভাবার্থ দীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবত পুরাণ (৪৪) ভাগবত সন্দর্ভ (৪৫) মলমাসতত্ত্ব (৪৬) মহাভারত (৪৭) মনু সংহিতা (৪৮) যমুনাচার্য্য কৃতামলক মন্দার স্রোত (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুবংশ (৫১) রূপ গোস্বামীর করচা (৫২) লঘু ভাগবতামৃত (৫৩) ললিত মাধব (৫৪) স্তব মালা (৫৫) স্বাম্বত-তন্ত্র (৫৬) গোবিন্দদাসের করচা (৫৭) সাহিত্য দর্পণ (৫৮) হরিভক্তি বিলাস ইত্যাদি।

এখনও বঙ্গভাষার সারস্বত তীর্থের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া রসানুভব করিতে অনেক দেরী আছে।

বৃন্দাবনের মৃদুমন্দ সমীরণ, কুঞ্জবনের মধুপ গুঞ্জিত কুসুমের সৌরভ ও ভ্রমর পুঞ্জের 'রাধা শ্যাম' রব, যমুনার তরঙ্গোত্থিত উজান-প্রবাহ ভাবুক রসিক কবি কৃষ্ণদাসের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এক অভিনব ছায়া পাত করিয়াছিল।

সেই নির্ম্মল যমুনা তটে ভক্তির অবতার প্রেমের দেবতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমময়ী মূর্ত্তি যেরূপ নির্ম্মম সুন্দর ভাবে তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, কবির কাব্যে তাহার একটী অতি সুন্দর প্রতিচ্ছায়া উঠিয়াছে।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

(পাগল রাধামাধব) (প্রথম খণ্ড)

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর)

—:•:—

পাঠকবর্গ পাগল মানুষের এই কয়েকটি কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন—"কলিকালে পতিত জাতি সুখে থাকিবে এবং পুণ্যবান্‌গণ বিধ্বস্ত হইবেন।"—এই উপদেশবাণী যেমন অদ্ভুত তেমন সূক্ষ্ম। অদ্ভুত, যেহেতুক "কলিকালে" কেন সর্ব্বযুগেই পতিত জাতি ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া সুখী। আরো অদ্ভুত, যেহেতুক "পুণ্যবান্ বিধ্বস্ত হইবে"—পাপীর একবারে উল্লেখ নাই। আমাদের এইটি মানিতে হইবে যে পাপীর বিনাশ প্রত্যক্ষ, পুণ্যবানের বিনাশ পরোক্ষে। পাপীর নরক লাভ বিনাশ, পুণ্যবানের স্বর্গলাভ কালে পতনের হেতু। সুতরাং পাপীও পুণ্যবান্ উভয়েই বিধ্বস্ত হয়, কেবল দীন হীন কাঙ্গাল ভগবানের দয়াপাত্র, প্রিয়পাত্র হয়। সেই ভগবৎপ্রিয় ভক্তের বিনাশ নাই। এই পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবটি উহার সূক্ষ্মতা। স্বতন্ত্র ভারতে

কেন সমস্ত জগতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার না হইলে জীব অহঙ্কারের কালানলে উৎসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। পাগল মানুষের এই অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করিবেন। আর একটী উপদেশ বড়ই সময়োচিত। যাদৃশ অধমেরও প্রাণের কথা—"যাহাদের শ্রীবিগ্রহসেবা আছে তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিলেই বুঝিবেন।" বস্তুতঃ আমরা দেখিতেছি শ্রীবিগ্রহ সেবকগণের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। ইহার মৌলিক কারণ অপরাধ। শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা দ্বারা শত সেবাপরাধ লাগা থাকে। অপরাধ সাধ করিয়া কিনিয়া আনিবার প্রয়োজন? শ্রীমূর্ত্তি-সেবা যেমন অমৃত তেমন বিষ। অতএব এ বিষয়ে সবারই সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইদানীং আমরা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার এক দারুণ রোগ দেখিতেছি। এ সিদ্ধান্ত ভুলিলে চলিবেনা যে "পতিতই সুখী"—শাস্ত্র।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ বিদ্বানের উদ্যান।—কত না হিল্লোল খেলিতেছে! তাঁহারা নাটক নভেল কাব্যাদি পড়েন—শেক্ষপিয়র পড়েন, মিল্টন পড়েন, কালিদাস পড়েন, বঙ্কিম পড়েন, আরো সকল কত কি পড়েন, আর সুখে ডুবিয়া যান এবং গ্রন্থকারের মস্তকে কত বা "বাহবা"-চন্দন মাখা পুষ্প বর্ষণ করেন! "কিন্তু একখানা বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করুন" এ অনুরোধ যেন কাণে বিষ ঢালে। কি খেদ, হোক্ না সে অমৃতপারাবার, তবু স্পর্শ করিবে না,—একটা যেন বমনের মুখ বন্ধ স্বরূপ উদ্গার উছলে। দেবগণের ক্ষীরোদ মন্থনে চন্দ্র, অমৃত, ধন্বন্তরি উঠিয়াছিল; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষীরোদ সিন্ধু ধরুন্, দেবের দেব শ্রীবৈষ্ণবগণ তাহা মন্থন করিয়া শ্রীগ্রন্থ শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। উহা যথার্থ-অমৃতনিধি, উহার রসাস্বাদে জীব অমর হয়, আনন্দবিভোর হয়। সুশীতল হয়, ভবরোগে মুক্ত হয়। তাই বলিতেছি, উহাতে চাঁদের কিরণ কত ঝলমল করিতেছে, কত অমৃতধারা উছলিতেছে, কত ধন্বন্তরি সভা মিলাইয়াছে। ক্ষীরোদ মন্থন ব্যাপারে দেবগণ মধ্যে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন শ্রীবিষ্ণু। বৈষ্ণব-গণের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনে অধ্যক্ষ স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু। ক্ষীরোদধির অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন দেবগণ, দৈত্যগণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সময়ের পুণ্যবান্ বিদ্বান্গণ শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থ সিন্ধুর দুর্লভমিত সম্ভোগে বঞ্চিত। যিনি জন্মিয়া অমৃত পান করিলেন না, তিনি উৎসন্ন যান বৈ কি? শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের উপদেশ রত্ন মধু রশ্মি পুণ্যবানের চিত্তে প্রবেশ করেনা। তাহাদের

চিত্ত তমসাচ্ছন্নই থাকিয়া যায় এবং আঁধারে বিধ্বস্ত হয়। জন্মিয়া যে উত্তম সামগ্রী ভোগ করিতে পায় না, সে অধন্য,—তাহার জন্ম নিরর্থক—সে, প্রকৃতই "জন্মিয়া না মৈল কেনে?"

গঙ্গার যেমন বহুশাখা ও উপনদী আছে, হিন্দুধর্ম্মও তাদৃশ নানামত, নানালীলা দ্বারা পরিমণ্ডিত। সকল শাখা ও উপনদীর মুখ্যা যেমন গঙ্গা, সেইরূপ সকলমতও সর্ব্ব-লীলার মূলসত্য পরিপাক স্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম। বিভিন্ন মতসমূহের সমীকরণাক্ষম বিদ্বানেরা ধাঁধায় পড়িয়া যান। এই গোলক ধাঁধায় নিপতিত উৎসন্নাবস্থ জীবের কল্যাণ চিন্তা করিয়াই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নানা দেবদেবীর পূজোপাসনার উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিয়া * এবং নানামতের সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ "শ্রীনাম" প্রচার করাইয়া এক অপূর্ব্ব চিত্তচমৎকারকারী বৈদিক বিজ্ঞানময়, সত্যময়, প্রেমময়, রসময় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয়তার, একতার, মনুষ্যতার ও সুখের একমাত্র নিদান এই ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম এক ময়রার দোকান। উহাতে নানাবিধ সুমিষ্ট সামগ্রী সুসজ্জিত আছে। বালক দোকানে প্রবেশ করিয়া অবাক্ অপ্রতিভ হইয়া চাহিয়া থাকে, কোনটির পরিচয় করিতে পারেনা। কোন্‌টি খাবে, কোন্‌টি না খাবে এই সমস্যার ভুলে গোলে পরিয়া সারবস্তুর রসাস্বাদে বঞ্চিত হয়। হয়তো বালক অসার সামগ্রী দিয়া পেট ভরিয়া ফেলে সার সামগ্রী পরিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাই দয়া করিয়া সর্ব্ব-সামগ্রীর রসসারনির্য্যাস লইয়া এক রসামৃত খণ্ড তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। পসারে মোটেই ঐ এক সামগ্রী, যে ঢোকে সে পায়, খায়, আনন্দে নাচে গায়। জীবনের অল্পসময়ে অপার চূড়ান্ত লাভ! পুণ্যবানেরা তাহা একবার ভুলেও চাখিবার চেষ্টা করিবে না। কেবল নানানৈবেদ্যে ঠোক দিয়া, পরধর্ম্ম যাজন করিয়া বাহাদুরি করিবে।—এর চেয়ে আত্মবঞ্চনা আর কি হইতে পারে!

একে বর্ণভেদ, তাহাতে বেশভূষা ভেদ। শ্রীগৌরাঙ্গ ঠাকুর একটি মাত্র ভদ্রবেশ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। শিখাটি বৈদিকী; কিন্তু এখন

* ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব দেবদেবী পূজার বিরোধী ছিলেন। কলিজীব অপারক বলিয়াই তিনি অন্য কঠোর সাধনার পরিবর্ত্তে নাম সাধন প্রচার করিয়াছেন। (ভঃ সঃ।)

ব্রাহ্মণেও উহা অসভ্যতার চিহ্নধারণ বলিয়া মনে করেন। মূলকথা মনগড়া ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একবিধ ধর্ম্ম, একবিধ বর্ম্ম ধারণ না করিলে জীবের উচ্ছেদ নিরাকরণ অসম্ভব হইবে। দূরদর্শী রাধামাধব লিখিয়াছেন :—

"প্রেমের সাধন গৃহীরও হইতে পারে, সন্ন্যাসীর পক্ষে দুরূহ।"—

"যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥"

"সন্ন্যাসীর পক্ষে দুরূহ"—এস্থলে পাগল মানুষ "সন্ন্যাসী" শব্দে শুষ্কবৈরাগ্য ধরিয়াছেন। তাহা পয়ারের দ্বিতীয় চরণ পাঠে সাব্যস্ত হয়। কারণ "সন্ন্যাস" দ্বারা কর্ম্ম ফলে অনাসক্তি সূচিত হয়। এই যথার্থ সন্ন্যাস গৃহীরও অবলম্ব্য, উহা ব্যতীত প্রেমলাভের আশা নাই। "সন্ন্যাসীর পক্ষে দুরূহ" পাঠে সহসা পাঠকের ভ্রম উপজাত হয়।

"আমি আপনাদিগকে প্রেমদান করিবার জন্য অতিথি; একবার উন্মুখ হইলেই, বিশ্ব-প্রেমে পূরিত হইতে পারেন। আমিওআপনাদের ন্যায় গৃহী। সন্ন্যাসীর বিচার আমি চাইনা. কেবল চাই—মহাপাপী। মূর্খ, চণ্ডাল, কুষ্ঠ, অন্ধ, খঞ্জ, পতিত সকলেই প্রেম পাইবার সমান অধিকারী।" যাঁহার মুখচন্দ্র হইতে এই সুধাশীতল অভয়বাণী বিনিসৃত হইয়াছে তিনি যে অসামান্য বিশ্বপ্রেমিক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিধির কূপে বা তৎকূলে নাম-পদ্ম-ফসল ভাল হয় না। বিধিকূপের প্রবাহ-স্বরূপ রাগ-সলিলে উহার সুন্দর বিকাশ হয়। নামের দু'টিফল্‌ পুণ্যফল ও প্রেমফল। একশ্রেণীর লোকে ব্রতাচারাদির ন্যায় নাম করেন। উহারা নামের সাক্ষাম্মাধুর্য্যের উদ্দেশ লননা। তাঁহারা কেবল মনে করেন, নামে বিঘ্ন নাশ হয়, পুণ্য হয়—নাম করি। নামের প্রকৃত শিষ্য যিনি. তিনি অপর ব্রতাচারাদি হইতে যজ্ঞরাজ নামানুবাদকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সুতরাং নিরপরাধে নামরসাস্বাদ করিয়া প্রেমফল প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি কেবল সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বিধি বদ্ধ হইয়াছে।

"প্রেমসে মিলে নন্দলালা।"—কৃষ্ণ, প্রেম-মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ। নিরপরাধ নামাশ্রয়ে সেই দেবদুর্লভ প্রেমধামে প্রবেশ করা যায়। অপরাধ এড়াইবার একমাত্র উপায় দীনতা বা পণ্ডিতমন্যতা। পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা ভক্তাবের অপচয়

সাধিত হয়। এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পতিত জনেরই নামে অধিকার পুণ্যবান্ কর্ম্মীর অধিকার নাই। তাহার পক্ষে নাম পরধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময় বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শনিপূজা, নারায়ণ সেবাদি সামাজিক ব্যাপারেও হরি সংকীর্ত্তন একটু অঙ্গ মধ্যে দাঁড়ায়। দুএকটি গানের পর কয়েক সের বাতাসা বিলাইয়া দেওয়া হয়। অমুকের রোগ দূর হইয়াছে মানসিক শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অঙ্গ হইল। এবম্বিধ নামসংঙ্গীত দ্বারা ভূরি অপরাধ অর্জ্জিত হয়। কীর্ত্তন চলিয়াছে, তামাক ও খুব চলিয়াছে, পান দিচ্ছে, চিবাচ্ছে; দুচারিটী মজাদারী রগড় গল্প রহস্যও চলিয়াছে, যেন শ্বশুর বাড়ীর আমোদ। ঈদৃশ হরিনামের গ্রাম্য কৌতুকে যাহারা যোগ দেন তাহারা মূর্খ অপরাধী। হরিনাম সাধন পঞ্চম বেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ। এই নাম-পীযুষ বেদচতুষ্টয়ো-পদিষ্ট কর্ম্ম-চোনার সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া যায়। নাম-সাধন প্রণালী এক অপূর্ব্ব ধরণের, কর্ম্মকাণ্ডের সহিত উহার ভত সংশ্রব নাই। লজ্জাবতী লতা যেমন করস্পর্শে ঢলিয়া পড়ে, শ্রীনাম কল্পলতিকাও শুভাশুভ কর্ম্ম স্পর্শে ম্রিয়মানা হয়। উহা অপর কোন কর্ম্ম পদ্ধতির অঙ্গ নয়। উহা শুদ্ধ নিরপেক্ষ। নাম ধরতো অন্য সব ত্যাগ কর। যদি বাঁচিতে চাও, ইহাই সেবন কর, অন্য ঔষধের প্রয়োজন নাই। যদি মরিতে সাধ, একটী বটী ও পাঁচন, পান আদা অনুপানে সেবন করিয়া যমের পাচনীর প্রহার খাও। নাম সাধন প্রণালী জলপথ—নদী বাহিয়া যাও এ ঘাটে সে ঘাটে নৌকা লাগাইয়া ব্যবসাদারীর প্রয়োজন নাই। রাধামাধব বলেন :—

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও নিজ নিজ গোত্র ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া অচ্যুতগোত্র এবং দাসপ্রভু সম্বন্ধ না হইলে কোন রূপ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপায় নাই।—আশাকরি ভক্ত পাঠকবৃন্দ রাধামাধবের এই উচ্চারিত মন্ত্র দৃঢ় করিয়া ধরিবেন। সামাজিক শ্রীসম্পাদনের কৌশল স্বরূপ শ্রেণীবিভাগ সহ প্রধান প্রধান কতকগুলি কর্ম্ম মানবসমাজে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়। জীবের যেটি সাধারণ পরমার্থ লক্ষ্য সেটি ভগবৎ প্রেম লাভ। তাহাতে বর্ণভেদ জন্য আবিলতা ও বৈলক্ষণ্য নাই।

"আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনাদের সহিত সমুদয় শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রস্তুত। আমি গোপনে বা চুরি করিয়া বলি নাই। একটীবার সম্মুখ যুদ্ধ

হইলেই আপনাদের ধর্ম্ম মীমাংসা হইবে।”, রাধামাধব শিক্ষিত সমাজকে অতি বল দর্পে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভরশা হয় তিনি কল্পতরুর ন্যায় সবারই সাধ মিটাইয়া দিতে সক্ষম, কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি যেমন আহ্বান করিতেছেন, তেমন আকর্ষণ করিতেছেন না। তিনি আকর্ষণ করিলে বহু জীবের ভূরি লাভ হইত। দীপালোকাকর্ষণে বহু বহু কীট জুটিয়া আত্ম-সমর্পণে প্রয়াস পায়।

পাগল মানুষের চিত্র রসিক যেরূপ আঁকিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। এই আলেখ্য দর্শনে রাধামাধবকে ভাবসিদ্ধ জন বলিয়া মনে হয়। আমরা “গোরা গোরা” সদা চীৎকার করি, জীবন ক্ষয় করি, অথচ গোরাভাবের তত্ত্ব এই পাগলটীকে যেয়ে একবার দেখিনা। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য বৈ কি ?

“শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রের বিধি সকল একবাক্যে কলিকালে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া উচ্চ হরিনাম সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা ও তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান কলিযুগের বিধি প্রতিপালিত ধর্ম্ম। যাঁহারা এই শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের আজ্ঞা পালন করেন, তাহাদের সমস্ত বিধিই পালন করা হয়। আবার যাঁহারা তাহা অবহেলা পূর্ব্বক অর্থও প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় শ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্মত সত্যত্রেতাদির ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা প্রভুর নিকট অপরাধী হন।

কলির যুগধর্ম্ম নামব্রহ্ম সাধন। তল্লক্ষ্য প্রেম। মধুময় প্রেমানুরাগ প্রাণ ধর্ম্ম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সুপ্রতিষ্ঠ। উহার যথার্থ স্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণই কলি-কল্যাণ যুগধর্ম্ম, কলি-জীব-ধর্ম্ম। হরিভক্তি বিলাসাদিস্মৃতি উক্ত সোপচার পূজা চর্য্যাদি দ্বাপরের ধর্ম্ম। শ্রীনামমণি ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত রাগ-ধর্ম্ম পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই হরিভক্তি বিলাস বিধিচর্য্যা উপেক্ষার নয় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু একান্ত বিধিচর্য্যায় রাগমার্গ আচ্ছাদিত না হয় ইহাই রাধামাধবের উদ্দেশ্য। রাধামাধবের কটাক্ষ কেবল কপট ধর্ম্মী জনের প্রতি। তিনি অগ্নিহীন অঙ্গারের পক্ষপাতী নহেন। দর্পণ হারাইয়া কেবল ফ্রেম্ খানিতে কি উপকার হয় ?

রাগপ্রাণ বৈষ্ণবধর্ম্ম কঠোর ব্রাহ্মণ বিধির আঁটনীতে সঙ্কুচিত? নিষ্প্রভ হইতেছে সন্দেহ নাই। তবু কেবল দেহ সাধনযোগ্য করিবার জন্য হরিভক্তি বিলাসবিধি অবশ্য প্রতিপাল্য। সুতরাং উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট রূপে বক্তব্য। উহা গৌণধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত না হওয়ায় আমাদের রাধামাধব বড়ই মর্ম্মব্যথী। এতৎ প্রতি ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টি পড়ুক্ ইহা আমাদের প্রার্থনা। নির্ম্মল রসোজ্জ্বল ধর্ম্মে বিধি ছিদ্র দিয়া ধর্ম্মধ্বজিত্বকীট প্রবেশ করতঃ সরস প্রাণ-ধর্ম্মকে নীরস জড় করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণে নিয়াছেন হরিভক্তি বিলাস, আপামর সাধারণ ভক্ত নিয়াছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ব্রাহ্মণে এখনও যুগধর্ম্ম অবতরণ করেন নাই। তাঁহারা তেজস্বী উর্দ্ধে দ্বাপর-সোপানে আছেন। "হরিভক্তি বিলাস সত্যযুগ হইতেই ছিল; তাঁহার জন্য অবতারের প্রয়োজন ছিলনা।"—ঠিক্‌কথা! মহাপ্রভু হরিভক্তি বিলাস আনেন নাই, তদূর্দ্ধ কোন দিব্যচমৎকারী বিশিষ্ট বস্তু তিনি আনিয়া দিয়াছেন। তদ্বস্তুই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, যাহা আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়, আস্বাদনীয়।

"কলিযুগের যুগধর্ম্ম সর্ব্বাংশে নূতন। এই জন্য, নবদ্বীপ ধাম, নবলীলা নবসঙ্গ; পুরাতন বিধির সহিত ইহার বিপরিত ভাব; প্রেমের গতি কুটিল, সকলই উল্টা ব্যাপার।"—কি সুন্দর, কি সুন্দর! "অনর্পিতচরী" ধর্ম্মের ইহাই একমাত্র সূত্র ও ব্যাখ্যা। উল্টা হইলেও ব্রহ্মানন্দ (শান্ত) পর্য্যন্ত উল্টা নয়, তৎপর্য্যন্ত যুগত্রয়সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত! অতঃপর উহা পূর্ণানন্দ সম্বন্ধ (মধুর) ঘটিত। বিষয়াশ্রয়বৈপরীত্যক্রম।

"কলিযুগে আশ্রম বর্ণের ভেদ নাই; সকল জাতিই পতিত এবং সকল বর্ণেরই একপ্রকার ধর্ম্ম।" যাহারা এই সাধুক্তি মানেনা, তাঁহারা নিশ্চয় পুণ্যমরীচিকামুগ্ধ, এবং জৈবব্যবসায় প্রমত্ত। শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার এবং সকলভাগী। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই বংশীরব যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে এবং মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবৎপ্রপন্ন হইয়াছে, তাহার জাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, তাহার অপরাধও নাই। নাম সঙ্কীর্ত্তন সম্বন্ধে রাধামাধব বলেন "ইহাও বাহ্য ধর্ম্ম।" কারণ—

"সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ-ধর্ম্ম ছাড়ি সে কৃষ্ণকে ভজায়॥"

পতিত নিরপরাধ জন নামানুকীর্ত্তনফলে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হন।

"রাগমার্গ বল পূর্ব্বক প্রচার করাই যুগধর্ম্ম" (কলি যুগধর্ম্ম) সত্য সত্য, নিগূঢ় সত্য! তোমাকে বল পূর্ব্বক বলা যাইতেছে "তুমি শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপরাধে নাম কর, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিবে।—কেবল ইহাই কর, ইহাই কর।"—বলপূর্ব্বক প্রচার কিরূপ আমরা বুঝি নাই। তবে ধারণা হয় যেমন "হরের্ণামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব" ইত্যাদি রূপ ওজস্বিতার ভাবাই বল।

"মহান্ত স্বভাব হয় তারিতে পামর।
নিজকার্য্য নাই তবু যান্ তার ঘর॥"

পাগলমানুষ মহাজনের স্বভাব বর্ণনায় এই পাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এ বড় বিস্ময়কর "তবু যান তার ঘর" এ স্বভাব আমরা রাধামাধবে বেশী দেখিতে পাইনা।

ধর্ম্মবন্ধু শ্রীমান রসিক লাল "আসল পাগল ও নকল পাগল" এর বর্ণনা ব্যপদেশে যে দুটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাদের সৌন্দর্য্যগুণ "ভোজনে আনন্দ নাই, আনন্দ ভজনে" এই একছত্রেই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন "এদীনহীন সেবক ভিন্ন সকলেই তাঁহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। শরণাগত অতিথি হইলেও বহু জননায়ক দরিদ্র বলিয়া তাঁহার সহিত বাক্যলাপও করেন নাই; কেহ কেহ তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাহ।"—এ সব অতি মর্ম্মন্তুদ কথা। অন্ততঃ রাধামাধব আমাদের ভক্ত বলিয়া পূজ্য, না হয় দরিদ্র কাঙ্গাল বলিয়া দয়াপাত্র। তাহাতে রাধা-মাধবের না হইয়া আমাদের ক্ষতি; কারণ, হয়তো কর্দ্দমসম্পৃক্ত মহামণিটী দূরে নিক্ষেপ করিলাম। রাধামাধবের দুঃখ নাই, কারণ সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগেই মহাপুরুষগণও বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন দশচক্রে ভগবান্‌ও ভূত হইয়াছেন। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, রামসীতা বনবাসী হইলেন, কৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মার খেয়েছেন। রাধামাধব নিত্যানন্দের জন, তাঁহাকে অনেক সহিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংরাজী

শিক্ষা প্রভাবে "মলিন বেশের আদর নাই।" রসিকতো মূর্খ নহেন, আমাদের একবার শুনা উচিত রসিক কি বলেন। রাধামাধব গৌরের কাঙ্গাল সন্দেহ নাই। নিজ সেবা চেয়ে ভক্তের সেবায় ভগবান্ সমধিক তুষ্ট। কিন্তু রাধা-মাধব অতিথির প্রাপ্যেও বঞ্চিত হইয়াছেন। অবিদ্যান্ হ্যাটকোট পরিয়াছেন, বিদ্যান্ ধুতিচাদরে উপস্থিত। এস্থলে কাহার পূজা হওয়া উচিত? রাধামাধব বেশভূষায় বৈষ্ণব নহেন, খাটি জিনিষ।

"প্রভু বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ব্রাহ্মণকে দয়া করেন নাই, মায়ামুগ্ধ করিয়াছেন।"—একথায় আমার বেশ চৈতন্য জন্মাইল, আর ভৃগুপদ চিহ্নের কথা মনে জাগিল। দক্ষযজ্ঞেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনেক ব্রাহ্মণের মুখে এই পদচিহ্ন নিয়া গৌরব করিতে শুনিয়াছি। হায় হায়, জীবের দশা কি হ'লো! শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন "দেহিপদপল্লবমুদারম্"—শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাহা কলমে লিখিতে পারিলেন না। আর যে সে ব্রাহ্মণে ভৃগুপদ-চিহ্ন কাহিনী গাহিয়া বুক ফুলান।

পদসেবায় সুখ বা সম্ভোগ করেন দাসী। ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের রথে চড়িয়া ধরার ধূলি পান না। দণ্ডায়মান ব্যক্তি পদ সেবা করিতে পারে না, অবনত হওয়া আবশ্যক।

"মাধুর্য্যভাব স্ত্রীলোকের অতি সহজ";— কিন্তু তৎপ্রাপ্তির সুবিধা স্ত্রীলোকে ততটা প্রদত্ত হয় নাই; সুতরাং সহজ হইয়াও ফল নাই। "ভক্তকে অবহেলা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে, সে পূজায় বিড়ম্বনা ও অপরাধ ঘটে।" এ বিড়ম্বনা আমরা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভক্তরূপী ভগবান্ একথায় আমাদের বিশ্বাস থাকিলে আমরা শ্রীমূর্ত্তি নিয়া এত ঘটা ও অপরাধ সৃষ্টি করিতাম না এবং ভক্তের অমর্য্যাদা করিতাম না। জীবের কল্যাণকল্পে মর্ম্মদর্শী শ্রীশ্রীগৌর-ভগবান্ তাঁহার নিজগণ দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ শ্রীবিগ্রহসেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন,—ব্যক্তিগত শ্রীমূর্ত্তিসেবার তদধিক প্রয়োজন নাই। শ্রীবিগ্রহসেবা উচ্চাধিকারী, সিদ্ধ জনের হস্তে সাজে।

"বাউল বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই; অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণপ্রেমে দিব্যোন্মাদ হইলে বাউল হয়।"—বাউলের ইহাই দিব্যোত্তম সংজ্ঞা। ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিপ্রায়ানুরূপ বটে। কিন্তু "সম্প্রদায় নয়" বলা

যাইতে পারে, "সম্প্রদায় নাই" বলা যাইতে পারেনা। "সম্প্রদায় ছিলনা এও বলা যাইতে পারে। অপ্রাকৃত দেহে না হইয়া প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ প্রেম দিব্যোন্মত্তগণের গঠিত দলকে বাউল সম্প্রদায় বলিব না কেন? এরূপ দলের অস্তিত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাই। আমাদের রাধামাধব অপ্রাকৃত দেহে বাউল, সুতরাং বেশভূষা বিহীন বৈষ্ণব রত্ন। তিনি গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"নিরপরাধ নামসঙ্কীর্ত্তন তৃণাদপি ধর্ম্ম।"—তৃণাদপি ধর্ম্মের এ সূত্র অতি তৃপ্তিকর ও সুপক্ক।

"গোস্বামী ধর্ম্ম—রাগমার্গীয়।"—কিন্তু আমরা সমাজ ও আশ্রমের ভ্রুকুটি ভয়ে জাগিয়াও নিদ্রিত, অথবা লোক-তুষ্টির দায়ে রাগ রাগিণী ছাড়িয়া বিধির সঙ্গীত গাহি। রাগের মূল ও উদ্দীপক বিধি এস্থলে বিধি ধর্ত্তব্য নয়।

মালাতিলকাদির প্রতি পাগল মানুষের কটাক্ষ বেশী। তিন মাদৃশ অধমের প্রতিবাদ বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলেন—"মালাতিলক ধারণ হীনবেশ" বা "তৃণাদপি" ভাবের পরিচয় দেয় না; "উহা বৈষ্ণবচিহ্ন।" আমি অধম বলি, জন্মিলেই একটা বেশ থাকিবে। বেশ নানা। তন্মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণববেশ ভদ্রবেশ মাত্র, কোন ধর্ম্মচিহ্ন নয়। কালে উহা ধর্ম্মচিহ্ন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। মালাতিলক বিনয়চিহ্ন ও সৌম্য সৌন্দর্য্য সাধক। হ্যাট্ কোট্ সাট-আদি দম্ভের মূর্ত্তি খাড়া করে। তবে এমন একবেশ আছে যাহা কোন দিকে ঝোঁকে না উহা এক নির্ব্বিকার বেশ যাহা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাধামাধব সেই বেশেরই পক্ষপাতী। অঙ্গচিত্রাঙ্কনটা বস্তুতঃ ইদানীং অপাত্রেই বেশী দেখিয়া হাসি পায়। মাথায় অতি দীর্ঘশিখা, গলায় অতি মোটা মালা দেশকাল পাত্র বিচারের অনুকূলে ব্যবহৃত হউক্। ভিতর বাহির মিল থাকিলে এসব মানায় ভাল। আমার প্রেমভক্তির ওজন একছটাক কিন্তু মালার ওজন একসের এ কেমন? যাহাহউক্, এসবে বেশী আসিয়া যায়না, কিন্তু স্ত্রীজাতীর প্রতি বাউলগণের (কামুক লম্পট গোড়ীয়বৈষ্ণব যাহারা, তাহারও বাউল) অত্যাচার দেখিয়াই পাগল মানুষ পাগল সাজিয়াছেন। রাধামাধব প্রকৃত বাউল, বাউলের নির্যাতক। রাধামাধব নারীজনবন্ধু, নারীজাতির ধর্ম্মরক্ষক। মদ্গুরু শ্রীশ্রীজয়নিতাই দেবেন্দ্র নাথ প্রভুর শ্রীমুখেই শ্রীনবদ্বীপের বীভৎস বৃত্তির কথা শুনিয়া এক সময় স্তম্ভিত হইয়াছিলাম।

ক্রমশঃ—

একটী প্রাচীন কিম্বদন্তী।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী।)

—:০:—

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী বা সরস্বতী পরম সাধু বৈষ্ণব ছিলেন। এই মহাপুরুষ শ্রীধাম প্রয়াগে থাকিতেন, কখন কখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিতেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ইনি একজন কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইঁহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হন সেই সময়ে মুকুন্দসরস্বতী প্রদত্ত লাল বস্ত্র সনাতন গোস্বামী শিরোভূষণ করিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হন। মুকুন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসী দলভুক্ত। তাঁহার বৈষ্ণব সন্ন্যাস না হইলেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর উঁহার অচলা ভক্তি ছিল। পণ্ডিত জগদানন্দের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুতে একনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার জন্য সনাতন গোস্বামী এই রক্ত বস্ত্র অন্য সন্ন্যাসী সাধুর নিকট প্রসাদ বস্ত্রে গ্রহণ করিয়া মস্তকে বাঁধিয়াছিলেন। যখন পণ্ডিত জগদানন্দ শুনিলেন এ বস্ত্র প্রসাদ প্রভু দত্ত নহে, তখন তাঁহার মনে দুঃখ হইল, ক্রোধও হইল! তিনি ভাতের হাঁড়ি দিয়া সনাতন গোস্বামীকে মারিতে উদ্যত হইলেন।

তিনি ক্রোধভরে কহিলেন :—

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥

তখন সনাতন গোস্বামী হাসিয়া তাঁহার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুতে এক নিষ্ঠতা পরীক্ষা করার কথা বলিলেন।

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল॥

এই মুকুন্দ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে একটী অত্যদ্ভুত কিম্বদন্তী বহুকাল হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। আমি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট পরিবারের বড় দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত দামোদর লালা গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরাঙ্গ গতপ্রাণ পরম পণ্ডিত শ্রীল বনমালী গোস্বামীর নিকট যেমন শুনিয়াছি তেমনি বর্ণনা করিব। শ্রীপত্রিকার পাঠকবৃন্দ কিম্বদন্তী অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু এই অদ্ভূত কিম্বদন্তীর মধ্যে কিছু কিছু রসিক চন্দ্র শ্রী শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রের তাৎকালিক ভারত সম্রাট আকবর বাদসাহের প্রতি কৃপার পরিচয় পাইবেন। সেই জন্যই এই কাহিনীটি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিতে বাসনা হইল।

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। শ্রীপ্রয়াগ ধামে তাঁহার কুটীর। তাঁহার আশ্রম বর্ত্তমান ফোর্টের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত এই ব্রহ্মচারীর একটী সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রত্যহ হরিদ্বারের গোমুখী নিঃসৃত গঙ্গোদক আনয়ন করিয়া তাহার গুরুদেবের পূজা ও সেবার জন্য তাঁহার আশ্রমে রাখিতেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। পদব্রজে প্রয়াগ হইতে হরিদ্বারে নিত্য যাতায়াত মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শিষ্যটি তাঁহার গুরুদত্ত একটী ঔষধের বলে আকাশ পথে প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার যাইতেন। একটী গুটিকা মুখ মধ্যে রাখিলেই স্বচ্ছন্দে তিনি বিমান বিহার করিতে পারিতেন এই গুটিকার এই গুণ ছিল। একদিন হরিদ্বার হইতে তিনি এক কলস গঙ্গা জল লইয়া দিল্লির উপর দিয়া প্রয়াগে আসিতেছেন। পথি মধ্যে দেখিলেন এক অপূর্ব্ব আলোক মালা বিভূষিত অট্টালিকার উপরে মনি মুক্তা প্রবল সজ্জিত মনোহর স্বর্ণ-পালঙ্কে দুগ্ধ ফেণ নিভ শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। শিষ্যের মনে মনে উহা দেখিবার লোভ হইল। তিনি তথায় নামিলেন। উত্তম শয্যা প্রস্তুত দেখিয়া তাহাতে বিশ্রাম করিবার লোভ জন্মিল। সেখানে কোন লোক দেখিলেন না। স্বর্ণ পর্য্যাঙ্কে সুখে শয়ন করিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইলেন। যথাকালে হুমায়ুন বাদসাহ তাঁহার শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিলেন পর্য্যাঙ্কোপরি একজন অপরিচিত অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে বিছানার উপর একটী জ্যোতিষ্মান গুটিকা পতিত হইয়াছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গুটিকাটি তুলিয়া লইলেন এবং নিজ গাত্রবস্ত্রের মধ্যে লুকায়িত করিয়া রাখিলেন। তাহার পর এই আগন্তুক

সন্ন্যাসী কি করে দেখিবার নিমিত্ত কিছু না বলিয়া অতর্কিত ভাবে অন্য পালঙ্কে নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিলেন। যথাকালে এই বিমানচারী সন্ন্যাসী শিষ্যের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এবং তাহার মুখে গুরুদত্ত সিদ্ধ গুটিকা নাই। এই সময়ে হুমায়ুন বাদসাহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বয়ং সম্রাট বলিয়া পরিচয় দিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্য সম্রাটের সম্মুখে ভীত চকিত হইয়া আত্মবৃত্তান্ত সকল যথা যথ পরিচয় দিলেন এবং সেই গুটিকাটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদসাহ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুটিকাটি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন কোন ভয় নাই নির্ভয়ে চলিয়া যাও, কিন্তু তোমার গুরুদেবের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে হইবে। সন্ন্যাসী শিষ্য ইহা স্বীকার করিয়া যথারীতি গঙ্গাজল কলস লইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন।

সেদিন গুরুদেবের আশ্রমে পৌঁছিতে বিশেষ বিলম্ব হইল। তাহাতে গুরুদেব মুকুন্দ ব্রহ্মচারী শিষ্যের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই অপরাধে তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। আর হরিদ্বার হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করা হইল না। অন্য বিশ্বস্ত শিষ্যও তাঁহার ছিলনা। সেই দিন তাঁহার আর এক বিপদ হইল। গোয়ালা দুগ্ধ দিয়া গিয়াছে। শিষ্য সেবক কেহ নাই। দুগ্ধ না ছাঁকিয়া সেবন করিলেন বোধ হইল যেন একটী গোরোম তাঁহার উদরস্থ হইল। ইহাতে তিনি বিষম দুঃখিত হইয়া বিষন্ন চিত্তে কোন প্রকারে দিনাতি-পাত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে শয়ন করিলেন। সেই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি এই পাপে যবন যোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া মুকুন্দ ব্রহ্মচারী বড়ই ব্যথিত হইয়া শিষ্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইলেন। গুরুদেবের মুখে তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তিনি তখন সম্রাট ভবনে গমন ও তাঁহার আদেশ গুরু-দেবকে ব্যক্ত করিলেন, গুরুদেব তাহা শুনিয়া সঙ্কেতে শিষ্যকে আদেশ করিলেন "তুমি বাদসাহকে কহিও আমি তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া মুকুন্দ ব্রহ্মচারী দুঃখে দেহত্যাগ করিলেন। তাহার শিষ্য গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। হুমায়ুন বাদ্সাহ এই কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

সিদ্ধ পুরুষদিগের যথা বাক্য তথা কার্য্য। মুকুন্দ স্বরস্বতী যথা সময়ে আকবর বাদসাহ রূপে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট হইলেন। তাঁহার হিন্দুভাব ও হিন্দুদিগের প্রতি প্রীতি দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন মুসলমান বাদসাহের এরূপ হিন্দুভাব কি করিয়া হইল। আকবর বাদসাহ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক সম্রাট। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামী হরিদাস ঠাকুর, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রভুর প্রধান পার্ষদবর্গের সহিত আকবর বাদসাহ বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাহার কাহিনী লিখিতেছি শুনুন।

প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বেত্তা তানসেন হরিদাস ঠাকুরের শিষ্য। এই হরিদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীবৃন্দাবনে এই মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনি ভজনানন্দে দিনাতিপাত করিতেন। নিধুবনে তাঁহার আশ্রম ছিল। এখনও তাঁহার চিত্র মূর্ত্তি নিধুবনে বিরাজ করিতেছেন ও পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী শ্রীবিগ্রহ এই মহাপুরুষ হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নিধুবনে এই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ হন। এমন অপরূপ রূপ সম্পন্ন পরম জ্যোতির্ম্ময় জাগ্রত শ্রীবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনে আর দ্বিতীয় নাই। তানসেনের মুখে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যার পারদর্শিতা শ্রবণ করিয়া আকবর বাদসাহ তাহার সহিত পরিচয় করিতে সমুৎসুক হন। তানসেন বাদসাহকে বলেন তিনি রাজবেশে যাইলে, তাঁহার গুরুদেব তাহাকে দর্শন দিবেন না। কারণ তিনি সাধু ফকির, রাজ দর্শন করেন না। আকবর বাদসাহ ইহা শুনিয়া ছদ্মবেশে তানসেনের ভৃত্য সাজিয়া হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে উদ্যত হইলেন। তানসেন বাদসাহকে লইয়া যথাকালে গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ঠাকুরের সেই দিবস প্রবল জ্বর হইয়াছিল। তিনি কন্থা গাত্রে দিয়া নিজ গুহায় বসিয়া কাঁপিতেছিলেন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। আকবর বাদসাহ যে ছদ্মবেশে তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই তান সেনকে কহিলেন "তুমি বাদসাহকে সঙ্গে করিয়া কেন আনিয়াছ?" তানসেন গুরুর নিকটে বিশেষ লজ্জিত হইয়া বাদসাহের আনয়ন বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিয়া, গুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস ঠাকুর একটু হাসিয়া মনে মনে জ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আজ

আকবর বাদসাহ আসিয়াছেন, জ্বর, তুমি কিছুকালের জন্য আমাকে ছাড়িয়া এই কন্থার উপর অধিষ্ঠান কর'। আমি বাদসাহকে দু'একটি গান শুনাইয়া দিব।" এই বলিয়া ছিন্ন কন্থাখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাদসাহ, তানসেন প্রভৃতি উপস্থিত লোকজন সকলে দেখিলেন ছিন্ন কন্থাখানি থর থর কাঁপিতেছে। জড়বস্তুর এ প্রকার জ্বর-কম্প দেখিয়া আকবর বাদসাহ বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইলেন। তাহার পর হরিদাস ঠাকুর বাদসাহকে বলিতে আজ্ঞা দিল, মল্লার রাগিণীতে একটী গীত ধরিলেন। যেমন সুর তান লয় যোগে গীত ধরিলেন, আকাশ মণ্ডল ঘন মেঘাবৃত হইয়া আসিল, এবং সেইক্ষণেই বৃষ্টি পতন হইল। মল্লার রাগিনীর এই ধর্ম্ম। ইহা দেখিয়া আকবর বাদসাহ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাস ঠাকুরের শরণাগত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। যাইবার সময় আকবর বাদসাহ অতি দীনতার সহিত হরিদাস ঠাকুরকে কহিলেন "আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা হয় ত কিছু করি।" হরিদাস ঠাকুর কহিলেন, আমি ফকির, সাধু, আমার কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাহি, তবে যদি তোমার বাসনা হইয়া থাকে, শ্রীযমুনার কেশীঘাটের এক কোণের এক খানি ইন্দ্রনীলমনি পাথর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যদি পার উহা মেরামত করিয়া দিও" তানসেনকে সঙ্গে করিয়া আকবর বাদসাহ কেশীঘাটে আসিয়া সেই ভগ্নস্থান দেখিলেন। দেখিয়া নিজের অপারগতা স্বীকার করিয়া বলিলেন "এত বড় ইন্দ্রনীলমণি প্রস্তর আমার নাই। যাহা আছে, অতি ক্ষুদ্র তাহাতে কিছুই হইবে না।" এই কথা বলিতে বাদসাহের বিশেষ লজ্জা হইল। আকবার বাদসাহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই যে হরিদাস ঠাকুর তাহাকে এই কথা বলিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা গেল।

তাহার পর আকবর বাদসাহকে তানসেন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। শ্রীজীব গোস্বামীরমত পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। আকবর বাদসাহ তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণীগণের আদর করিতে তিনি সতত প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট আকবর বাদ্‌সাহ বহুক্ষণ বসিয়া নানা কথা আলাপন করেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বাদসাহ সবিশেষ সন্তুষ্ট হন। যাইবার সময় যেরূপ হরিদাস ঠাকুরকে দৈন্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাদসাহ

শ্রীজীব গোস্বামীকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী কহিলেন "যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে একটী উপকার করিতে পারেন। এই ভারতবর্ষ রাজ্য আপনার অধীন। আপনি হুকুম করিলে, যেখানে হিন্দুশাস্ত্র আছে, পুরাতন পুঁথি আছে, তাহার এক এক খণ্ড নকল আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইলে হিন্দু জাতির বড় উপকার করা হইবে।" আকবর বাদসাহ রাজ বাটীতে আসিয়া সকল সুবেদারের প্রতি এই হুকুম জারি করিয়া অনেক গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই বৈষ্ণব ও গোস্বামী গ্রন্থের এত বাহুল্য প্রচার। এখনও অপ্রকাশিত কত গ্রন্থ রত্ন যে এই বৃন্দাবনে নষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। শ্রীরাধা দামোদরে দুই গৃহ পূর্ণ প্রাচীন পুঁথি কীট দষ্ট হইয়া ধ্বংস প্রায় হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীর সংগৃহীত এই সকল পুঁথি। আকবর বাদসাহের হুকুমে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ঐ সকল গ্রন্থরত্ন নানা দেশ হইতে আনীত হয়। গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক চেষ্টা করিয়াও এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রত্ন শ্রীরাধা দামোদরের সেবাইত গোস্বামীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। মুর্খ অশিক্ষিত লোক এই সকল অমূল্য বস্তুর আদর কি জানিবে।

শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিতও আকবর বাদসাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহারও একটী কাহিনী আছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর নাম শুনিয়া আগ্রা হইতে আকবর বাদসাহ, তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া আগ্রা যাইতে সম্মত হয়েন না। অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি এক দিবসের জন্য বাদসাহের হুকুম তামিল করিতে রাজি হন। অর্থাৎ প্রাতে যাইয়া সন্ধ্যার মধ্যে পুনরায় যাহাতে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি বাস করিতে পারেন তাহা বন্দোবস্ত হইলে তিনি যাইতে পারেন, এই সর্ত্তে শ্রীরূপ গোস্বামী আগ্রা যাইতে স্বীকার করিলেন। আকবর বাদসাহ শুনিয়াছিলেন শ্রীরূপ গোস্বামী সর্ব্ব প্রধান হিন্দু ফকির, এবং তাঁহার সঙ্গলাভে তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর কথামত তিনি সেই দিনই শ্রীবৃন্দাবনে যাহাতে তাঁহার পুনঃ আগমন হয় তাহার সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগ্রা সম্রাট সদনে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তাঁহার বহির্বাসের অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র কৌটা করিয়া কিছু

শ্রীবৃন্দাবনের রজ লইলেন। ইচ্ছা হইল এই বহুমূল্য পরম পবিত্র দ্রব্য বাদসাহকে উপঢৌকন দিবেন। যথাকালে আগ্রায় পৌঁছিবামাত্র বাদসাহের সম্মুখে তিনি উপস্থিত হইলেন। আকবর বাদসাহ মহাসম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আজ্ঞা দিলেন। নগ্নকায় কৌপীনধারী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ভারতেশ্বর আকবর বাদসাহের সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান। তিনি বহির্বাসের প্রান্ত হইতে রজের কৌটাটি খুলিয়া বাদসাহের হাতে প্রদান করিলেন। সাগ্রহে আকবর বাদসাহ সন্ন্যাসী প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া কৌটা খুলিয়া দেখিলেন যে উহাতে বালু পূর্ণ মাত্র। সহাস্যে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফকির সাহেব এ কি বস্তু তুমি বাদসাহকে উপঢৌকন দিলে।" শ্রীরূপ গোস্বামী হাসিয়া উত্তর দিলেন "বাদসাহ! আমার যাহা কিছু গুণ জ্ঞান আপনি লোকমুখে শুনিয়াছেন তাহা এই সামান্য বস্তুর গুণে. উহা ব্রজের রজ। উহার শক্তির কথা কি আর বলিব। বহু মূল্য বিবেচনা করিয়াই আপনার জন্য কিছু আনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আকবর বাদসাহ সেই কৌটা হইতে মহানন্দে কিছু রজ লইয়া মস্তকে দিলেন। মুসলমান বাদসাহের হিন্দুর ধর্ম্মে যে কতদূর বিশ্বাস তাহা এই কার্য্যে প্রকাশ পাইল। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যে আকবর বাদসাহের বিশেষ আস্থা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ব্রজ-রজ-প্রাপ্তে আকবর বাদসাহের যবনত্বদূর হইল। তিনি পবিত্র হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ফকির সাহেব। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যে অমূল্য রত্ন দিলে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। রাজাররীতি নজর দিলে·পুরস্কার দিতে হয়। আমি রাজা, রাজনীতি অনুসারে আমার নিকট তোমার কিছু প্রশ্ন আছে। তুমি কি চাও প্রকাশ করিয়া বল।"

শ্রীরূপ গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন "বাদসাহ! আমি সাধু সন্ন্যাসী, ফকির, আমার ত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই! তবে যখন আপনি আগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু দিবেন, তখন আমার প্রার্থনা আপনাকে জানাইতে আপত্তি বোধ করিনা। সমস্ত হিন্দু প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপে আমি আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করি যে যেন কেহ চৌরাশি ক্রোশ ব্যবধান শ্রীব্রজ মণ্ডলের মধ্যে পশু হিংসা করিতে না পারে" আকবর বাদসাহ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এই

হুকুম জারি করিয়া দিলেন, এবং তাহার একখানি নকল শ্রীরূপ গোস্বামীর হাতে দিলেন। আকবর বাদসাহ শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত অনেকক্ষণ বহুবিধ ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া সেই রাত্রেই শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এই সকল কিম্বদন্তী নিতান্ত অমূলক নহে। আকবর বাদসাহ যে মুকুন্দ স্বরস্বতী ছিলেন, তাহার প্রমান না থাকিলেও উহা অসম্ভব নহে। সাধুপুরুষ-দিগের অলৌকিক কার্য্যে অবিশ্বাস করিতে নাই। এখানে আর একটি কাহিনী বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ অপুত্রক ছিলেন। ঋদ্ধি বাবা নামক একজন সিদ্ধ পুরুষ তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যোধপুরে আসিয়া কিছুদিন থাকেন। মহারাজা ও মহারাণী এই মহা পুরুষের অদ্ভুত যোগবলের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাদের মন দুঃখ জানাইলে ঋদ্ধি বাবা কহিলেন "মহারাজ! আপনার পুত্র সম্ভাবনা নাই। যখন আপনি আমার নিকট পুত্র প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা অতএব আমিই আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব। অদ্য আমার সমাধি হইবে আপনি আমার মৃত দেহ যথা রীতি সংকার করিবেন।" রাজা যশোবন্ত সিংহ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। মনে তাহার সাধুর কথায় বিশ্বাস জন্মিল না। তিনি ঋদ্ধি বাবাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া আর একবারও আলোচনা করিলেন না, এবং কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

যথাকালে ঋদ্ধিবাবা দেহত্যাগ করিলেন। তাহার শিষ্যগণের প্রতি এমন আদেশ ছিল যে, তাঁহার মৃতদেহ যেন রাজাকে দেওয়া হয়। শিষ্যগণ সমস্ত রাত্রি রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। রাজা বা তাঁহার লোক কেহ আসিলেন না দেখিয়া তাঁহারা গুরুদেবের মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করিলেন। রাত্রিকালে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সাধুর কথা মনে হইল। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সাধুর বাক্য অবহেলা করিয়া তিনি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। কি করিবেন আর উপায় কি? মনে মনে তাঁহার বিষম অশান্তির উদয় হইল। তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে স্বপ্ন দেখিলেন যেন ঋদ্ধিবাবা তাঁহার সম্মুখে দাড়াইয়া কহিতেছেন "মহারাজ! আপনি আমার কথা অবহেলা করিয়া ভাল করেন

নাই। আমার যে কথা সেই কাজ। আমি যখন বলিয়াছি আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব তাহা হইবেই। তবে দুঃখের বিষয় আমার বাক্য অবহেলা করার জন্য আপনার ভাগ্যে পুত্র-মুখ দর্শন নাই। পুত্র জন্মিবার অগ্রেই আপনার দেহত্যাগ হইবে।" সাধু বাক্যের সফলতা হইল। অজিতসিংহ জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই মহারাজা যশোবন্তসিংহের মৃত্যু হইল। এ কাহিনী রাজ পুতনার ইতিহাসে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

এ সকল কাহিনী বটে, কিন্তু অলৌকিক কাহিনী সাধু সম্বন্ধে হইলে তাহা বিশ্বাস করিতে হয়। আকবর বাদসাহ যে পূর্ব্ব জন্মে সাধু পুরুষ ও হিন্দু ছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কর্ম্মফল ভোগ বিধির নিয়ম। সে নিয়মের অধীন সকলেই! অলমিতি বিস্তরেণ।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোসাঞি)

যাঁহারা ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় সকলের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা—বাউল, সাঁই, দরবেশ, নেড়ানেড়ি প্রভৃতি বৈরাগীগণকে ও কতিপয় কমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণকে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ীদিগের সহিত মিশিতে দেখিয়া, এবং কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়িরা তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-প্রচারক আউলে চাঁদকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ইত্যাদি বলিয়া ঘোষণা করে শুনিয়া—কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন! আবার এই সকল গ্রন্থকারের সংগৃহীত বিবরণীতে "কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা" বলিয়া প্রকাশ করায় অপরেও ভ্রমে পতিত হইতেছেন। এই ভ্রান্তি অপনোদন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বোধে আমরা ইহার প্রকৃত বিবরণ, যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সর্ব্বসাধারণের

মধ্যে প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, কর্তাভজা সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা নহে, উহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মত।—ইঁহাদিগের ব্যাখ্যানুসারে একেশ্বর বাদী লোকেরাই প্রকৃত কর্তাভজা। কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, আর তাঁহাকে যাঁহারা ভজনা করে তাঁহারাই কর্তাভজা। বীজ মন্ত্রের মূল সূত্র "গুরু সত্য" পরবর্তী মন্ত্র—"কর্তা আউলে মহাপ্রভু আমি তোমার তুমি আমার তোমার সুখে চলিফিরি তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নাই। আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু।" প্রকারান্তর।—"কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার, তুমি আমার, তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা' ছাড়া তিলার্দ্ধ নাই, গুরু সত্য, বিপদ মিথ্যা।" এই মন্ত্রের নাম ষোল আনা মন্ত্র। কোন ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমে "গুরু সত্য" এই বীজ মন্ত্র পাইয়া থাকে, পরে উহার যখন প্রগাঢ় ভক্তি ও ধারণা শক্তি জন্মে, তখন "কর্তা আউলে মহাপ্রভু ইত্যাদি" ষোলআনা মন্ত্র পাইবার অধিকারী লইয়া কর্তাভজা সম্প্রদায় ভুক্ত হয়। তৃতীয় মন্ত্র যথা ;—মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা"

ইহাঁদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম "মহাশয়" আর শিষ্যের নাম "বরাতি।" ইহাঁদিগের কর্ম্মানুযায়ী সিদ্ধ পুরুষের নাম "পাত্রসাব্যস্ত।" এই সম্প্রদায়ী লোকের নাম "ভগবজ্জন।" "ঘোষপাড়া" ইহাঁদিগের বাড়ী, নিজ নিজ বাসস্থান "বাসাবাড়ী।" মৃত্যুকে ইহাঁরা "দেহরাখা" বলেন। কারণ জীবাত্মা অমর, তিনি এখানে দেহ রাখিয়া অন্যদেহ ধারণ করেন। ইহাঁদিগের জাতি বিচার ও অন্নবিচার নাই—সকলবর্ণের লোকই এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী, এবং যে বর্ণের লোকই হউক একবার মূলমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক এ ধর্ম্মভুক্ত হইলে, ইহাঁরা তাহার সহিত অন্নপান গ্রহণ করেন। ইহার পোষকে ইহাঁদিগের একটী বচন আছে, যথা "লোকের মধ্যে লোকাচার, সংগুরুর মধ্যে একাকার।" ইহাঁদিগের মতে মানুষ মানুষের সেব্য ও পূজ্য তদ্ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর আরাধনা বা উপাসনার আবশ্যক নাই। ইহাঁদিগের গুরু অর্থাৎ মহাশয় মুখে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে জনশ্রুতিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মতে পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণও পরহত্যাসাধন

এই তিনটী "কায়কর্ম্ম ;" আর এই ত্রিবিধ কায়কর্ম্মের ইচ্ছারূপ "মনঃকর্ম্ম ;" মিথ্যাকথন, কটু কথন, বৃথাভাষা ও প্রলাপ ভাষা এই চারি প্রকার "বাককর্ম্ম" এই দশবিধ কর্ম্ম নিষেধ। ইহাই আউলিয়া চাঁদের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া খ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটী গীত প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে অনেক গুলি রামশরণ পালের পুত্র রামদুলালের রচিত। এই গুলিই ইহাঁদিগের "শাস্ত্র"বাক্য। এই সকল গীতকে ভাবের গীত বলে ; এই গীতের আলাপ ও আলোচনাই ইহাঁদিগের উপাসনা। নিম্নে একটি গীত উদ্ধৃত হইল।

ভজরে ভজরে তার চরণ।
ও যার নাম করিলে হয়, সকল জ্বালা নিবারণ॥
তুমি বারেক ভজে দেখো, মজা না পাও, বুঝে সুঝে ক্ষান্ত হ'য়ে থেকো,
সেই দীনহীনগণ জনার মনোরঞ্জন॥
যে জন ইক্ষুরসের পেয়েছ সন্ধান, অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান,
তেমনি ক্ষীণ হ'তে হ'তে দুঃখপাবে অতিশয় নানানো মতে ভাই,
ছেড়োনা এই দীনহীনগণ জনার মনোরঞ্জন॥

প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর ইহাঁরা স্ত্রী ও পুরুষে একত্রে এই সকল ভাবের গীতের আলাপ করিয়া উপাসনা করেন। এই উপাসনার জন্য মিলনকে "বৈঠক" বলে।

বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্য গোস্বামিগণের নিকট ইহাঁদিগকে দীক্ষিত হইতে দেখা যায় না, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতে শোণা যায় না। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ইহাঁদিগের মধ্যে নাই, ইহাঁদিগের গুরু অর্থাৎ "মহাশয়েরা" প্রায় কেহই ব্রাহ্মণ নহেন।

এই সকল জানিয়া এবং তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত আচার অনুষ্ঠান দেখিয়া কে বলিবে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা। ইহা যে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, তাহার আর কোন ভুল নাই। আমরা ইহাকে হিন্দু-সম্প্রদায় বলিতেও সঙ্কুচিত হই। ইহা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় হইলেও এই সম্প্রদায়ী বুদ্ধিজীবীগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানসে ইহাকে হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আবরণে লুক্কায়িত রাখিয়া কমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেকারণ প্রকাশ্যে

হিন্দু ধর্ম্মের কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া ইঁহারা পূর্ব্বোক্তমত ধীরে ধীরে স্বসম্প্রদায়িগণের মধ্যে বিস্তার করিতেছেন। যদিও আমরা এই সম্প্রদায়ির অনেককে এখনও বাটীতে লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠীপূজা করিতে দেখি, স্বজাতি ও স্ববর্ণের মধ্যে যথাবিধি বিবাহাদি আদান প্রদান করিতে দেখি, গুরুও পুরোহিত রাখিতে দেখি; তথাপি যে ইহাঁরা বিরুদ্ধাচারী তাহার আর কোন ভুল নাই। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া, পাঠকগণকে ইহার বিচারের ভার অর্পণ করিলাম। পাঠকগণই বিচার করুন।

ইহাঁদিগকে চৈতন্য সম্প্রদায় বলিয়া লোকের ভ্রমের কারণ,—"কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ এবং ইহাঁদিগের পর্ব্বাদিতে বৈরাগী ও নেড়ানেড়ি লইয়া নাম সংকীর্ত্তন, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্ত্তি লইয়া দোলরাস করা, রামশরণ পালের ও সতীমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবগণের মহোৎসবের ন্যায় মহোৎসবাদি করা—নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আউলেচাঁদ, রামশরণ পাল ও সতীমা ইহাঁরা কে তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইহাঁদের পাঁচটীপর্ব্ব আছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। এই সকল পর্ব্বে ঘোষপাড়ায় মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলায় বহুলোকে সমাগম হয়।

১ম, ফাল্গুণী পূর্ণিমা। এই সময়ে একদিনে, দোল ও রাসযাত্রা হইয়া থাকে। দোলচৌকিতে ও রাসাসনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতে দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু গুপ্ত ভাবে ঐ মূর্ত্তির পশ্চাতে আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ি ও কন্থা বস্ত্রে আবৃত করিয়া বালিশের আকারে স্থাপিত করা হয়। এই দোলরাস, প্রকতই, কন্থার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কর্ত্তাভজা ও তন্মতাবলম্বী লোকে ইহা বিশেষ অবগত। কিন্তু সাধারণে রাধাকৃষ্ণের দোল ও রাস দেখিয়া থাকেন।

২য়, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় রথযাত্রা, রথে অন্য কোন ঠাকুর সংস্থাপিত হয় না। বালিশের আকারে উক্ত আশা বাড়ি ও কন্থা স্থাপিত হইয়া থাকে।

৩য়, রামশরণ পালের মহোৎসব।—আষাঢ় মাসের রথ যাত্রার পর চতুর্থী তিথি এই উৎসবের দিন। এই উৎসব তিনদিনে সম্পন্ন হয়। অধিবাস, মহোৎসব ও পূর্ণমহোৎসব।

৪র্থ, সতীমার মহোৎসব।—আশ্বিন মাসের দেবী পক্ষের প্রতিপদের দিন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা রামশরণ পালের মহোৎসবের ন্যায় তিনদিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৫ম, কোজাগর লক্ষ্মী পূজার দিন। পূর্ণিমার রাত্র জাগরণে ও গীতাদিতে উৎসব সম্পন্ন হয়।

এই পাঁচটী পর্ব্বের মধ্যে দোলরাস পর্ব্ব সকলের প্রধান। এ সময় ঘোষ পাড়ায় এত লোকের সমাগম হয় যে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কয়েকখানি বিশেষ ট্রেন কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত এক ভারায় যাতায়াত করিবার জন্য দিয়া থাকেন। আবার হোরমিলার কোম্পানি গঙ্গাবক্ষে কয়েকখানি ষ্টিমার কলিকাতা হইতে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকান পসারি গিয়া নানা দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

কি কারণে ঘোষপাড়ারমেলায় এত লোকের সমাগম হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ত্রিবিধ কারণে সহস্র সহস্র লোকের সংঘট হইয়া থাকে। ১ম, কুৎসিত চরিত্রের নরনারী ধর্ম্মের আবরণে নিজ স্বার্থসিদ্ধি মানসে, ২য় কতকগুলি সরল চরিত্র ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসী উৎকট রোগাদি হইতে মুক্ত হইবার বা অপার কোন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে, ৩য়, কতকগুলি নিকর্ম্মা ব্যক্তি হুজুগ দেখিতে ও কর্ত্তাভজারা কিরূপ ভাবে ধর্ম্মযাজন করে তাহাদের ব্যাপার দেখিতে। এই ত্রিবিধ লোক সমাগমের মধ্যে অশিক্ষিত ও স্ত্রীজাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে নামক একজন দেশীয় খৃষ্টীয়ান, তাঁহার গোবিন্দ সামান্ত নামক ইংরাজী পুস্তকে ঘোষপাড়ার কুব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে ঘোষপাড়ার মেলায় ভদ্রলোকের বা প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসীর আদৌ সমাগম হয় না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

রামশরণ পালের বংশধরগণের বর্ত্তমান ব্যক্তি ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজা-দিগের গদির কর্ত্তা। ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজাদিগের মতে তাঁহাদের সকলকার "বাড়ী" নিজ নিজ বাস স্থান "বাসাবাড়ী" একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই 'বাড়ীর মালিক অর্থাৎ ঘোষপাড়া গদির কর্ত্তা, ইহাঁদের সর্ব্বময় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এই সকল মেলায় যে টাকা আদায় হয় তাহা রামশরণ পালের

বংশ ধরেরাই পাইয়া থাকেন। দোলের সময় তাঁহাদিগের যেরূপ আয় হইয়া থাকে এরূপ আয় অন্য কোন পর্ব্বে হয় না। তাঁহাদের আয়ের পথ তিনটী ১ম খাজনা, ২য় ভোগ, ৩য় মানসিক। কর্ত্তাভজাদিগের মতে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্ত্তার, অতএব তাহাতে তুমি বাস কর তাহারি খাজনা অর্থাৎ কর তোমার অবশ্য দেয়। ভোগ—সতীমার সমাজ ঘরে কিংবা ঠাকুর ঘরে অর্থাৎ রামশরণ পাল প্রতিষ্ঠিত নাম কীর্ত্তনের ঘরে যাহা কিছু ভোগ দেওয়া হয় তাহাই। আর মানসিক, কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য কিংবা কোন দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাহা মানসিক পূজা দিবার বাসনা করিয়াছ তাহাই। এই তিন প্রকার।

রামশরণ পালের বংশধরেরা এইরূপে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ধনীর ন্যায় বসবাস করিয়া থাকেন। বাৎসরিক এই আয়ের টাকা একটী জমীদারীর আয়ের ন্যায়।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—:০:—

১। জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। সিরাজগঞ্জ আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর হইতে শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র সান্যাল, এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মুল্য ॥• আনা। গ্রন্থকার পুস্তকের নিবেদনে সমাজের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ব্যথিত অন্তঃকরণে সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও গ্রন্থকারের সুরে সুর মিলাইয়া একবার সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি। ইহাতে জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। "চাতুর্ব্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগস" ভগবানের এই উক্তিকে মটো করিয়া গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিজমত সংস্থাপন করিয়াছেন। যদিও সকল স্থানের সহিত আমরা গ্রন্থকারের মতে মত দিতে পারিনা, তথাপি গ্রন্থকারের অদম্য উৎসাহ দেখিয়া

তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিনা। অধঃপতিত সমাজের উন্নতী বিধান কল্পে গ্রন্থকারের যেরূপ উৎসাহ তাহা যথার্থই প্রসংশার্হ। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

২। শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার। এখানিও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। জাতিভেদ গ্রন্থপ্রণয়ণ দ্বারাই গ্রন্থকার জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি যেভাবে সমাজের উন্নতীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই গ্রন্থকারের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। তবে তিনি যে ভাবে শূদ্রাদিকে সপ্রণব মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দিতে প্রয়াসি, সমাজ তাহা লইতে চাহে কিনা সন্দেহ। এসম্বন্ধে গ্রন্থকার অনেক বিচার, অনেক প্রমাণ প্রয়োগ গ্রন্থ মধ্যে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

৩। গীতা মধুকরী। অর্থাৎ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতানুযায়ী অন্বয়মুখে সরল টীকা এবং মর্ম্মার্থ সংযুক্ত পয়ারাদিছন্দে অনুবাদ সম্বলিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অভিনব সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ দাস। প্রাপ্তিস্থান ২৫নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধান ১৷৹ চারি আনা। আজকাল বাজারে গীতার ছড়াছড়ি, মুদ্রাযন্ত্রের সুলভতায় এবং গীতা-গ্রাহীর আগ্রহে নানা ভাবে নানা আকারে গীতা বাহির হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই গীতা মধুকরী খানি পাঠে যথার্থই প্রীত হইয়াছি। সর্ব্বোপনিষদের সার গীতারত্ন অনেক অনধিকারীর হাতে পড়িয়া অতি জঘন্য ভাবে প্রচারিত হইতেছে এ সময় এরূপ সুসঙ্গত ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ নির্ভুল সংস্করণ বিশেষ প্রয়োজন। দামও খুব অল্প সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এক্ষণে ইহার আদর দেখিলেই আমরা সুখী হইব। আমরা সর্ব্বান্তকরণে ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

মন্তব্য।—ভক্তির সহিত পৃথক পত্রাঙ্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বাহির হইতেছিল কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ বহু প্রবন্ধ মজুত রহিয়াছে বলিয়া স্থানাভাবে উহা প্রকাশ হইতেছেনা শীঘ্রই পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশ আরম্ভ হইবে। (ভঃ সঃ)

"সম্পাদকীয় বক্তব্য।"

—:o:—

ভক্তি সর্ব্বসাধারণের কাগজ। ইহা কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব, কি শৌর, কি গাণপত্য সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী। ইহাতে কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ প্রকাশ হয় না। আর সেই জন্যই আজ ১৫ পনের বৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে এই কাগজ পাঠ করিতে পারে তাহার জন্য মূল্যও এতাবৎকাল বার্ষিক ডাক মাশুল সহ এক টাকা মাত্র ছিল। আমরা এতদিন বিশেষ ক্ষতি বোধ করিয়াই একটাকাতে কাগজ দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি কোন কোন দ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্য হইয়াছে তাই আর কোন প্রকারেই একটাকাতে কাগজ দেওয়া যাইতেছেনা। বিশেষতঃ ভক্তির পূর্ব্ব আকার কমাইয়া দিয়া ভাল ভাল লেখকগণের লেখা প্রকাশ করিতে না পারিলে এবং তাহাতে গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট থাকিবেননা, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং অনেক গ্রাহকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি করাই শ্রেয় মনে করিয়া গত মাঘমাস হইতে ভক্তির মূল্য বার্ষিক সডাক ১॥০ দেড় টাকা ধার্য্য করিয়াছি। যাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষে ১৲ টাকা দিয়া গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহার ঐ এক টাকাতেই বর্ত্তমান বৎসরের কাগজ পাইবেন, তৎপরে ১॥০ দেড় টাকা লাগিবে। আর যাঁহাদিগের নিকট এ বৎসরের মূল্য বাকী আছে তাঁহারা যদি ১৫ই চৈত্রের মধ্যে টাকা না পাঠান তাহা হইলে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট ১॥০ দেড় টাকা ধার্য্য করিব। আশা করি আমাদিগের অবস্থা বুঝিয়া সুধী পাঠকমণ্ডলী বাৎসরিক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র ভিক্ষা দিয়া ভক্তিদেবীর সেবা করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেননা। আশা করি সকলেই আপনাপন বন্ধুগণের মধ্যে ভক্তির প্রচার করিয়া আমাদিগের কার্য্যের সহায়তা করিবেন। অলমিতি।

(ভক্তি পাঞ্চজন্যপর্ব্ব ৮ম সংখ্যা, চৈত্র মাস, ১৩২৩।)

নববর্ষ আবাহন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতরত্ন স্মৃতিভূষণ।)

এস হে আকর্ষণের দেবতা। আকর্ষণ প্রভাবেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থই পরমাণু সমষ্টি মাত্র। এই স্থূল জগৎ পরমাণু-পুঞ্জ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক পদার্থ পরমাণু সমষ্টি হইলেও উহার এক পরমাণু অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না, অথচ অত্যন্ত সন্নিকটে অবস্থান করিতে থাকে। এক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। আবার পার্শ্বস্থিত অপর পরমাণু কর্ত্তৃক স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অগণিত পরমাণু-পুঞ্জ এইরূপে আকর্ষণ করিয়া এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক পদার্থ উৎপন্ন করিতেছে। এই আকর্ষণের তারতম্যানুসারে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া থাকে। আণবিক আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক হইলে অল্প স্থানে অধিক পরমাণু সন্নিবিষ্ট হওয়াতে পদার্থ কঠিন হইয়া থাকে।

পরমাণু-পুঞ্জ আকৃষ্ট হইয়া যতই সন্নিকৃষ্ট হউক না কেন তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকেই থাকে। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণু স্থির নহে। তাহারা নিজ নিজ আণবিক ব্যবধানের মধ্যে ঘটিকা যন্ত্রের পরিদোলকের ন্যায় ইতস্ততঃ দুলিতেছে। তাপাধিক্যে এই পরিদোলন অধিক হয় সুতরাং পরমাণু-সন্নিহিত ব্যবধান দীর্ঘতর হওয়াতে বস্তুটী স্ফীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

একটী পরমাণু যখন আকৃষ্ট হইয়া অপর একটীর দিকে যায় তখন সেই পরমাণুটী আকর্ষণকারী পরমাণুর বিপরীত দিকের পরমাণু হইতে দূরে যাইতেছে বিশ্লিষ্ট হইতেছে বা বিকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, ইহাই বিকর্ষণ। বিকর্ষণ আকর্ষণেরই প্রকারান্তর, উহা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

এই আকর্ষণ বিকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে কোন পদার্থ হইতে পারিত কি? একটী পরমাণু যদি অপর পরমাণুকে আকর্ষণ না করে, তাহা হইলে এই বিশ্ব তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্বের জন্য, সত্বার জন্য আকর্ষণের আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয় পূজনীয় স্বামিপাদ বলিয়াছেন "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দঃ।"

পরমাণুর এই স্বাভাবিকী আকর্ষণী শক্তি কোথা হইতে আসিল? আপাততঃ দৃষ্টিতে যাহা আপনা আপনিই হইতেছে বলিয়া বোধ হয় আমরা তাহাকেই স্বাভাবিক বলি। যেমন তৃণাদি পত্রের হরিদ্বর্ণতা স্বাভাবিক। নবদুর্ব্বাদলের শ্যামলতা আপনা আপনিই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটী শ্যামল-দুর্ব্বাদল-বীথির উপর তাপালোক প্রতিষেধক কোনও পাত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিলে কিয়দ্দিবস পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা রসাভাবে যদি শুষ্ক না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত শ্বেত হইয়াছে। ফলতঃ তাপালোকই জগতে বর্ণ বৈচিত্রের কারণ। আপনা আপনি কিছুই হয় না বা হইতে পারে না।

সূর্য্য যেমন বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও কিরণ রূপে তাপালোক দ্বারা সমস্ত সৌর জগতের অন্তঃ প্রবিষ্ট, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ গোলকধামে নিত্য বিরাজমান থাকিয়া আকর্ষণ রূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সত্বা বিধান করিতেছেন। সূর্য্য যেমন সৌর জগতের কেন্দ্র স্বরূপ, গোলকধামও সেইরূপ নিখিল বিশ্বের কেন্দ্র স্বরূপ, আমাদের এই সৌর জগতের ন্যায় কত কোটী কোটী সৌর জগৎ অনন্ত আকাশের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। গোলকধাম সেই সময় সৌর জগতের কেন্দ্র স্থানীয়। সমুদ্র যেরূপ আকাশের নীলাভায় প্রতিভাত হইয়া নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আকাশও সেইরূপ তমাল-শ্যামল-শ্যামসুন্দরের নিত্য-নিকেতন সেই গোলকধামের অবয়ব বিচ্ছুরিত গ্রহ নক্ষত্রাদি পরিধৌত জ্যোতিতে নীলাভ হইয়াছে।

সূর্য্য সৌর জগতস্থিত সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হইয়া দুলিতে দুলিতে নিজ গন্তব্য পথে যাইতেছে। আবার প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু সমূহ নিজ নিজ আণবিক অবকাশের মধ্যে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। আপনা আপনি কিছুই হয় না। ইহার কোনটী শ্রীভগবানের দোললীলার শক্তি আর কোনটী বা

তাঁহার হিন্দোলনলীলার শক্তি। শ্রীভগবান্ শক্তি সঞ্চার করিলে সকলেইসম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন।

সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত থাকিলেও তাপালোক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বলিয়া আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আকর্ষণ প্রভৃত অপ্রত্যক্ষ পদার্থ হইলেও জড়বাদীগণ সর্ব্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-ভূমি গোলকাগত এই আকর্ষণ স্থির চিত্তে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

সর্ব্ববিধ আকর্ষণের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বদা নিজধামে বিরাজিত থাকিলেও যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে প্রকার জীব তত্ত্বজ্ঞান হারা হয় তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রকার জীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে শিক্ষাচ্ছলে নিজ লীলা প্রকট করেন। এক প্রকারের জীব সমশ্রেণী জীবের নিকট হইতে যত সহজে শিক্ষা লাভ করিতে পারে অন্য শ্রেণীর জীব হইতে সেরূপ পারে না বলিয়াই তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাকারে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

একবার এই ব্রহ্মাণ্ডে নরাকৃতি জীবগণ তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছিল বলিয়া তিনি নরাকৃতি ধারণ করতঃ তাহাদের জ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। যে মাসের যে তিথিতে তিনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন সেই মাসের সেই তিথি কতবার আসিয়াছেন কিন্তু ইনি নিত্যই নূতন ভাবের নূতন আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন।

তাই বলিতেছি এসহে আকর্ষণের দেবতা, তুমি আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিয়া এই জগৎ সৃজন ও পালন করিতেছ, কত পাপী তাপীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। বংশীধ্বনিতে গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া মধুর লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। সর্ব্বাকর্ষক, তুমি একবার এই জড়-চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তোমার শ্রীপাদ পদ্মে লীন করতঃ তোমার শ্রীকৃষ্ণনাম সার্থক কর, জগৎবাসী দেখিয়া ধন্য হউক।

তুমি সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাক, কিন্তু তোমাকে আকর্ষণ করিবার একটী পদার্থ আছে, তোমার ভক্তগণ তাঁহাকে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা—"ভক্তি দেবী।" এই "ভক্তি" পত্রিকা সেই ভক্তিদেবীর অনুবাদ স্বরূপিণী হউন ইহাই প্রার্থনা।

জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটিই হতাশ আক্ষিপ্তের হৃদয়োচ্ছ্বাস মাত্র। অর্থাৎ "তত্ত্ববস্তুর" আস্বাদ না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে "তত্ত্ববস্তু" বহুরূপীর (জন্তু বিশেষের) ন্যায় হইলে, সাধক-হৃদয়ে কথনই তিনি শান্তি স্থাপন করিতে পারেন না। বরং বিভ্রম ঘটাইয়া সাধককে "উদভ্রান্তির" পথে আনয়ন করিবেন। শাস্ত্র যে অর্থে তাঁহাকে "বহুরূপ" বলিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত তদনুকূল নহে। শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট "বহুরূপের" অর্থ এই যে 'তিনি বস্তুতঃ একরূপ হইয়াও সাধকের হৃদয়ের ভাব অনুসারে "বহুরূপে" প্রতিভাত হইতে পারেন। এইরূপে প্রতিভাত হওয়া তাঁহার স্বভাব। অর্থাৎ নানারূপে প্রতিভাত হওয়ার শক্তি একমাত্র তাঁহারই আছে; কিরণ প্রথমতঃ একরূপ বলিয়া মনে হইলেও কাচাদি সহযোগে যেমন নানারূপে প্রতিফলিত হয়। তদ্রূপ শ্রীভগবান নানাবিধ সাধনায় নানারূপে বিরাজমান হয়েন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি যে বাক্য মনের অগোচর তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু "তত্ত্ববস্তু"তে এমত শক্তি অস্বীকার করা যায় না, যে শক্তির সাহায্যে তিনি ইচ্ছা করিলে মনো বুদ্ধির গোচর না হইতে পারেন! প্রাকৃত মনো বুদ্ধির দ্বারা তিনি সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত না হইলেও কৃপা পূর্ব্বক যাহাকে আভাসেও জ্ঞাত করাইয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহার আভাস পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট আমার কথা নিতান্ত প্রলাপ বলিয়া অনুমিত হইবে না।

যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত স্থির হইল যে,—"তত্ত্ববস্তু" বস্তুতঃ সূর্য্য-কিরণবৎ একরূপ। সাধকের হৃদয় অনুসারে তিনি স্বয়ংই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন। সেইকারণ সাধকগণ হৃদয়কে নির্ম্মল

করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাদির চর্চ্চা রূপ এক একটি পন্থা অবলম্বন করেন। সকল গুলি পন্থা দ্বারাই যে হৃদয় সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তাহা নহে। যে পন্থাদ্বারা যতটুকু নির্ম্মলভাব সেই হৃদয়ে প্রতিফলিত হন। উক্ত প্রতিফলন গুলি সেই একমাত্র নির্ম্মল তত্ত্ববস্তুরই প্রতিফলন। কিন্তু হৃদয়ের অস্বচ্ছতা বশতঃ সাধকগণ সেই সুনির্ম্মল"স্বরূপকেই" আপন আপন হৃদয় অনুসারে বিকৃতভাবে দর্শন করেন মাত্র। শ্রীভাগবত এই কথাই হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, একমাত্র "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব" সুনির্ম্মল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন। জ্ঞানীর "হৃদয়ে তদপেক্ষা রঞ্জিত, যোগীহৃদয়ে পরমাত্মারূপে এবং তদপেক্ষাও অধিক অনুরাগী ভক্ত-হৃদয়ে ভগবান রূপে প্রতিভাত হয়েন। স্বয়ংও উদ্ধবকে বলিয়াছেন,"— আমি ভক্তি দ্বারা স্বচ্ছীকৃত হৃদয়ে যতটুকু সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া থাকি অন্যান্য পথাবলম্বনে স্বচ্ছীকৃত হৃদয়ে ততটুকু প্রকাশ হই না।

এক্ষণে অনুসন্ধান করা যাউক, সাধকগণের হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার নিমিত্ত কতকগুলি পন্থা শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন; এবং তৎ তৎ পন্থাবলম্বনে স্বচ্ছীকৃত হৃদয়ে তিনি কি কি স্বরূপে প্রতিফলিত হন। পন্থাও অসংখ্য, তাঁহার প্রতিফলনও অসংখ্য। তবে মূলতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি পন্থা শাস্ত্র অঙ্গীকার করেন।

১। কর্ম্ম। ২। জ্ঞান। ৩। যোগ ৪। ভক্তি। ৫। তত্ত্ববাদীগণের অবলম্বনীয় পন্থা। উপরোক্ত পন্থাবলম্বীগণের হৃদয়ে তাঁহার প্রতিফলন যথাক্রমে নিম্নলিখিত মতে হইয়া থাকে।

১। ইন্দ্রাদি দেবতা। ২। ব্রহ্ম। ৩। পরমাত্মা ৪। শ্রীনারায়ণ। ৫। তত্ত্ব (গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ।)

দেবতা হইতে গোপীবল্লভ পর্য্যন্ত যাবতীয় রূপকেই ভগবানেররূপ বলা যাইতে পারে। শ্রীগোপীবল্লভই শ্রীভাগবত নির্দ্দিষ্ট "তত্ত্ব" এবং পরব্যোম-স্থিত "শ্রীনারায়ণই" শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দিষ্ট গোপীজনবল্লভ। ভগবানের বিলাস মূর্ত্তি অবলম্বনে হৃদয় সুনির্ম্মল হইলে ভক্তসাধক নির্ম্মলান্তঃকরণে "তত্ত্ববস্তু" গোপীবল্লভকেই ধারণ করিয়া থাকেন। গোপীবল্লভই যে যথার্থ তত্ত্ব তাহার প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতা দিতেছেন যথা—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

আর সেই গোপীবল্লভই যে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রিত রতিসংযুক্ত বৈধী ভক্তি-নিষ্ঠ সাধক হৃদয়ে শ্রীনারায়ণরূপে প্রতিভাত হন তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবত দিতেছেন—

"এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"

এই শ্রীনারায়ণ যে "প্রতিভাত স্বরূপ" মাত্র "যথার্থ স্বরূপ" নহেন তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতে স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী দিতেছেন—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী শ্রীনারায়ণের সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ সুখাস্বাদন না পাইয়া গোপীবল্লভকে পতিরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন।

"কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥"

তপস্যা কর্ম্মমার্গীয় সাধন। কেবলারতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তি ভিন্ন "যথার্থ তত্ত্ব" গোপীবল্লভকে পাওয়া যায় না। সেইকারণ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তপস্যা করিয়াও শ্রীরাসেশ্বরকে পাইলেন না।

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনি গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীনাম্॥

এক্ষণে তত্ত্ববাদীগণের মায়াগন্ধ শূন্য সুনির্ম্মল হৃদয়ে যথার্থ স্বরূপে যিনি উদিত হন, তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাইবার পন্থা যে কি তাহার সুস্পষ্ট আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। "ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার পথ।" ভক্তি দুই প্রকার রতি সংযুক্তা হইয়া থাকেন। এক ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা রতি। আর এক কেবলা রতি। তন্মধ্যে কেবলারতি সংযুক্তা ভক্তির দ্বারাই "তত্ত্ববস্তু" (শ্রীগোপীবল্লভ) সাধ্য হন। কেবলা রতি সংযুক্তা ভক্তি আবার দুই প্রকার। বৈধী এবং রাগানুগা। তন্মধ্যে রাগানুগা ভক্তি দ্বারাই সাধক 'তত্ত্ব" লাভ করেন। কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তিই

"তত্ত্ববস্তু" লাভের একমাত্র পন্থা, অপর পন্থাগুলি মাত্র তাহার "প্রতিভাত স্বরূপকে" সাধন করিয়া দেয়।

শ্রীনারায়ণ যে "যথার্থ তত্ত্বের" (শ্রীগোপী বল্লভের) "প্রতিভাত স্বরূপ" তাহা প্রমাণ হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক যোগীহৃদয়ে প্রকাশিত পরমাত্মা "তত্ত্ববস্তু" গোপী-বল্লভেরই প্রতিভাত স্বরূপ কি না? গোপীবল্লভ স্বয়ং শ্রীমুখে প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"

ইহার অর্থ—যোগীগণ সর্ব্বভূতস্থিত "পরমাত্মা স্বরূপে" আমাকেই (শ্রীগোপীবল্লভকেই) ভজনা করিয়া আমার "প্রতিভাত স্বরূপেই" মগ্ন থাকে। যোগীহৃদয়ে প্রতিভাত 'পরমাত্মা" যে যথার্থ "স্বরূপ তত্ত্ব" নহেন তাহার প্রমাণ শ্রীমুখেই দিতেছেন।

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

ইহার অর্থ—শ্রদ্ধাবান (শ্রীগোপীবল্লভে একান্ত নিষ্ঠাবান) যিনি আমাগত অন্তরাত্মা কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তির দ্বারায় আমার (শ্রীগোপী-বল্লভের) ভজনা করেন তিনি উক্ত "পরমাত্ম" নিষ্ঠ যোগীগণ অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।

পুনরায় অন্বেষণ করা যাউক জ্ঞানী হৃদয়ে প্রতিভাত "ব্রহ্ম" যে "স্বরূপতত্ত্ব" "শ্রীগোপীবল্লভের"ই প্রতিভাত স্বরূপ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? শ্রীগোপীবল্লভ নিজমুখে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি॥"

ইহার অর্থ—"যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে,—"আমি অন্যান্য জীবগণ হইতে পৃথক্ এক শ্রেণীর জীবমাত্র, এ মোহ আর থাকিবে না; অধিকন্তু সমগ্র ভূত সকলে "সনাতন ব্রহ্ম" স্বরূপে একমাত্র আমিই রহিয়াছি এইরূপ জ্ঞান হইবে। অনন্তর (অর্থাৎ ভাগ্য ক্রমে আমার কৃপায় কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তি

জন্মিলে, সেই "সনাতন ব্রহ্ম" আবার আমাতে লগ্ন আছেন, অর্থাৎ "ব্রহ্ম" যে গোপীবল্লভের "প্রতিভাত স্বরূপ তাহা বুঝিতে পারিবে। জ্ঞানী হৃদয়ে প্রতিভাত "ব্রহ্ম" যে স্বরূপতত্ত্ব নহেন তাহা নিজ মুখেই বলিতেছেন—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগীভবার্জ্জুন।"

জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জ্ঞানী হৃদয়ে প্রতিভাত "ব্রহ্ম" অপেক্ষা যোগী হৃদয়ে প্রতিভাত "পরমাত্মা" সুস্পষ্ট। আবার পর শ্লোকেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন, যোগী হৃদয়ে প্রতিভাত পরমাত্মা অপেক্ষা ভক্ত-হৃদয়ে প্রতিভাত আমি সুস্পষ্টতম।

পুনশ্চ দেখা যাউক নানাবিধ কাম্য কর্ম্ম দ্বারায় সাধ্য ইন্দ্রাদি দেবগণ যে "স্বরূপতত্ত্ব" শ্রীগোপীবল্লভেরই "প্রতিভাত স্বরূপ" তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না? শ্রীমুখেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম॥

ইহার মর্ম্মার্থ সুস্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। কর্ম্মী হৃদয়ে প্রতিভাত দেবগণ যে স্বরূপ তত্ত্ব নহেন, তাহার প্রমাণ শ্রীমুখেই দিয়েছেন; প্রথম ষষ্ঠ অধ্যায়ে "কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী" দ্বিতীয় নবমে—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাং॥

অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ অবলম্বনে দেবযাজীগণ আমাকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করেন। পিতৃযাজীগণ আমাকেই পিতৃপুরুষ এবং ভুতযাজীগণ আমাকেই ভূত জানিয়া অর্চ্চনা করেন। আমার যজনকারী ভক্তগণ আমাকেই (শ্রীগোপীবল্লভকেই) যথার্থতত্ত্ব জানিয়া আমারই সেবা করেন। দেবতা হইতে ভূতগণ পর্য্যন্ত আমারই (পরম তত্ত্বেরই) "প্রতিভাত স্বরূপ"

শ্রীমুখের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

ইহার অর্থ।—ইহ জগতে তিনটী তত্ত্ব দেখা যাইতেছে, সাধ্য, সাধক ও সাধনা। ইহাদেরই নামান্তর ভগবান, ভক্ত, ভক্তি। তিনটী তত্ত্বই এক। একেই তিন। তিনেই এক। তত্ত্বস্ত (শ্রীগোপীবল্লভ) সাধ্য। কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তি, সাধনা; উক্ত ভক্তিনিষ্ঠ হৃদয় বিশিষ্ট জীব (শ্রীমতীর অনুগা সখি) সাধক। লীলাময় গোপীবল্লভ লীলা বিস্তার জন্য মায়া * আশ্রয় করিয়া শ্রীমতীর অনুগা সখির হৃদয় হইতে কেবলা রতি এবং রাগকে অপহরণ করিয়া লইলেন। তখন জীবের (সখির) হৃদয় রাগ শূন্য কেবলা রতি বিহীন হইয়া ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা রতি বৈধী ভক্তিনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। তখন শ্রীগোপী-বল্লভ সেই হৃদয়ে শ্রীনারায়ণ রূপে প্রতিভাত হন। সখি তখন লক্ষ্মীর অনুগা সখি হন। ক্রমে লীলাভিপ্রায় প্রবল হইলে, লীলাময়, সখির হৃদয় হইতে ভক্তিকে অপহরণ করিলে, যোগী, জ্ঞানী হন। লীলাময় জ্ঞানী-হৃদয়ে "ব্রহ্মরূপে" প্রতিভাত হন। পরে জ্ঞান অপহরণ করিলে, জ্ঞানী তখন অর্থকামী মনুষ্য হয়। লীলাময় সেই কামী মনুষ্য হৃদয়ে দেবতা পিতৃপুরুষ ভূতাদিরূপে প্রতিভাত হন।

আর তিনিও অর্থকামনা করিয়া তাহাদের পূজা করেন; লীলাময় ও তৎ তৎ রূপে তাহাদের বাসনা পূরণ করেন।

"স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান হি তান॥"

শ্রদ্ধা ও তাঁহা হইতে শ্রদ্ধার পাত্র দেবতাদি ও তিনি এবং কামনা যাহা তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্ত হন, সেগুলি ও তাঁহারই বিহিত।

দৃশ্যমান প্রপঞ্চে অসংখ্য মনুষগণ যে যেরূপ সাধকে পরিণত হইতেছেন, তন্মধ্যে মার্গগুলি গোপীবল্লভের "প্রতিভাত স্বরূপের" সাধন মার্গ সাধ্য বস্তুগুলি গোপীবল্লভের "প্রতিভাত স্বরূপ" এবং সাধকের হৃদয়গুলি প্রতিভাত স্বরূপের প্রতিফলন স্থান। সেই অসংখ্য মনুষ্যগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৌভাগ্য ক্রমে কেবলা রতি সংযুক্ত রাগানুগা ভক্তির অনুসরণ করিয়া মায়াশূন্য সুনির্ম্মল স্বচ্ছ হৃদয়ে যথার্থ "স্বরূপ তত্ত্ব" শ্রীরাধার সহিত শ্রীরাধানাথকে এবং ক্রমে

* এই মায়া পরম ব্যোমাদিতে যোগমায়া এবং ব্রহ্মাণ্ডাদিতে প্রকৃতিরূপ। (লেঃ)

তাহাদেরই রসময় পরিপাক একেই দুই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ধারণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হন।

"মনুষ্যাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥"

সমালোচনা।

(পাগল রাধামাধব ১ম খণ্ড)

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষাংশ।)

—:০:—

নব ছিদ্র বিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দেহ দ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি।—বংশীধ্বনির এই সংজ্ঞা পাঠে কে না মুগ্ধ হইবেন? সংজ্ঞা চিত্ত চমৎকারিণী তত্ত্বের একশেষ। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উঠিতে না পারিলে জীব বংশীধ্বনি শুনিতে পারে না। ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতেও পারে না, কহিতেও পারেনা। "শব্দ ব্রহ্মের পারগামী" জন এ সমাচার রাখেন। আমাদের রাধামাধব এ সমাচার আনিয়াছেন। তাই তিনি বৈষ্ণব সমাজে কলঙ্কিনী।

রসিকের "পাগল মানুষ, খাঁচার পাখী।" কবিতাটি অতি সুন্দর। ভাবুকের ভাবমাধুর্য্য উহাতে বেশ ভাসিয়াছে। এমন একটি কবিতা বিরল।

রাধামাধব সকল গুলি প্রচলিত শ্রীপত্রিকা আগ্রহের সহিত পড়েন বা শুনেন। তিনি অতি ভাবগ্রাহী ও সারগ্রাহী। এই গ্রন্থে প্রদত্ত রাধামাধবের সকল গুলি কথাই তাঁহার নিজস্ব নয়। ভক্তগণের পত্র-পাঁতি প্রবন্ধাদির অনেক সারাংশও উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেগুলি তাঁহার নিজস্ব-রত্ন, সেগুলি যেন অতি গম্ভীর সমুদ্র হইতে উথলাইয়া উঠিয়াছে। প্রতিপচ্চন্দ্রের সুধাতেই মাতাইয়া দিয়াছে, পৌর্ণমাসীতে কত না সুধাবর্ষণের আশা। এই গ্রন্থখানি

পাগল গোঁসাই স্বরূপ আকাশের একচন্দ্রকলা, পঞ্চদশকলা এখনও গুপ্ত, পূর্ণকালচাঁদ কতই প্রভা খুলিবে, সুধা ঢালিবে। অর্থাৎ এই ক্ষণজন্মা মহাত্মার ভিতর কত সামগ্রী আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

"স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাই গোচারণ লীলা।
স্বয়ং শ্রীমতীর নাই বিরহের জ্বালা॥"

এই পয়ার উল্লেখ করিয়া রসিক যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। "স্বয়ং" অর্থ এস্থলে নিত্য ধরিতে হইবে। তবে আমার এস্থলে সন্দেহ যে রাধা ভূবৃন্দাবনের শ্রীরাসেশ্বরী তিনি কি স্বয়ং রাধা নহেন? প্রেমরাধা কি স্বয়ং রাধা নহেন? গম্ভীরার বিরহজ্বালা কি স্বয়ং রাধার নয়? নহিলে শ্রীগৌরাঙ্গ নিগুর্ণ পরমেশ্বর থাকেন কি? যেমন লঙ্কায় অপহৃত মায়াসীতা, তেমন অভিমন্যু গৃহের ছায়া রাধা ভিন্ন রাধা রাধাই। সোজা সোজা আমরা এই বুঝি। আমি অধম প্রশ্নোত্তরমালার মিলনবিরহের কথা-গুলির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

বিরহ সম্বন্ধে মাদৃশ জীবাধমের প্রাণে প্রভু এই আভাস দিয়াছেন আমি যখন নশ্বরদেহ পরিধি ছাড়িয়া টুপ করিয়া কেন্দ্রস্থ স্বরূপস্থ বা নিরুদ্ধ হই, তখন আমি আমার কোন প্রিয়জনের ভাবে কাঁদিয়া দেই। ইহা পূর্ব্বরাগ বিরহ। আমাদের রাধামাধবও তাহাই বলিয়াছেন, অথচ বিরহটি নশ্বর দেহোপজাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বিরহটি ঠিক্ নিগুর্ণ বলিয়াই স্বীকার্য্য। বিদেহাবস্থায় বিরহোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ নশ্বর দেহে থাকিতে বিরহ জাগেনা। নশ্বরগণ্ডী ছাড়াইলে, উহার উপলব্ধি হয়। "জড় নশ্বর দেহ যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ বিরহ যাতনা অনুভব করিতে হইবে"—একথা কেমনে মানি; বিরহ কি জড় দৈহিক? বিরহকে প্রেমে একান্ত অনুস্যূত জানি। তবে বিরহ সগুণ প্রেম নিগুর্ণ কেমনে বলি? বঙ্গদেশী বৈষ্ণবকে শ্রীস্বরূপগোস্বামী উপদেশ করিয়াছেন যথা:—

দেহ দেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥

"দেহদেহী বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

জীব=জড়দেহ+চিদাত্মা। জীবের দেহ আধারে আত্মা আর্দ্ধেই বসতি করেন কিন্তু কৃষ্ণ বা গোপ গোপীগণের সেরূপ দেহ ও আত্মা দুটি ভিন্ন নাই। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ অন্তর্ব্বহিঃ এক অখণ্ড চিদানন্দ বস্তু। এমন কি কেশ নখ পর্য্যন্তও চিদাত্মক। সোণার হাঁড়ির যেমন সবই সোণা, রাধাকৃষ্ণের সবই চিদানন্দ—চিদানন্দ স্বরূপ ব্যতীত অন্য খাদ নাই। এহেন চিদানন্দময়ী শ্রীরাধা প্রকটে বিরহের পূর্ণবিগ্রহ। ভূবৃন্দাবনের রাসেশ্বরী শ্রীরাধার জড়দেহ কোথায়? অথচ তিনি সাক্ষাদ্বিরহোন্মাদিনী। প্রেমের প্রাণ, প্রেমের ভূষণ বিরহটি শ্রীমতীতে না থাকিলে এই তপ্তমধুর বিরহ প্রবাহ ধরাধামে বহিত কি? গম্ভীরা লীলা সম্ভাবের এত গম্ভীরতা থাকিত কি?

পাগলমানুষ এ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের প্রকট লীলায় বিশেষ ভর দেন নাই। তিনি যেন আধ্যাত্মিকালোক দর্শনের সূত্র বলিয়া যাইতেছেন। না হয়, কেবল নিত্যলীলা তাৎপর্য্যেরই সুর ভাজাইতেছেন। এ আলোতে রাধামাধবকে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া ঠাওরাণ দুরূহ। কিন্তু পক্ষান্তরে "আলোচনায়" পাগল রাধামাধব আর এক পাগলের উপদেশ গুলির সমালোচনা করিয়াছেন, যেমন—

"নয়নে নয়নে রাখিবে পিরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥"

এ সব পাঠে পাগল মানুষকে একজন রসিক ভক্ত বলিয়া সিদ্ধ হয়, আমরাও তাহাই জানি।

বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে এক মহাত্মা বলিতেছেন,—"পাখী ধ'রে খাঁচার ভিতর দেখা অপেক্ষা জঙ্গলা পাখী দেখে সুখী হও।" এতদুত্তরে রাধামাধব বলিয়াছেন,—"না, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।

"শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি, ধরিল নয়ান ফাঁদে।
হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে, মনোহি শিকলে বেঁধে॥" (চণ্ডীদাস।)

ঈদৃশ রসতত্ত্বের ভূরি ভূরি উপদেশ পাঠ করিয়া, রাধামাধবকে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ সমুদ্রের দিব্যোত্তমরত্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত আসে।

"তত্ত্বকথা আলোচনা" মধ্যে পাগল রাধামাধব বলিয়াছেন, মিলন ও বিরহ একাবস্থারই অন্তর্বাহ্যভাব মাত্র। এদুটি যুগপৎ ঘটে, অন্তরে আনন্দ, বাহিরে বিষজ্বালা।" আমরা বলি বিরহ বিষজ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে এক আনন্দামৃত বহে, কিন্তু তাহা যে মিলন সুখ এমন বলা যাইতে পারেনা—উহা বিরহেরই মধুরতা; তবে কিনা বিরহের অন্তরাল হইতে মিলনটী চুপি দেয় আর হাসে। তদবস্থাকেই রাধামাধব অভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বজীবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ যে বুঝাইবার জিনিষ নয়। মূল কথা, রাধামাধব যতখানি আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার একআনাও বুঝাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের আয়তন ক্ষুদ্র। অল্প কথায় আর এর চেয়ে আশা করা যায় না। ভাবতত্ত্বগুলি খুব জমাট ঘন, বেশী চর্ব্বণ না করিলে আস্বাদন করা যায় না। এই সমালোচনা চর্ব্বণ বৈ প্রদিবাদের বমন নয়। মিলনের দারুণ পিপাসা জনিত বা মিলনের বিঘ্ন জনিত জ্বালাই বিরহ। প্রিয়জন সঙ্গলাভের যে লোভ ও আগ্রহ, তাহা এক পরানন্দের অবস্থা! অমৃত বলিয়া কোন সামগ্রী থাকিলে ইহাই। "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।"—ইহার সরলার্থ এই যে দেবগণ, ভগবানের প্রতিবেশী শুদ্ধ সত্ত্ব। বৈষ্ণব মহিমা এমনি গোপ্য, সূক্ষ্ম যে, তাহা দেবগণও অনুভব করিতে পারেনা। দেবতা শ্রেষ্ট বলিয়াই তাঁহার অসামর্থ্য স্থাপন দ্বারা বৈষ্ণবের গৌরব বর্দ্ধণ পূর্ব্বক দেবতার ঐশ্বর্য্য-দুষ্টতা-ঘটিত হীনতা স্থাপন করিয়াছেন, ইহা সমীচীন না হইলেও, পতিতের মহিমা ও ভাগ্য ঘোষনা-মান সেই তিনি পতিতকে দেবতারও উপরে বসাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা না করিলে গৌরনিত্যানন্দাবতারের দয়া, মহিমা ও তাৎপর্য্য থাকেনা এবং কলির জীবের ভাগ্য প্রকটিত হয় না। দেবতার ঈর্ষ্যা দ্বেষ লেশ আছে, কিন্তু পতিতে সে সব দেখি নাই, এযুক্তিও গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই।

হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ।

এই যদি সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ হয়, তবে রাধামাধব একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব সন্দেহ নাই।

আদিতে যুগল মূর্ত্তি সেবার পদ্ধতি ছিলনা। তৎপ্রমাণচ্ছলে রাধামাধব বলেন,—"শ্রীধামবৃন্দাবনে গোস্বামিগণ কখনও যুগল সেবা প্রকাশ করেন নাই।"—আমরা ইহা স্বীকার না করিয়া পারি না; কারণ, বৃন্দাবন হইতে

গোপাল সাক্ষ্য দিতে বিদ্যানগরে আসিলেন, তিনি একাকী আসিলেন এবং পূর্ব্বদেশেই থাকিলেন। তিনি শ্রীমতীমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন কি? স্বপ্নাদেশে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোবিন্দজীকে গহনকানন মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া তৎসেবা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পুরীতেও শ্রীজগন্নাথ যুগল নহেন। যুগল মুর্ত্তির প্রতিষ্ঠা আধুনিক সন্দেহ নাই। শ্রীগোস্বামিগণ দোষাবহ ভাবিয়াই একল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে পদ্ধতি লঙ্ঘন দ্বারা অপরাধ সৃষ্টি হয় মানিতে হইবে। রাধামাধব এটি ভাল বিষয় ধরিয়াছেন। জীবের কল্যাণ চিন্তাপর রাধামাধব এসব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ভারতীয় সর্ব্বতীর্থ দেবালয় দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, এমন আভাস পাওয়া যায় না। যুগলমুর্ত্তির কেবল গোপ্য বিলাস, উহার প্রকাশ নাই। রাধাকৃষ্ণ বিলাস অতি গোপনীয় লীলা; যোগমায়া বৃন্দা ও সখীগণ ভিন্ন আর কাহারও গোচর হয় নাই। কলিতে তাহাও আচ্ছাদিত হইয়াছে রাধাকৃষ্ণ সখা সখী সবেই পুরুষ দেহে এবারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং যুগল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এ লীলায় কেবল রায় রামানন্দের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন। সখী সমাজে যুগল প্রকাশ সাজে, কিন্তু যেখানে বহু পুরুষের হাটবাজার সেখানে শ্রীমতীকে বাহির করিতে নাই। যুগল লীলা অন্দর মহলের, বাহির মণ্ডপের নয়। বলদেব নিজদেহ দ্বারা যুগলাস্বাদন করেন নাই। যুগলমূর্ত্তি প্রকাশতো নিষিদ্ধই, এমন কি তিনি বলেন, ভক্তই ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। "ভক্ত তার অধিষ্ঠান।" ভক্তের পূজাই ভগবৎ পূজা। একদিকে ভক্তের আহার জুটে না, তিনি উপবাসী, অথচ তুমি ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া দেবালয়ে ভোগনৈবেদ্য দিয়া শ্রীবিগ্রহ পূজা করিলে, বন্ধুবান্ধব নিয়া প্রসাদ পাইলে বা উদরপূর্ত্তি করিলে এ কেমন? পাঠক মহোদয়গণ গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবেন আশা করি।

"সকাম মায়িক জগতে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে না।" পাগল মানুষের এই কথাবলম্বনে লিখিত রসিক লালের কবিতাটি অতি সারগর্ভ সুতরাং অবশ্য পাঠ্য।

"জীবকে অভয়দান ও প্রেমদান—জীবে দয়া" ইহা যেমন সহজ বুঝিলাম, "আত্মরক্ষা জীবে দয়া" এর সূক্ষ্মতাৎপর্য্য তত বুঝি নাই। বস্তুতঃ আত্মোন্নতি

না হইলে, নিজে প্রেমিক না হইলে, পরকে প্রেমদান করিতে পারে না ইহা নিরেট সত্য।

সহজ ভজন বিষয়ক দুই এক কথার উল্লেখ নাই। সহজ ভজন কি তৎসম্বন্ধে বিষদরূপে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই। শাস্ত্রবিধির অতীতাবস্থায় পৌঁছিলে পর যে ভজন অর্থাৎ বিশুদ্ধরাগের ভজন, বোধ হয় তাহাই "সহজ ভজন।" তিনি গৃহীর সহজ ভজন বিষয়ে একটু আভাস দিয়াছেন, যথা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ "সিদ্ধের" পর বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া "সহজ ভজন" পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন "ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য সম্যক্ না বুঝিলেও এ পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে বাউলীয়ার পরকীয়া ধর্ম্মটীকে তিনি অসিদ্ধ করিয়াছেন। পুরুষ নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মপত্নী লইয়া সহজ ভজনের অধিকারী হইবে ইহাই উত্তম। রাধামাধবের এসব গূঢ়োক্তির অনুশীলন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তিনিই যথার্থ বাউল বা খাটি গৃহস্থ ভাবময় বৈষ্ণব। শ্রীভগবানে যাহার বায়ুরোগ হয় তিনিই বাউল বা পাগল।

"গৌরাঙ্গ অবতারের পর যিনি অন্য মন্ত্র দেন, তিনি মহাপ্রভুকে স্বীকার করেন না,"—পাগলের এ উক্তি মানিতে হয়, কারণ একপক্ষে রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ অভিন্ন এ যুক্তি বলে যে কোন মন্ত্রই যথেষ্ট, পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ উপস্থিত দেবতা থাকিতে অনুপস্থিত পরোক্ষ দেবতার আহ্বান করিতে গেলে সাক্ষাৎ দেবতাকে উপেক্ষা করা হয় এবং ভেদজ্ঞানও সূচিত হয়। আমার যদি এ বিশ্বাস সত্য ও দৃঢ় হয় যে, এই গৌরাঙ্গই আমার রাধাকৃষ্ণ তবে আবার পৃথক্‌ভাবে রাধাকৃষ্ণান্বেষণের উদ্দেশ্য কি? কোন কোন গোস্বামীপ্রভু বলেন, আগে গৌর মন্ত্র নিয়া তারপর যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এও ভজন পথের এক জটিল সমস্যা। কিন্তু এই উপদেশেরও সার আছে; গৌরাঙ্গ গুরুরূপ, রাধাকৃষ্ণ ইষ্টরূপ। আগে গুরুমন্ত্রে গুরু বশ করিয়া গুরু কৃপায় যুগল ভজন পদ্ধতি সুন্দর বটে। "ভাল"র সবই ভাল ইহাতে বিচার নাই।

স্নেহের ভাই ভক্ত কেশব রাধামাধব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব লেখক প্রেমময় বিজয় দাদা বলেন,—"পাগল, মানুষ নহেন, দেবতা; তাঁহার কথা চতুর্ব্বেদের সার; চরিতামৃতের লক্ষমত যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তবে এই পাগলমানুষ। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যলীলার

গূঢ় মর্ম্ম পাগলমানুষ ভিন্ন কেহ এখনও বুঝিতে পারেন নাই; যদি কেহ পারিয়া থাকেন, তবে এই পাগল মানুষের কৃপায়।"—আমিও অবিকল এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছি। "পাগল রাধামাধব" গ্রন্থের ভূমিকা পড়িতেই চিত্তে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়। রসিকের লিখিত এই অশ্রুময়ী ভূমিকা জীব কল্যাণ কল্পে শ্রীপত্রিকাতে পৃথকভাবে অঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় এবং এই অমূল্য শ্রীগ্রন্থের বহুল প্রচার হিতকর দাঁড়াইবে। আমার কলুষিত জীবন ধন্য করিতে এই শ্রীগ্রন্থের যথাসম্ভবে বিশদ আলোচনা করিলাম। প্রেমফুলের অভাব; যত অজ্ঞানাপরাধ আমার গোরাচাঁদের রাঙ্গাপদে ঢালিয়া দিলাম।

হায় হায়! ওদিকে যে সর্ব্বনাশ! যাঁহার মহিমাগুণ গাহিয়া শেষ পাই না, তৃপ্তি হয় না, আজ তিনি কোথায় এস্মৃতি কি ভীষণ! আমার বড় সাধের প্রীতিচিহ্ন এই সমালোচনা যাঁহাকে উপহার দিব বাঞ্ছা। তিনি আমাদের অকূল নৈরাশ্যের প্রবাহে ভাসাইয়াছেন। সাধ পূর্ণ হইলনা! প্রাণের প্রিয়তম দাদা রাধামাধব আর এ সামান্য উপহারের প্রতীক্ষা করিলেন না। আমি হতভাগ্য তাঁহাকে অনেক বিষোপহার দিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম এবার একবিন্দু অমৃতদানে পূর্ব্বদানের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহা ভাগ্যে ঘটিলনা। রাধামাধবের জন রাধামাধব প্রেমকথা রসিকের কণ্ঠে থুইয়া মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার গৌরাঙ্গ আনন্দ পুতুল নাচাইয়া অচিরে পুতুল ঢাকিলেন। আমরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া কাঁদি। ১১ই পৌষ (১৩২২ বাং) আমাদের পাগল মানুষ বৈষ্ণব কুল-প্রদীপ নিভিয়াছেন। কেবল আঁধার—আঁধার। চিত্তে আঁধারের প্রলেপ লাগিয়া আছে। এই মেঘ প্রলেপ এক একবার বিদ্যুৎ রঙে রঞ্জিত দেখিতেছি। পাগল অই যে নিত্যধাম হইতে হাত পাতিয়া চাহিয়া আছেন। রাধামাধব যেন কি কহিতে চায়, কহেনা। জাগ্রত স্বপ্নের মত রাধামাধব আমায় বেড়িয়া আছে। তাই বিরহ মধুর ভাব আমাকে কয়েক দিন অবধি ভাবান্বিত করিতেছে। পাগলের কথা মনে উঠিতে নয়ন দুটি গলিতে থাকে, কণ্ঠ গদগদ হয়। রাধামাধবকে কভু আমি চর্ম্ম চক্ষে দেখি নাই, অথচ তাঁহার একটী ফটো যেন চিত্তে লাগিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার মসিযুদ্ধ কম হয় নাই, তবু সহজ প্রীতি। দেহ রাখিবার পূর্ব্বে পাগল মহাত্মা

আমাকে স্নেহবশে ডাকিয়াছিলেন। আমারই দুর্দ্দৈব ? রসিক সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে ইনি এ অধমকে পত্র দিতেন, কিন্তু অন্ধ অধম মূঢ় তাঁহার লিপির মর্ম্ম না বুঝিয়া এমন অমূল্য নিধির উপেক্ষা করিয়াছি। ইহা অহঙ্কার বৃক্ষের বিষফল। রসিক অন্তরী প্রথম রসের মানিক ধরিয়া ফেলিলেন যতন করিলেন, সেবা করিলেন। আমাদের এই পাগলের নাম শ্রীমদ্রাধামাধবদাস, নিবাস মানকর, বর্দ্ধমান। ইনি এক শিশুপুত্র ও অনুরূপা ভার্য্যা রাখিয়া এবং শ্রীমান রসিকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আজ ভাবিতেছি আমার ভ্রাতৃজীবন দীনাশ্রয় দয়াময় বৈষ্ণব শ্রীমান্ রসিকলাল রাধামাধব বিরহে কত না দগ্ধ হইতেছেন এবং পাগলের স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণোপায় চিন্তনে কত না ব্যস্ত আছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষ্যাবরূপ রাধামাধববৈষ্ণব সমাজের সহানুভূতি না পাইয়া অভিমানে যেন স্বধামে চলিয়া গেলেন। তিনি কত না দুঃখের জ্বালা বুকে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এদেশ ছাড়িলেন। আমরা না চিনিয়া রত্নহারা হইয়া অনুতাপ করি। দয়াময় বৈষ্ণব তিনি পরের জন্য অশ্রুদান করিলেন, প্রতিদান পাইলেন না। দাদাগো, অবুঝ আমাদের বুঝ না দিয়াই অন্তর্দ্ধান করিলে। যাহাহউক, অই যে তোমার প্রসারিত শ্রীহস্ত—এই লও, আমার সাধের প্রীতি উপহার।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

(লেখক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:•:—

বর্ত্তমান সময় আমরা কোনও পুস্তক লিখিলে পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের উপর দোষারোপ করিয়া, প্রথমতঃ মুখবন্ধ স্বরূপ এক সুদীর্ঘ 'গৌর চন্দ্রিকা' পালা গাহিয়া থাকি। কিন্তু চরিতামৃত গ্রন্থ রত্ন-স্বরূপ হইলেও, গ্রন্থকর্ত্তা প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়ই নারায়ণী সুত বৃন্দাবনদাসের প্রশংসা করিয়া নিজের বৈষ্ণবোচিত

বৈদগ্ধতায় পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসার চরম দৃষ্টান্ত, দার্শনিক তত্ত্বের জটীল মীমাংসা রস-তত্ত্বের সুগভীর আলোচনা প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেরূপভাবে করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহাকে স্বতঃই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

অন্ত্যভাগে মহাপ্রভুর প্রেম-বিহ্বলতা কি সুন্দর ভাবে আঁকিয়াছেন দেখুন, তিনি মহাপ্রভুর তিরোধান বর্ণনা করেন নাই, কেননা এই তিরোধান ব্যাপার বর্ণনা করিতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, তাই ভক্ত কবি ভক্তের দেবতার তিরোধানটী গোপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্ত খণ্ডে যেমন মহাপ্রভুর ভক্তি বিহ্বলতা ক্রমঃবিকাশ ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন,—তাহার ক্রমবৃদ্ধি জনিত দেহ চাঞ্চল্যের দ্বারাই পরিণামের ভাবী আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ও বিরহোন্মাদ সান্ধ্যাকাশের ডুবন্ত তারকা স্তবকের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছিল। জাগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে দেহ চৈতন্য আত্মবিস্মৃতিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব বিহ্বলতার ক্রম বিকাশ কবিরাজ ঠাকুর অন্ত্যখণ্ডে আঁকিয়াছেন! তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটী উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশের সুযোগ ছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও বিরহে সারারাত্রি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের মধ্যে গম্ভীরার পাষাণের উপর মাথাঘর্ষণ করিয়া রক্তাক্ত দেহে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন।

দেহে প্রাণ আছে কিনা বুঝা যাইত না। সব ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া "তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল সোয়াস আছে।" কখনও তিনি যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝম্প দিয়াছেন। সমুদ্র সলিল হইতে তিন দিন পরে তাঁহার শিথিল অস্থি বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশায় আকৃতিটী উঠাইয়া ভক্তগণ কর্ণে হরিনাম শুনাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। কখনও প্রভু জয়দেব গান শুনিয়া উন্মত্তবৎ ছুটিয়াছেন। গায়িকা রমণীর পদ ধরিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। স্ত্রীপুরুষভেদ তখন বিলুপ্ত হইয়াছে। রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তখন তাঁহাকে পাহারা দিতে হইত। নতুবা ঈষৎ তন্দ্রাবেশে, পাগলের ন্যায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন। শরীর বিশীর্ণ, অস্থি চর্ম্ম সার! জাগরণ ও স্বপ্ন একই রূপ। এই সময়ে ভাবাবেগের প্রবল অনুরাগে দেহ

স্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। এরূপ আত্মবিস্মৃত প্রেম জগতে দেখা যায় না। "বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন"

তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধণ ভ্রমে।
বেগে চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "এই বিরহ কবি কল্পনা নহে। স্বয়ং আস্বাদ যোগ্য ও আস্বাদিত হইয়াছে। প্রেমের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীগৌরের দেহ কদম্ব প্রায় হইয়াছে। সমুদ্র ঢেউ যমুনা লহরী, চটক পর্ব্বত গোবর্দ্ধণ ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে।" প্রস্ফুট কদম্ব পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুল্ল শতদলের ন্যায় প্রেমাশ্রু পূর্ণ চক্ষু, বাত-তাড়িত লতার ন্যায় তাঁহার দেহ লতার আছাড়ি বিছাড়ি পাষাণের ন্যায় শ্বাস রুদ্ধঅচল দেহ—শ্রীচৈতন্য দেবের এই ছবি খানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় অন্ত খণ্ডে কিরূপ আঁকিয়াছেন, স্থানাভাবে পাঠককে আর বেশী দেখাইতে পারিলাম না। দুঃখ রহিল। কেবল অন্তলীলায় নহে। আদিও মধ্য লীলার যে সে স্থানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভাল করিয়া মহাপ্রভুর লীলা কাহিনী লিখেন নাই, কবিরাজ ঠাকুর সেই সকল স্থানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দিগ্বিজয়ী পরাজয় ও রায় রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পণ্ডিতের ও রস গ্রাহিত্যের চরম নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সময় আসে যখন আরাধ্য ও আরাধক এক হইয়া যায়। কবিরাজ প্রেমধর্ম্ম ও আরাধ্য আরাধকের সম্বন্ধে যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা জগতের শেষ প্রার্থনীয় বস্তু, কবিত্বের হিসাবে কাব্য জগতেও অতুলনীয়।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥"
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য প্রেমেতে প্রবল॥'

লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম সুখ মর্ম্ম॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শণ বর্ণনায় বৃদ্ধ কবি তরুণ কবির ন্যায় স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তাহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটী অতি সুন্দর ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রেমের দেবতার পদার্পণে স্বভাব সুন্দর বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিল।

"পশু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা গণ।
অঙ্কুর, পুলক, মধু, অশ্রু বরিষণ॥
ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লইয়া যায়॥"
"প্রতি কৃষ্ণ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ।"

তখন প্রেমের উন্মত্ত আবেশে তৎকালে তাঁহার বিরুদ্ধ আবেগের অশ্রুবিন্দু তরু ফুল পল্লবের শিশির বিন্দুর সহিত মিলিয়া গেল। কণ্ঠের ব্যাকুল রাধা শ্যাম ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল। প্রেমের মহাকর্ষণে আজ বৃন্দাবনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সার্ব্বজনীন প্রেম উদ্বোধন করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগতে দেখাইলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের ভিতর সেই বিশ্বপ্রেমের প্রেমকণিকা নিহিত রহিয়াছে।

তাই—"শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে।
প্রভুকে শুনায় কৃষ্ণের গুণ কথা প'ড়ে॥"

যদি তুলিতে আঁকিতে পারিতাম, তবে এখানে একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিতাম। ভাষার দুর্ব্বলতা বশতঃ আর লিখিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

চরিতামৃত পরিপক্ক লেখনীর রচনা সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনও কোনও সমালোচক তাঁহার ভাষার উপর একটু কটাক্ষ পাত করিয়াছেন। কবিরাজ ঠাকুর সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় সুদক্ষ থাকিলেও বহুদিন বৃন্দাবনে অবস্থান হেতু ব্রজের কোমল ভাষা বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে ব্রজ বুলির সন্নিবেশ দেখা যায়। আরও এক কারণ হইতে পারে, বৃন্দাবন প্রবাসীগণ যেমন ব্রজের ধ্বনি, ব্রজের ফল, পুষ্প প্রভৃতিকে পবিত্র মনে করিতেন, তেমনি ভাষাটীকেও পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই ব্রজ ভাষা পবিত্রতর জ্ঞান করিয়া কবিরাজ ঠাকুর ব্যবহার করিয়াছেন। ৮৫ বৎসর বয়সে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচনা করিয়া কবিরাজ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"আমি লিখি ইহা করি মিথ্যা অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুত্তলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মন তরী নহে আর স্থির॥
নানারোগ গ্রস্ত চলিতে বসিতে নারি।
পঞ্চ রোগে ব্যাকুল দিন রাত্রি মরি॥

কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদের পুস্তক ভবসিন্ধু পার হইবার একমাত্র ভেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আত্ম প্রশংসার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরামদাস কহে শুন পুণ্যবান॥"

ইত্যাদি পাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠক! বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভনিতায়—বিনয়ের কি চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে দেখুন,—

"চৈতন্য চরিতামৃত যেই জনে শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুই পানে॥

ঠাকুর কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝিয়া ছিলেন জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিলেন, সংসারের নানাবিধ বাধা বিপত্তি অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন—তাহার শেষ ফল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া

গিয়াছেন তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে গ্রহণ করেন। পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তি নিধি মহাশয় লিখিয়াছেন "যে দিন এই পুস্তক পাঠ না হয়, সেই দিন বিফল * আমি বলি, 'যে দিন এই পুস্তক পাঠ না করি সেইদিন অন্নাহারই বিফলে যায়।'

এই গ্রন্থ সমাধার পর কবিরাজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত সাধিত হইয়াছিল। এখন নিশ্চিন্ত মনে দেহ রাখিতে প্রস্তুত ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে এই গ্রন্থ শ্রীনিবাস নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের দ্বারা—গৌড়ে প্রেরিত হইল। পথে বন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুগণ এই মহামূল্য গ্রন্থ অমূল্য মণি মাণিক্য পাইবার আশায় অপহরণ করে।

সহসা বন বিষ্ণুপুর হইতে লোক যাইয়া বৃন্দাবনে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। যে কবিরাজ দুঃখের দাবদাহে কোনও দিন ব্যথিত হন নাই,—আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গ মহা পরিশ্রমের ফল অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া, তিনি আর জীবন বহন করিতে সমর্থ হইলেন না।

"রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিলা দু'জনে।
আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে।
বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥ (প্রেম বিলাস।)

এই উপলক্ষে পণ্ডিত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন "কবিরাজের অন্তর্দ্ধানের কথা লিখা উচিত নহে, এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই। লিখিলে বুক ফাটিয়া যায়।"

কবিরাজ উপযুক্ত বয়সেই দেহ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চরিতামৃতের ভাবী যশের বিষয় যদি তিনি জানিয়া যাইতে পারিতেন, তবে আমাদের কোনও দুঃখ হইত না। পরিশেষে দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণব সমাজে এখনও এই গ্রন্থ রীতিমত পূজিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি গোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণ-

* নব্য ভারত—ভাদ্র ১৩০০, ২৬২ পৃঃ

কর্ণামৃতের টীপ্পনী, অদ্বৈত সূত্র করচা স্বরূপ বর্ণন, রস ভক্তি লহরী প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য "কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকায়" ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় "গোবিন্দলীলা মৃতে" যথেষ্ঠ প্রকাশ পাইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী ১৫৮২ খৃঃ তিরোহিত হন। অলমিতি।

কর্ত্তা ভজা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম।

(লেখক।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোসাঞি।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:•:—

"কর্ত্তা আউলে চাঁদ মহাপ্রভু" সম্বন্ধে উহাদিগের মধ্যে যেরূপ বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহা এই ;—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অন্তলীলার শেষভাগে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হন, পরে অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার বোলা ডুবলী নামক স্থানে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কিছুদিন কাল যাপন করেন। অনন্তর তথা হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের পানের বরজে এক পরম সুন্দর বালক মূর্ত্তিতে দেখা দেন। বারুইয়ের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় এই অজ্ঞাত কুলশীল বালকটীকে পাইয়া পরম অহ্লাদিত হন এবং উহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে দ্বাদশ বৎসর কাল প্রতিপালন করেন। মহাদেব যথাকালে এই বালকের বিবাহের আয়োজন করিতেছে জানিতে পারিয়া, আউলে চাঁদ ছল ক্রমে বারুইয়ের গৃহত্যাগ করেন। পরে এক গন্ধবণিকের গৃহে দেড় বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেজড়া নামক গ্রামে আসিয়া ফকিরের বেশে দেখা দেন। ইনি শক্তির প্রভাবে অন্ধের নয়ন, অপুত্রকের পুত্র, দরিদ্রের ধন মৃতের জীবন দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া স্বীয় মতাবলম্বী লোকদিগকে বিমোহিত করিয়া ছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর লোককে আপনার মতে

আনিয়াছিলেন। ইহার ২২জন প্রধান শিষ্য ছিল এই শিষ্যগণের মধ্যে রামশরণ পাল তাঁহার প্রিয়শিষ্য ছিল। ইনিই কর্ত্তাভজাদিগের "কর্ত্তা আউলে চাঁদ মহাপ্রভু।" ইত্যাদি এইরূপ কথা প্রচার করিয়া ইঁহারা নিরক্ষর কমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন।

এই ভ্রান্তি দূরীকরণ কর্ত্তব্য জ্ঞানে প্রথমে, আউলে চাঁদ যে শচীনন্দন মহাপ্রভু নহেন এবং তিনি অপ্রকট অবস্থার পর ফকিরের বেশে ঘোলা ডুবলী গ্রামে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করেন নাই এবং পরে প্রকাশ পাইয়া কর্ত্তাভজা মত প্রচার করেন নাই। তাহা আমরা ইতিহাসাদি হইতে দেখাইব।

আউলিয়া চাঁদ যখন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, আর তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামশরণ পালের সময় যখন এই মতের প্রচার আরম্ভ, তখন ইহার ঐতিহাসিক কাল কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের কাল চারিশত বৎসর। সে কারণ কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে মহাপ্রভু একশত বৎসর পুর্ব্বে পুনরায় টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে আসিয়া ঘোলা ডুবলী গ্রামে উপস্থিত হন এবং "আউলিয়া চাঁদ" নামে প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ বৈষ্ণব শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ত্তাভজাদিগের মত প্রচার করেন।

বিশ্বকোষে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে যে, আউলে চাঁদ ১৭১০ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে শক ১৮৩৪। তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে, বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের মতে আউলে চাঁদ, ১২৪ বৎসর হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন।

আউলিয়া চাঁদ সত্যনাথ। এই সত্যনাথ আবার কে বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

সে প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, বর্দ্ধমানের জাল প্রতাপ চাঁদের মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হয়, ইহার কয়েক বৎসর পরে এই আউলিয়া চাঁদের মত প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

জাল প্রতাপ চাঁদ সত্যনাথ নাম ধারণ করেন। সত্যনাথই আউলিয়া চাঁদ কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ক্রমশঃ।

(ভক্তি পঞ্চদশবর্ষ ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ মাস, ১৩২৪।

মালা ও তিলক।

ভুবন-পাবন বৈষ্ণবগণ মালা ও তিলক ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু আজকাল শিক্ষার দোষেই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, মালা তিলকের উপর কেহ কেহ বিশেষ কটাক্ষ করিয়া থাকেন, অবশ্য আমরা একথা স্বীকার করি যে, অনেক ভণ্ড, দুরাচারী ব্যক্তি মালা তিলক ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক গর্হিত কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া মালা তিলকধারী ব্যক্তি মাত্রকেই দোষী বলি কি প্রকারে?

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ সঙ্গদোষে কদাচারী হয় তাহা হইলে কি আমরা ব্রাহ্মণ মাত্রকেই দোষী করিতে পারি? তুমিও মানুষ আমিও মানুষ, আর রাম, শ্যাম, যদুও মানুষ কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কেহ একজন চোর বা বদ্‌মাইস হয় তাহা হইলে কি আমরা সকলেই দোষী হইব? বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া যদি কোনও অপরিনামদর্শী অসংযত-চিত্ত ব্যক্তি কোনও রূপ দুষ্কর্ম্ম করে তাহা বলিয়া মালা তিলকধারী বৈষ্ণব মাত্রকেই আমরা উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারিনা, বা তাহা দেখা উচিতও নয়।

প্রকৃত যাঁহারা বৈষ্ণব, প্রকৃত যাঁহারা ভক্ত, প্রকৃত যাঁহারা সাধক আর ভগবদুপাসনা দ্বারা যাঁহারা জীবন ধন্য করিতে যথার্থই প্রয়াসী তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, মালা তিলকধারী শত সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ২।৪ জন ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজী থাকিলেও ইহাতে ঘৃণার কিছু নাই অধিকন্তু ইহা শ্রীভগবানের সেবকত্বের চিহ্নস্বরূপ বলিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোনও বড় লোকের বাড়ীতে দাসত্ব করিতে হইলে তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহা যেমন ঘৃণার্হ নয় ইহাও তদ্রূপ।

সাধারণতঃ দেখা যায় তুমি আমি হয়তো আদালতে প্রবেশ করিয়া হাকিমের নিকট গমন করিতে ইতঃস্তত করিব হয়তো পারিবই না কিন্তু একটা চাপরাশ লইয়া হয়তো তোমার আমার অপেক্ষা অতি নীচ জাতি ও অল্প শিক্ষিত একজন

সামান্য ব্যক্তি অনায়াসে হাকিমের নিকট গমনাগমন করিবে। সে যেমন প্রভুর প্রদত্ত চাপরাশের বলে নিঃসঙ্কোচে আপন প্রভুর নিকট যায় বৈষ্ণবগণও মালা তিলককে প্রভুর নিকট যাইবার এবং তাঁহার নিজজন বলিয়া পরিচয় দিবার একটী প্রধান চাপরাশ বলিয়া মনে করেন। তবে দেশ কাল পাত্র ও সম্প্রদায় ভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইতে পারে, এইমাত্র প্রভেদ, কিন্তু কোননা কোন চিহ্ন ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয়।

যাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিলাম তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণে যদি সঙ্কুচিত হই তাহা হইলে যে প্রভুর অপমাননা করা হয় তাহা অনেকে বুঝেন না, তাই বর্ত্তমান সময় কেন জানিনা কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের মালা তিলক দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন। এবং এই মালা তিলক ধারী বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অসভ্য-জনোচিত-ধর্ম্ম বলিয়া ব্যখ্যা করিয়া আপন আপন বিদ্যা-বুদ্ধির প্রখরতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই মালা তিলক ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে আমরা বর্ত্তমানপ্রবন্ধে কেবল মাত্র তাহার ২।৪টী দেখাইয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তিলক ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন ;—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্॥

অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া * যজ্ঞ, দান, তপঃ হোম, বেদাধ্যয়ণ, পিতৃতর্পনাদি যে কোন কার্য্য ধর্ম্মার্থে করা হয়, তৎ সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণে পরম ভক্ত নারদঋষি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, যাহার কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নাই তাহাকে দর্শন করিবে না, কারণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ বিহীন ললাট শ্মশানসম পরিত্যজ্য। যথা ;—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎ তাবং শ্মশানসদৃশং ভবেৎ॥

আবার স্কন্দ পুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রো মৃদা শুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চণ্ডালোহপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্মসনাতনম্॥

* নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কপাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধভাবে যে তিলক তাহাকে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র বলে।

অর্থাৎ যাঁহার কপালে মৃন্ময় শ্বেত উৰ্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্টি গোচর হয় তিনি চণ্ডাল হইলেও পবিত্র এবং সনাতন ব্রহ্মলাভে সমর্থ। আবার বলিয়াছেন ;—

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ।
উৰ্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তিরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতোহরিঃ॥

অর্থাৎ উৰ্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অবস্থান করেন, উৰ্দ্ধপুণ্ড্রে যশের অবস্থান উৰ্দ্ধপুণ্ড্রে মুক্তি এবং উৰ্দ্ধ পুণ্ড্রেই শ্রীহরির বাসস্থান।

এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উৰ্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) কথনই নিন্দনীয় নহে। ইহা নিশ্চয়ই পরম মঙ্গলের কারণ সুতরাং ধর্ম্মার্থী, যশার্থী, মুক্তিকামী এক কথায় মঙ্গল প্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই তিলক ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে স্থানে যে ভাবেই দেহত্যাগ করুননা কেন, আর তিনি যে কোন জাতিই হউন না কেন, তিনি অন্তে বিমান যোগে শ্রীভগবদ্ধামে যাইয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন, ইহা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে স্বয়ং ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন যথা ;—

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোহপি বিমানস্থো মমলোকে মহীয়তে॥

অন্যচ্চ ;—

উৰ্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদুদ্ধারাম্যহম্॥

অর্থাৎ উৰ্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যাহার গৃহে আহার করেন আমি (শ্রীভগবান) তাহার বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। পাঠকগণ, তিলক সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা। যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়, যদি মহাজনগণের বাক্যে, তাঁহাদিগের আচরণে বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তিলক ধারণ যে কথনই উপেক্ষণীয় নহে বরং পরম আদরণীয়—পরম মঙ্গল পরিপূর্ণ, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।* অতঃপর মালা ধারণ সম্বন্ধে ২।১টী প্রমাণ

*কোন সম্প্রদায়ের কি ভাবের তিলক করিতে হইবে তাহা নিজ নিজ গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

দেখাইয়াই আমরা আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গরুড় পুরাণে উল্লেখ আছে ;—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।

নরকান্নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥

অর্থাৎ—যে সকল পাপমতি তার্কিকগণ মালা ধারণ করেনা বা মালা ধারণকারীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে তাহারা নিশ্চয়ই হরি-কোপানলে দগ্ধ হইয়া অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।

অপ্যশৌচোহপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয় ॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি পবিত্র তুলসী-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা গলদেশে ধারণ করেন তিনি আচারভ্রষ্ট অপবিত্র হইলেও আমাকে (শ্রীভগবানকে) লাভ করিয়া ধন্য হন। এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠকগণ! আমাদিগের শাস্ত্র যখন মালা ও তিলক ধারণের অনুমোদন করিতেছেন এবং তাহার অন্যথায় নরক ভোগ প্রভৃতির ভয় পর্য্যন্ত দেখাইতেছেন আর আমরা যখন আমাদিগের নিজ নিজ ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশানুসারেই পরিচালিত হইয়া থাকি তখন মালা তিলক ধারণ কখনই উপেক্ষণীয় নহে। এত প্রমাণ প্রয়োগ সত্ত্বেও যদি আমার ইচ্ছা না হয় তবে আমি না হয় মালা ধারণ নাই করিলাম কিন্তু সাবধান মালা তিলকধারীকে দেখিয়া কখনও যেন ঘৃণা বা বিদ্বেষ ভাব মনে না আসে। আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দু'চারটী যাহা প্রমাণ নিবদ্ধ হইল তাহা হইতেই মালা তিলকধারীর প্রতি ঘৃণা করা বা তাঁহাদের দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পাপের বোঝা বৃদ্ধি করা রোগ সমূলে দূর হইবে। আর এই সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে একেবারে সমাজ হইতে দূর হয় তদ্বিষয়ে সুধীগণ সচেষ্ট হউন ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

রাধা ও গোপীকার আত্মসমর্পণ-তত্ত্ব।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।)

—:•:—

ধর্ম্ম সংস্থাপন ও ভক্ত-কামনা পূরণের জন্য শ্রীভগবানের লীলা-দেহ-ধারণ যেমন আবশ্যক, আবার সেই লীলা-রস-সম্ভোগের জন্য সর্বত্যাগিনী তদ্গতপ্রাণা উপাসিকা বা একনিষ্ঠ ভক্তেরও তদ্রূপ প্রয়োজন। অবতারবাদের উদ্দেশ্যই জীব যাহাতে অধর্ম্মের উপর ঘৃণা, ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সৃষ্টি সার্থক করে, উদ্ধারের সরল সহজ উপায় লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। অবতারবাদের উদ্দেশ্যই ভগবানে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেওয়া, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অভয়ের শরণ লওয়ার উপায় করা, ভক্তগণকে অনির্ব্বচনীয় লীলারস-সম্ভোগ করাইয়া কৃতার্থ করা। জীবকে শিক্ষা দেওয়াই বল, রস সম্ভোগ করানই বল, আর আত্মসমর্পণের আদর্শ দেখানই বল, অবতারবাদেই সহজে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। অবতারবাদ আমাদের সনাতন ধর্ম্মের একদিক্ মাত্র বটে কিন্তু সেইদিকটিরই ঔজ্জ্বল্য সহজে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। অবতারবাদ সকল ধর্ম্মে মানিয়াছে কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহার যথাযোগ্য আদর যেমন হইয়াছে যেরূপ রস-সম্ভোগ উপলব্ধি হইয়া থাকে, অন্যত্র সেরূপ দুর্ল্লভ। ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্য ভুলিয়া গিয়া কি ভাবে তাঁহাতে মিশিতে হয়, তাহার আদর্শ জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীরাধা ও অপরাপর গোপীকাগণের জন্ম। রাধা ও গোপীকারা অবশ্য লীলা-রস-সম্ভোগ করিবার জন্যই ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, তথাপি উহা আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। জীবহিত সিদ্ধ না হইলে তাহার প্রকৃত সার্থকতা কি প্রকারে হইবে।

ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সত্তা মিশাইয়া দেওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু লক্ষ্মীরূপিণী ব্রহ্মশক্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রাণা গোলোকাধিশ্বরী শ্রীরাধার পক্ষেই তাহা সম্ভব, তাই গোপীকুলে ইঁহার আবির্ভাব। সে হৃদয়ে কেবল

কৃষ্ণই ছিল। ধর্ম্ম লজ্জা, ভয় প্রথমাবস্থায় থাকিলেও শেষে আর তাহা ছিল না। লাঞ্ছনা গঞ্জনা তিরস্কার এমন কি প্রহারাশঙ্কা পর্য্যন্ত অঙ্গ ভূষণ করিতে হইয়াছিল ভগবানে প্রেম ও প্রকৃত আত্ম-বিস্মৃতিকারী তন্ময়তা জন্মিয়াছে কি না, আর জন্মিলেও তাহা চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় কি না তাহার পরীক্ষা আবশ্যক। এই পরীক্ষায় টিকিলেই বোঝা যাইবে, প্রেম বাস্তবিকই গাঢ়, ভগবানে দিবার উপযুক্ত, তাঁহাকে আকৃষ্ট করার যোগ্য কি না। বিরহই প্রেমের পরিপুষ্টি করে, প্রগাঢ়তা আনয়ন করে, মালিন্য কাটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া তুলে, তাই শ্রীরাধা বিরহিনী। বিরহে রাধার যে আকুলতা, উহা পরমাত্ম লাভের জন্য জীবেরই আকুলতা। অন্ততঃ ঐরূপ আকুলতা, ঐরূপ তন্ময়তা, ঐরূপ বিরহোন্মাদ, ঐরূপ সর্ব্ববাধা উপেক্ষা জীবের হইলেই যে সেই প্রেম সার্থক, সেই জীব কৃতার্থ।

গোলোকেশ্বরী, ব্রহ্মশক্তিরূপিনী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনী বলিয়া রাধাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী, শ্রীকৃষ্ণে আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন কারিণী হইতে পারেন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপরে হইবে কিরূপে? ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাশ্রিতা, গোলোকাধিষ্ঠাত্রী শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণা। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই, কিন্তু সে আদর্শ জীব লইতেই পারেনা, সে আদর্শ লইবার ভরসা পর্য্যন্ত করিতে পারেনা"—এই আশঙ্কা এই নির্ভরসা প্রত্যেক জীবেরই যদি হয়, তবে পরে জীব ভগবানে প্রেম দিবে কেমনে! আপনাকে ভগবানে মিশাইবে কেমনে? তাই গোপিকারা জন্ম গ্রহণ করিলেন, জগৎস্বামী দেখিল, সাধারণ জীবরূপা গোপনারীগণ পর্য্যন্ত এই প্রেমের অধিকারিণী হইল এই আনন্দাস্বাদে কৃতার্থ হইল। জগৎ বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া দেখিল তাহাদের এই বিস্ময়কর এক অপূর্ব্ব ভগবানে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ! গোপনারীরা যাহা পারিল, স্বামী প্রভৃতির শাসনে যাহা পারিল, কুলনিন্দা প্রভৃতি প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া যাহা পারিল, তাহা সকলেই পারিবেন না কেন?

শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করা বড় সহজ কথা নহে। রাধা ও গোপীকারা ঐ অর্পণ করিয়াছিল। নদীর বেগ বাধা পাইলেই তার গুরুত্ব বোঝা যায়। সাধুতার পরীক্ষা বিপদের মুখেই যথার্থ হইয়া থাকে। গোপীকাদের অহৈতুকী প্রেমও সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। মিলন

অপেক্ষা বিরহই ভগবৎ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ ভক্তি জন্মাইয়া দেয়, প্রেমের পরিপুষ্টি করিয়া ক্রমে তাহাকে প্রবল গাঢ় উদ্দাম পরিশেষে অহৈতুকী প্রেমে পরিণত করে। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ" বিরহে তন্ময়াবস্থায় প্রিয়জন সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে, অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় এক অনন্ত সুখের প্রবাহ ছুটে। মিলনে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব, অনেকটা বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রকৃত বিরহে ঐ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাহ্য জগতের বাহ্যভাব লোপ ব্যতীত প্রকৃত তন্ময়তা হয় না। বিরহে অন্তর্জ্জগতের এক অপূর্ব্ব চিত্রই মানসপটে ফুটিয়া উঠে।

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও ইহা ভগবানের উক্তি। সর্ব্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ স্ত্রীলোকের পক্ষেও উপদিষ্ট। অন্যধর্ম্ম অপেক্ষা স্ত্রী-সহজ-ধর্ম্ম লজ্জার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, তাই বিশেষরূপে লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রীত্বজ্ঞান, সহজ লজ্জা বোধ থাকিলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয় না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া একাত্ম মিলনের অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করা যায় না, প্রকৃত অহেতুকী প্রেমের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করার সৌভাগ্য জন্মে না। রূপ, যৌবন, স্ত্রীত্বজ্ঞান, লজ্জা সমস্তই যদি থাকিল, তবে ভগবানে সর্ব্বত্যাগ কৈ হইল?

জীবন্মুক্ত * ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যা নাশ করিলেও দেহপাত পর্য্যন্ত ঐ অবিদ্যার সংস্কার বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ সংস্কাররূপে অবিদ্যাই বর্ত্তমান থাকে। অবিদ্যা কার্য্য দেহ থাকিলে চলে না। কেন না দেহ ধারণই তাহা হইলে আর সম্ভব হয় না। সংস্কাররূপ অবিদ্যার বিদ্যমানতায় কোন ক্ষতি নাই। এতদ্দৃষ্টান্তে গোপীকাদের লজ্জা ত্যাগের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে বা সংস্কাররূপে যদি লজ্জা ছিল মানিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কাররূপে লজ্জা থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের কোন ক্রটি হয় না, স্ত্রীলোক এই জ্ঞান ত যাইবে না! দেহপাত পর্য্যন্ত স্ত্রীত্বজ্ঞান লোপ পাইবার ত সম্ভাবনা নাই, তবেই স্ত্রী সহজ ধর্ম্ম লজ্জা সম্পূর্ণ সংস্কাররূপেও যে লোপ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেহ থাকিলেই দেহ ধর্ম্ম কোন না কোন আকারে থাকিয়াই যায়। স্ত্রীত্ব

---

* এই স্থান হইতে যাহা বলিলাম তাহা সিদ্ধান্তরূপে বা পূর্ব্বপক্ষ্যরূপে পাঠকবর্গ গ্রহণ করিতে পারেন (লেখক)?

জ্ঞানের সঙ্গে কোন না কোন রূপে লজ্জা না থাকিয়া পারে নাই। আর প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসলীলা সম্ভোগ কালে গোপীকাদের স্ত্রীত্বজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা স্ত্রীলোক যুবতী কুলবধূ ইত্যাকার বোধ সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইয়াছিল, সমাধি অবস্থার মত ভেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, বলিয়া যদি মানাও যায় তবেই রস-সম্ভোগ বিচ্ছেদ অবস্থায় ঐ স্ত্রীত্বজ্ঞান যে সমাধি ভঙ্গের পর ভেদ বুদ্ধির মত আবার ফিরিয়া আসিবে, ইহাও মানিতেই হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ স্ত্রীত্বজ্ঞান সূক্ষ্ম আকারে বা সংস্কার রূপে এ রস সম্ভোগ কালেও বিদ্যমান ছিল। গোপীকাদের সে বিষয়ে কোন বোধ ছিল না বটে কিন্তু অজ্ঞাতভাবে তাহা যে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ যদি ঐ সময়ে সংস্কাররূপে না থাকিবে, তবে তাহারা আসিল কোথা হইতে? লজ্জা ব্যভিচারী ভাব কখন জন্মে কখন নাশ পায়, ইহা সত্য কিন্তু স্ত্রীত্ব জ্ঞানত সেরূপ নহে। রসসম্ভোগ কালে স্ত্রীত্বজ্ঞান অবশ্যই সূক্ষ্মাকারে সংস্কাররূপে বিদ্যমানই থাকিবে তবে সহজ লজ্জা ও সূক্ষ্মাকারে বা সংস্কার রূপেই বা থাকিবে না কেন? সমাধি অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না কিন্তু ঐ সময়েও সূক্ষ্মাকারে সংস্কাররূপে ভেদ বুদ্ধি কিঞ্চিৎ থাকে, নচেৎ ভঙ্গের উপর পুনরায় আসে কোথা হইতে? ভেদ বুদ্ধির কারণ অবিদ্যা দেহপাত পর্য্যন্ত সংস্কাররূপে থাকে বলিয়াই ভেদ বুদ্ধিও সংস্কাররূপে না থাকিয়া যায় না। অনুভূত অজ্ঞাত অদৃষ্ট থাকিলেই যে তাহা থাকে না এমত নহে।

শ্রীরাধা ও গোপিকাদের ঐ স্ত্রীত্বজ্ঞান এবং ঐ সহজ স্ত্রী ধর্ম্ম লজ্জা, সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল কিনা? সংস্কাররূপে বিদ্যমান ছিল কিনা? রসসম্ভোগকালে সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে তাহার পুনরুৎপত্তি সম্ভব কি প্রকারে? জীবন্মুক্তের সংস্কার রূপে অবিদ্যার স্থিতির মত এই সংস্কাররূপে স্ত্রীত্বজ্ঞান ও তৎ সহজ ধর্ম্ম লজ্জার অবস্থিতি সকল বৈষ্ণব মতের অনুকূল, কিম্বা প্রতিকূল এইরূপ কতকগুলি সন্দেহ আমার মনোমধ্যে অনেকদিন হইতে জাগরূক আছে। বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখার একজন প্রবন্ধ পাঠকের প্রবন্ধ সমালোচনা উপলক্ষে সন্দেহগুলি আমি উত্থাপন করিয়াছিলাম। ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতম সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও টাকীর বদান্য জমীদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় এই সন্দেহ গুলির সমাধানের যত্ন

করেন। তদুপলক্ষে কতকটা বাদ প্রতিবাদও হয়। পূর্ণেন্দু বাবু ও যতীন্দ্র বাবু উভয়ে একমত হইলেন না। এক্ষণে আমি প্রবন্ধেও সন্দেহ গুলি প্রকাশ করিলাম। বৈষ্ণবমতে সম্যকাভিজ্ঞ কোন মহাজন যদি যুক্তি সাহায্যে তাঁহাদের খাঁটী বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে বড়ই সুখী হই, আর দেশের লোকও পড়িয়া জানিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন। আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল যাহা হউক না কেন, আমি তাহাই যুক্তি যুক্ত হইলে লইতে প্রস্তুত আছি। আমার সিদ্ধান্ত আমি পূর্ব্বপক্ষ মাত্র বলিয়া বুঝিয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। ভাবের দিক দিয়া এবং বৈষ্ণব দার্শনিক গণের যুক্তির দিক দিয়া ইহার আলোচনা হউক, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা, বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই কৃতার্থ হইব। আশা করি ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ও আমার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সাধ্যমত কিছু যত্ন লইবেন।*

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম।

(লেখক।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোসাঞি।)

(অবশিষ্টাংশ।)

—:•:—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট কাল ও আউলে চাঁদের প্রকাশ কাল প্রায় তিনশত বৎসর ব্যবধান। সে কারণ কোন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবই বা বলি কেন, কোন সুধীব্যক্তিই আউলে চাঁদ যে শচীনন্দন মহাপ্রভু একথা কর্ণে শুনিতেও পারেন না। আমরাও বলি যে সকল কমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি এইরূপ রচিত মিথ্যা কথায় কর্ণপাত করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব অপরাধী হয়েন। তাঁহারা এরূপ কথায় ভুল ক্রমেও যেন কখন আস্থা স্থাপন না করেন।

---

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক বলিয়াই আমার মনে হয়। বৈষ্ণব সমাজের পণ্ডিত মণ্ডলী এ বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন লয়েন ইহাই বাঞ্ছনীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমত জানিতে পারিলে আমাদের বক্তব্য শেষে প্রকাশ করিব। (ভঃ সঃ)

আউলে চাঁদ মহাপুরুষ হইতে পারেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত উত্তম মত হইতে পারে, তাই বলিয়া আউলে চাঁদকে আমরা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রকাশ বলিতে পারিনা এবং তাঁহার মতের সহিত যে কোন অংশে ও বৈষ্ণব মতের মিল আছে তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারিনা। একারণ পুনঃ পুনঃ আমাদিগের অনুরোধ কেহ যেন "কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে না করেন বা কাহারও কথা শুনিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্ব কথিত জাল প্রতাপ চাঁদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা সঙ্গত বোধে ৺সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যেয়ের লিখিত "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের গোচরার্থে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন।

"প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কোন একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রতাপ চাঁদের মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে বর্দ্ধমানে আসিয়া নিজে প্রতাপ চাঁদ বলিয়া প্রকাশ করেন। সে সময় রাজজামাতা পরাণবাবু অছিরূপে বর্দ্ধমানের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর এই ধৃষ্টতা দেখিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে তাহাকে বর্দ্ধমান হইতে বাংস্কৃত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীর পক্ষে অনেক ধনী ও অন্যান্য স্থানের রাজা জমিদার গণ সহায় হওয়ায় পরাণবাবুর সহিত রীতিমত মোকর্দ্দমা চলিতে থাকে। সন্ন্যাসী নিজকে রাজা প্রতাপ চাঁদ বলিয়া প্রমাণ করার পক্ষে এই কথা প্রকাশ করে যে কোন দুষ্ক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস প্রয়োজন হয়। তিনি কোন সন্ন্যাসীর নিকট পীড়িতের ভান ও মৃতপ্রায় হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইলে বর্দ্ধমান রাজ বাটীর প্রথামতে তাঁহাকে কালনায় গঙ্গা করা হয় এবং গঙ্গায় অন্তর্জ্জলি করিবার সময় তিনি শববাহকদিগের হস্ত হইতে অপসৃত হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া যান্। এই সময়ে তাঁহারই নিদেশমত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কতিপয় বন্ধু গঙ্গা বক্ষে নৌকা লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে লইয়া তাহারা প্রস্থান করেন। সে অবধি তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দ্বাদশ বৎসর কাল নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে

প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে বর্দ্ধমান রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ইত্যাদি।

এ সকল কথা প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হয় নাই। সন্ন্যাসী মোকর্দ্দমা করিয়া হারিয়া যান; তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের জজ বাহাদুরগণ এই আদেশ প্রদান করেন যে সন্ন্যাসী প্রতাপ চাঁদ নহেন, তিনি প্রতাপ চাঁদ নাম ধারণ করিতে পারিবেন না এবং বর্দ্ধমান ডিভিসনের মধ্যে কোথায়ও থাকিতে পাইবেন না।—

এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইলে সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানের মহারাজ মৃত প্রতাপ চাঁদ নহেন, তিনি জাল, এই কথা বর্দ্ধমান প্রদেশে ঘোষিত হইলে, তিনি গঙ্গা নদী পার হইয়া নদীয়া জেলার কাঁচড়া পাড়ায় সন্নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লহেন। এবং নিজকে 'সত্য নাথ' বলিয়া প্রচারিত করেন।

এই সত্যনাথ পাগলপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রিয়া ও আচরণাদি দেখিলে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ফকির তাহা সকলে বুঝিতে পারিত না। ইহাঁকে লোকে আউলে চাঁদ বলিয়া ডাকিত। আউলে শব্দের অর্থ পারসিক ভাষায় বুজুরুক অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি।"

এই ফকিরের অলৌকিকী শক্তির কথা কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। অন্ধের নয়ন, অপুত্রকে পুত্র, দরিদ্রের ধন মৃতের জীবন দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বীদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়াছিলেন। জাল প্রতাপ চাঁদ বলিয়া যিনি ইংরেজ সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন তাহার যে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি ছিল মোকর্দ্দমা কালে তিনি নিজে সে সকল কথার উল্লেখে করিয়াছিলেন; মোকর্দ্দমার সময় বড় বড় লোকে তাঁহার সাহায্য করায় মোকর্দ্দমা অন্তে তাঁহার হাতে কিছু অর্থও ছিল। ইনি দেখিতে অতি সুন্দর রূপবান পুরুষছিলেন। লোক রঞ্জন করিবার বিশেষ শক্তি ছিল। 'সত্যনাথ' নাম ধারণ করিয়া ধর্ম্মমত প্রচার করেন। ইহাঁর মতে কোন শাস্ত্র গ্রন্থের আদেশানুযায়ী বলিবার প্রয়োজন নাই। দেব দেবীর পূজার বা আরাধনার আবশ্যক নাই। জগতে কেবল ঈশ্বরই সর্ব্বময় কর্ত্তা সেই কর্ত্তারই ভজনা কর। কায়কর্ম্ম, মনকর্ম্ম ও বাক্‌কর্ম্ম

রূপ কুকাজ করিও না। সদা সত্য বলো। সত্যই সার ধর্ম্ম। ইহাঁর সম্বন্ধে কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে যে গীত প্রচলিত আছে তাঁহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন,
বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢলাঢল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥"

'সত্য' শব্দ কর্ত্তাভজা দিগের 'মন্ত্র'। ইহাঁদের অনেক গানে সত্য শব্দ সংযোজিত। এমন কি ইহাঁদিগের পুত্র কন্যাগণের নামে সত্য শব্দ যুক্ত হইয়া থাকে। যথাঃ—সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যকিঙ্কর, সত্যবালা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

পুর্ব্বে যে আউলে চাঁদের ২২ জন শিষ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রধান অনুচর ছিলেন। ইহাদের নাম ১ নয়ন, ২ লক্ষ্মীকান্ত, ৩ হটু-ঘোষ, ৪ বেচুঘোষ, ৫ রামশরণ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরি ঘোষ ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্দ লাল গোসাঁই, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণুদাস, ১৬ কিনু, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কাঁসারি, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচুরুইদাস, ২১ নিধি-রাম ঘোষ, ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশজন শিষ্যের নাম কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন অন্য কাহারও বংশের নাম ধাম ও পরিচয় শুনিতে পাওয়া যায় না।

আউলে চাঁদের ২২জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে একটী বচন প্রচলিত আছে।

"আউলে চাঁদ দোয়া গরু,
সঙ্গে বাইশ ফকির, বাছুর তার।"

রামশরণ পাল আউলিয়া চাঁদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ইনি জাতিতে সদ্গোপ ইহার পিতার নাম নন্দ ঘোষ কখন ঘোষ তনয় পাল উপাধি প্রাপ্ত হয়েন তদ্বিষয়ে কিছু প্রকাশ নাই চাকদহের নিকট জগদীশ পুরগ্রামে ইহার বাস ছিল জগপুরের শিশু ঘোষের কন্যার সহিত প্রথম রাম শরণের বিবাহ হয়। এই

স্ত্রীর গর্ভে রাম শরণের দুই কন্যা হয়। কিছুদিন পরে স্ত্রী ও দুই কন্থার মৃত্যু হইলে রামশরণ কিছু উদাসীন ভাবাপন্ন হয় পরে পুনরায় গোবিন্দঘোষের কন্থা সরস্বতীকে বিবাহ করেন। এই স্বরস্বতীর সহিত প্রাণের বড়ই মিল হয় উভয়ে অনেক সময় ভগবদালোচনায় কাটাইতেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই রামশরণ বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় মুরতিপুর গ্রামে আসিয়া নিজ কুটুম্ব দিগের বাটীতে বাসা করেন। এই মুরতিপুর গ্রামই ঘোষ পাড়া নাম পরে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এক্ষণে জমীদার রায়রাঞান দেওয়ান পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের বাটীতে অতিথি সেবার এক চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে প্রভুর সন্তোষ ও বিশ্বাস জনক কার্য্য করায় "বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং জমিদার বাহাদুর উখড়া পরগণার একটি মহালে রামশরণকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এই স্থানে কিছুকাল নায়েবী করার পর একদিন কাছারী বাটীতে ইঁহার সহিত ঐ আউলিয়া চাঁদ ফকীরের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়। রামশরণ পূর্ব্ব হইতে অতিথি ভক্ত, সাত্বিক ও পরমার্থ প্রিয় ছিলেন। ফকীরকে পাইয়া তিনি অতি ভক্তির সহিত তাহার সহিত আলাপ করেন এবং তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করান। ফকীর স্নান করিতে গেলে রামশরণের পূর্ব্ব সঞ্চিত শূল বেদনা উত্থিত হইয়া যন্ত্রণায় মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই ফকীর স্নানান্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের এই দুর্দ্দশা দেখিতে পান। পরিচারক গণের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সন্ন্যাসী নিজ কমণ্ডলু হইতে যৎকিঞ্চিৎ জল লইয়া নায়েবের মুখে ও চক্ষে দিবামাত্র রাম শরণ চৈতন্য প্রাপ্ত ও যন্ত্রণা মুক্ত হইয়া উঠিলেন। কিরূপে তিনি এইরূপ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন পরে অবগত হইয়া ঐ সাধুর প্রতি তাঁহার ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল, তিনি সাধুকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু এদিকে ফকীর স্নানান্তে কাছারী বাটীর নির্দ্দিষ্ট ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত দিবা অবসান হইল রাত্রি হইতে চলিল তথাপি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। রামশরণ স্নানাহার ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া ফকীরের ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। রাত্র দ্বিপ্রহর অতীত হইলে নায়েব ব্যতীত বাসার সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে ফকীর গৃহের

দ্বার মুক্ত করিয়া বহির্গত হইলেন এবং কমণ্ডলু হস্তে লইয়া কাছারী বাটী ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রামশরণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। সাধু পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রামশরণ সাধুর চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া "ঠাকুর আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গী করুন আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিব" ইত্যাদি কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর কহিলেন "আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছে কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই, এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই। তুমি আমার অনুগমন করিওনা। যথা সময়ে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এক্ষণে আমি যে উপদেশ দিই তাহাই পালন কর এবং যজন যাজন পূর্ব্বক আপনার ও অন্যের মঙ্গল বর্দ্ধন কর।' এই বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন।

শুনা যায় তদবধি রামশরণ বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া মুরতিপুর গ্রামের সদ্গোপ পল্লীতে আসিয়া বাস করিলেন এবং উক্ত সাধুর আদেশানুযায়ী স্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন তাহার স্ত্রী এই মত প্রচারের বিশেষ সহায় ছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

ইহার গর্ভে "রাম দুলাল" নামে পুত্র 'অন্নদা' ও 'ভবানী' নামে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। সরস্বতী অনেক দিন জীবিত ছিলেন। রামশরণের গদির মালিক হইয়া ইনি 'কর্ত্তা মা' 'সতীমা' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহার অনেক প্রভাবের কথা শুনা যায়। যদিও ইনি স্ত্রীলোক ইহাঁরই সময় এই সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। আউলিয়া চাঁদ ফকীর ইহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে রামশরণ মুরতিপুরে বাস করিলে একদিন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার বাটীর পশ্চাদভাগে দাড়িম তলায় বসিয়াছিলেন। স্বরস্বতী কলসী করিয়া জল আনিতেছিলেন, ফকির তৃষ্ণার্ত্ত জানাইয়া জল প্রার্থনা করিলে, স্বরস্বতী তাঁহাকে জলপান করিতে দেন। ফকির জলকুলি করিয়া স্বরস্বতীর কলসীতে প্রদান করিলে স্বরস্বতী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন এবং কাতরভাবে হায় বাবা কি করিলে, হায় বাবা কি করিলে বলিয়া কলসীটী ফেলিয়া দেন। সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া হাসিতে থাকেন। এমন সময় রামশরণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিজ গুরুকে নিজ বাটীতে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হয়েন। স্বরস্বতী জানিত না যে এই মহাপুরুষই

তাঁহার স্বামীর গুরু, এক্ষণে অবগত হইয়া বাবা রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া ফকীরের পদ প্রান্তে কাঁদিয়া পড়েন। 'মা সতী' উঠ বলিয়া সম্বোধন করিলে স্বরস্বতী সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে অতি কাতরভাবে বসিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী 'মা সতী' তোমার কোন চিন্তা নাই এক্ষণে মন্ত্র গ্রহণ কর বলিয়া 'গুরু সত্য' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সরস্বতী সেকাল হইতে 'সতী মা' নামে বিখ্যাতা হয়েন। রামশরণ ঐ পরিত্যক্ত কলসীর জল পান করেন এবং তাঁহার স্ত্রীকেও পান করান। পরে কলসীস্থিত জল অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করেন। যাহা ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তাহা লোকে পাছে দলিত করে এই আশঙ্কায় কর্দ্দম সহিত তুলিয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া আসেন। এই পুষ্করিণীর জল, এক্ষণে লোকে ব্যাধি মুক্তি নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সন্ন্যাসী ঠাকুর দাড়িম তলায় কিছুদিন বাস করিয়া চলিয়া যান। তিনি মধ্যে মধ্যে মুরতিপুর গ্রামে রামশরণ পালের বাটীতে আসিতেন। দাড়িম তলায় বাস করিতেন। আউলে চাঁদ ফকির দেহ রক্ষা করিবার পূর্ব্বে সতীমাকে কন্থা, কমণ্ডলু আশাবাড়ি প্রভৃতি প্রদান করিয়া যান এবং প্রত্যহ দাড়িম তলায় অর্চ্চনা করিবার আদেশ করিয়া যান। এই হইতে ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া যায়। রামশরণ পুত্র রাম দুলালকে তৎকালিক শিক্ষা প্রদান করেন। রাম দুলাল অতি বুদ্ধিমান বালক ছিল এবং রীতিমত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গীত রচনায় শক্তি ছিল এবং অনেক রচনা করেন। ইনি সকল প্রকার লোকের বোধ সুলভ, সামান্য সামান্য ভাষায় ন্যূনাধিক আট শত গীত রচনা করিয়া যান। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে এই সমস্ত গীতের নাম 'ভাবের গীত।' এই সকল গীতের কোন কোনটী প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কোন কোনটী মুসলমান সম্প্রদায় সিদ্ধ কোন কোনটী তাহার নিজ অভিপ্রেত। সহজ ভাষায় গীত রচিত হইলেও অনেক গীতের ভাব বোধগম্য নহে। ইহাদিগের অর্থ এমন কি অনেক কর্ত্তাভজাও বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না।

রামশরণ বৃদ্ধাবস্থায় হরি সংকীর্ত্তনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে সংগ্রহ করেন এবং একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া সেই গৃহে নাম কীর্ত্তন করিতেন, ঐ গৃহ এক্ষণে ঠাকুর ঘর নামে পরিচিত। আউলে চাঁদ মুসলমান ফকীর নহেন, তিনি স্বয়ং মহাপ্রভু শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব রামশরণই এই বলিয়া প্রকাশ

করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বুঝাইয়াছেন যে, মহাপ্রভু অন্তলীলার শেষ ভাগে গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হইয়া অলক্ষে সন্ন্যাসীর বেশে ঘোনাচুবলীগ্রামে আসিয়াছিলেন এই বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

রামশরণের মৃত্যুর পর সতীমা ঘোষপাড়ায় গদির মালিক হয়েন। রাম দুলালের সাহায্যে মাতা পুত্রে কর্ত্তাভজা মতের বহুল প্রচার করেন। ইহাদিগের সময় এই সম্প্রদায়ের বহুল শ্রীবৃদ্ধি হয়। অশিক্ষিত ভ্রান্ত বৈষ্ণবগণ আউলিয়া চাঁদকে মহাপ্রভু বিশ্বাসে এবং রামশরণের শ্রাদ্ধে ও বৈষ্ণব রীত্যানুসারে মহোৎসবের প্রচলনে দলে দলে ঘোষপাড়ায় গিয়া থাকে এবং তথায় গিয়া কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি করিয়া থাকে।

রামশরণ পালের সময় কর্ত্তাভজাদিগের প্রভাব কাঁচড়াপাড়ার চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম সকলে প্রচারিত হয়। আউলে চাঁদ অর্থাৎ সত্যনাথ এই নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইলেও রামশরণই এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রচার কর্ত্তা।

এক্ষণে আউলিয়া চাদের প্রকৃত বিবরণ আপনারা পাঠ করিলেন। দেখিলেন যে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু নহেন এবং ইহা চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য যেন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কোন লোক কোন ক্রমে এ সকল দলে না মিশেন। বৈষ্ণবগণ মধ্যে এই অবৈষ্ণব ধর্ম্মমত প্রচারে কোন রূপে প্রশ্রয় না দেওয়া বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আউলে চাঁদের ২২জন শিষ্য মধ্যে, আনন্দ লাল গোসাঁই নামে একজন শিষ্য ছিল, যদিও ইহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, তথাপি জানা গেছে ইনি একজন গঙ্গা বংশীয় গোস্বামী সন্তান। বলাগড় বাসী গোস্বামী প্রভুরা একজন আচার্য্য সন্তানকে এইরূপে অবৈষ্ণব মত গ্রহণ করিতে দেখিয়া এবং রামশরণ পালের সময় ঘোষপাড়ার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতে দেখিয়া বলাগড়ের ৺ জগদানন্দ গোস্বামীর পিতামহ এই অবৈষ্ণব মত প্রচারে বাধা দিবার জন্য ঘোষপাড়ার সন্নিকট কোন বৈষ্ণব পাঠ উদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। পরে ৺ জগদানন্দ গোস্বামীর পিতা দেবানন্দেরপাঠ উদ্ধার করেন। এই পাঠ অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ নামে খ্যাত। ইহার বিবরণ আমাদিগের পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল এক্ষণে আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম। ইতি।

তত্ত্ব কথামৃত।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে, দাস।)

——:•:——

প্রশ্ন। "শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা কোন শাস্ত্রে নাই"—এ কিরূপ কথা?

উত্তর। সাধু সঙ্গ ব্যতীত ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা হইতে পারে না। নিত্য লীলা অদ্যাপি বর্ত্তমান। সাধু সঙ্গ করিলে, এ সেবার কথা বুঝিতে পারা যায়; অন্যথায় লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করে।

প্রশ্ন। পাপ ও পুণ্য উভয়ই ত্যাগ না করিলে মহাপ্রভুর সেবায় অধিকার হয় না; আপনি কিন্তু বলিতেছেন—"পুণ্যবানের সেবাধিকার নাই; তবে কি পাপীরই সেবাধিকার আছে? পুণ্যবান হওয়া অপেক্ষা কি পাপী হওয়া ভাল?

উত্তর। হাঁ, পাপীর—মহাপাপীরই সেবা করিবার অধিকার; যে সকল পাপীকে, ব্রাহ্মণগণ, কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উদ্ধার করিতে পারেন নাই, মহাপ্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কলিযুগের পুণ্যবাণ অপেক্ষা পাপী, কোটী গুণে ভাল; কলিযুগে, পুণ্যবান হওয়া, মহাপ্রভুর আদেশ নহে। তা' বলিয়া আমি পাপ কার্য্যের অনুমোদন করিতেছি না। জন্মে জন্মে পাপ করিয়াছি, ইহা স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রভুর শরণ গ্রহণ করিতে হইবে; তাহা হইলেই পতিত পাবন গৌর হরি কোল দিবেন।

প্রশ্ন। হরিনাম যাঁর মুখেই শুনি, তিনিই আমার পরম বন্ধু এ ভাব্ কি সর্ব্বোত্তম নহে? পাত্র ভাল কি মন্দ, বিচার করিবার প্রয়োজন কি?

উত্তর। সদসৎ বিচার জন্য ভগবান্, জীবের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিচার দ্বারা জীবকে সৎপথ দেখাইয়া দেওয়া, বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য নতুবা মূর্খে ও পণ্ডিতে ভেদ থাকে না; অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া পূজা অপেক্ষা মহাপাপ আর কিছুই হইতে পারে না।

প্রশ্ন। পুণ্যবান লোক কি ক্রমে প্রভুর সেবার অধিকার পাইতে পারে না? সকাম উপাসনা কি শেষে নিষ্কাম উপাসনায় পরিণত হয় না?

উত্তর। পুণ্যবান সগুণ; কাম কৈতব, প্রেম অকৈতব; "কাম প্রেম দোঁহার বিভিন্ন লক্ষণ।" লোহ আর হেম; প্রেমের গতি কুটীল; সাধু সঙ্গ ব্যতীত নিষ্কাম উপাসনা হয় না।

প্রশ্ন। বিধি হইতে অনুরাগের উদ্ভব ঘটে, তাহা না হইলে অনুরাগ জন্মে না, এ বিষয়ে আপনার মত কি।

উত্তর। সাধুসঙ্গ বিনা অনুরাগ জন্মে না; কেহ কেহ জন্মান্তরীয় কর্ম্ম ফলে জাত অনুরাগ হইতে পারেন; যথা—প্রহ্লাদ, মাতৃ গর্ভেই হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন। এ সংসারে পাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? সংসার কি সুখের ধাম নহে? যদি না হয়, তাহা হইলে, মানুষ কিরূপে সুখের ধামে যাইতে পারে?

উত্তর। পাপের দণ্ড দ্বারা জীবের শিক্ষা হয়; এ সংসার, সুখের ধাম নহে; সতত ত্রিতাপ যাতনা নরক ভোগের ধাম; শূকর যেরূপ বিষ্ঠা ভোগেই পরিতৃপ্ত হয়, মানুষ যদি সেইরূপ জিহ্বা উপস্থ সুখেই পরিতৃপ্তি লাভ করে তাহা হইলে সে আর কখন ত উর্দ্ধ ধাম বা সুখের ধামে যাইতে পারে না; ভগবানের প্রধান তিনটী শক্তি—"বিষ্ণু শক্তি পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রাজ্ঞাখ্যা তথাপরাঃ। অবিদ্যা কার্য্য সংজ্ঞানা তৃতিয়া শক্তিরিষ্যতে, (সাধুসঙ্গ না হইলে অবিদ্যা শক্তি) কোন কালে স্বরূপ জানিতে পারে না।

প্রশ্ন। মহাপ্রভু নিত্য, নির্গুণ পতিত পাবন; কিন্তু পরমেশ্বর বলিলে ভুল হয় না কি? ইহাতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্ব কথার সহিত মিল থাকিতেছে না। বুঝাইয়া দিবেন কি?

উত্তর। উহা বাক্য মনের অগোচর, কেবল ভাবের গতি। মায়াতীত না হইলে কেহ কোন রূপে বুঝিতে পারিবেন না। তিনিই অনাদি, আদি কারণ। তাঁহার অনন্ত গুণ অনন্ত ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য একাধারে পূর্ণরূপে তাহার ভিতরে বাহিরে। তাঁহাকে পরমেশ্বর না বলিলে ঘোর অপরাধ হয়।

শ্রীল বজু সাধু।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য।)

—:•:—

বহুদিন পর "ভক্তি"তে একটী ভক্তের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিখিতে বসিলাম, ভরসা করি "ভক্তি"র কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ এই অকিঞ্চন জনের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

মানব রাজ্যে কোন্ ব্যক্তি যে কৃষ্ণ-কৃপা লাভের অধিকারী, আর কোন্ ব্যক্তি যে অনধিকারী, কার্য্য দ্বারা তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। কারণ, চঞ্চল চিত্ত মানবের মতি গতি সর্ব্বদা একরূপ থাকেনা। প্রায়শঃই মানব চরিত্রের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, যে ব্যক্তি সারা জীবন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া,—সাধু সজ্জনের মত বিধ্যুক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী থাকিয়া, বাহ্য আচারাচরণের দ্বারা মানব সমাজে নিষ্ঠাবান সাধু বলিয়া পরিচিত হইল, হঠাৎ তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই সাধুই এক মহা অসাধু হইয়া দাঁড়াইল! পুণ্যের প্রদীপ্ত পথ ছাড়িয়া, পাপ পঙ্কিল অন্ধকারময় নরকের পথে প্রধাবিত হইল!! পাশব প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পশুর ব্যবহার করিতে লাগিল!!

আর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্ম দ্বারা পাপানুষ্ঠান করিয়া নরকের পথে ছুটিয়াছিল, লোক সমাজে পশু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, দৈবাৎ তাঁহার জীবনের গতি বিপর্য্যয় ঘটিয়া, তিনি এক পরম সাধু বনিয়া বসিলেন। সাধক সম্প্রদায়ের সম্মুখে আদর্শ মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিতে দেখিতে মানুষ দেবতা হইয়া পড়িলেন। স্বর্গের সোপানে পদ-বিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণ কৃপার বিজয় ভেরী বাজাইয়া সারাটা মানব রাজ্যকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

উপর্য্যুক্ত উভয় ব্যক্তির পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্য দ্বারা, সাধু কি অসাধু যাহা নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, তাহা যে ভুল, পশ্চাদনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিল। মানব রাজ্যে এই প্রকার বিবেচনার ভুল অনেক স্থলে ধরা পড়িয়াছে। জীব-জীবনের এই প্রকার গতি বিপর্য্যয় বৃত্তান্ত বা দৃষ্টান্ত আমাদের

প্রাচীন ইতিহাসে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ সূত্রে কাহার প্রতি, কোন্ সময় কৃষ্ণ কৃপার অমৃত প্রবাহ ছুটিয়া আসিবে, তাহা কে জানে? আমাদের আলোচ্য বজু সাধুর জীবন চরিত ঠিক্ বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকারের।

"বজু সাধু" ময়মনসিংহ জেলার সিংহের বাঙ্গালা গ্রামে, জগন্নাথ মাঝির ঔরসে ও গোলক মণী দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বজু শিশুকাল হইতেই একটুকু চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। লেখা পড়া মোটেই জানিতেন না। গীত বাদ্যে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। সারা দিন-রাত কেবল গান গাইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন।

বাল্য কৈশোর এইরূপে কাটিয়া গেলে, যৌবনে বজু দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পর পীড়ন, মদ্য পান তাঁহার নিত্য কর্ম্মে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইল। বজু বলিষ্ঠ বলিয়া, তাঁহার স্ব শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে একজন মস্ত বলিকর * ঠাওরাইয়া লইল বজু অতি তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ঠ খড়্গ কাঁধে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে মহিষ পাঁঠা কাটিয়া লোকের নিকট হইতে বাহবা, ও ধন্যবাদ আদায় করিতে লাগিলেন। পশুর প্রাণ নাশে তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। আসন্ন মৃত্যুর কবলে পতিত দুর্ব্বল জীবের কাতর ক্রন্দনে বজুর বিন্দু মাত্রও ক্লেশ জন্মিত না। বরং রক্ত দর্শনে তাঁহার প্রাণে অত্যধিক প্রফুল্লতা আসিত।

এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, হঠাৎ একদিন বজুর সুদিন আসিয়া উপস্থিত। একজন সংসার বিরক্ত সাধুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বজু সাধুকে প্রণাম করিলেন, সাধু "কৃষ্ণপদে ভক্তি হউক" বলিয়া বজু মাঝির মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সাধু, বজুকে লইয়া এক নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া জীবের মৃত্যু সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আর যতদূর পারেন, বজুকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বজুর সঙ্গে সাধুর বিবেকোদ্দীপক অনেক কথার প্রসিদ্ধ হইল। প্রসঙ্গাধীন কৃষ্ণ ভজনই যে জীব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, দয়াই যে পরম ধর্ম্ম, আর নির্দ্দয় লোক যে পশুর সমান,

* যাহারা পাঁঠা ও মহিষাদি বলিদান করে, (লেখক)।

তাহাও সবিশেষ আলোচিত হইল। অহিংসা, পরোপকার যে মানব জাতির পরম ধর্ম্ম, সাধু, বজুকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকেই যে একদিন মরিতে হইবে, সংসারের ধন জন ফেলিয়া নিশ্চয়ই চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে,—এই আধি ব্যাধি পূর্ণ জড় জগত কেবল দুঃখেরই লীলাস্থলী, বজুর সঙ্গে সাধুর এই সকল পরমার্থ তত্ত্ব কথা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হইতে লাগিল।

বজুর দিন ফিরিয়াছে। সাধু-সঙ্গের প্রভাবে বজু আর সে বজু নাই। তিনি আর একজন হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার আত্মার দেব ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। জানিনা কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে আজ বজু বিবেক তত্ত্বের পূর্ণ কুম্ভ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাপাসক্ত অন্ধতামিস্র হৃদয়ের পরতে পরতে কে যেন দিব্য বৈরাগ্যের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। ভক্তি মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় পাপ পঙ্কিল হৃদয় খানা ধুইয়া লইল। পরিতাপের তাড়ণায় অনেক দিনের সঞ্চিত পাপ রাশি আজ বজুর নয়ন পথে দ্রব হইয়া দর দর ধারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বজু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ধূলায় পরিয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সাধুর চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আমাকে উদ্ধার কর,—আমি মহা পাতকী আমার পায়ের উপায় করিয়া দাও। তুমি আমাকে উদ্ধার না করিলে, আমি আর তোমার চরণ ছাড়িব না, এই তোমার চরণ তলে পড়িয়া বধ হইব।"

এইরূপ আর্তনাদ করিতে—করিতে বজু সাধু, সাধুর চরণ যুগল জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু কহিলেন,—"বাবা স্থির হও,—কোন চিন্তা নাই ঠাকুর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। অনুতাপানলে তোমার সকল পাপ ভস্ম হইয়া গিয়াছে। যাও, এখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া অচিরে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করগে।"

সাধুর বাক্য শ্রবণে বজুর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সাধু বজুকে ছাড়াইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। বজু অশ্রু বিধৌত বদনে গৃহাভিমুখে দৌড়াইয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন বাড়ীতে তাঁহার গুরু-পত্নী আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আজ বজুর বড় সুদিন উপস্থিত। বজু দেবীরূপিণী মা ঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্র পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর

নয়ন জলে চরণ দু'খানি ধুইয়া দিয়া বলিলেন,—"মা! আমাকে মন্ত্র দিয়া উদ্ধার কর। আমি মহাপাতকী আমার প্রতি তোমার অসীম করুণা। নতুবা আজ তুমি এ পাপীর পর্ণ কুটীরে আসিবে কেন মা! মা! আমাকে শীঘ্র শীঘ্র মহামন্ত্র হরিনাম দানে নিস্তার কর!

গুরুপত্নী বিধবা। বার্ষিকাদির জন্ত তিনি আরো অনেকবার বজু বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু বজুর এমন ভাব আর কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। অগ্ন দস্যু প্রকৃতি বজুর দেব দুর্ল্লভ ভক্ত ভাব অবলোকনে তিনি বিস্মিতা হইলেন। এবং নয়ন জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন। "বাবা বজু! তুমি উঠ, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমার মত শিষ্যলাভে আমি ধন্যা হইলাম। বাবা আর বিলম্ব করিও না। সত্বর স্নান করিয়া আইস, এখনি আমি তোমার ভব পারের সেতু বাঁধিয়া দিতেছি।"

বজু তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ফুল-চন্দন-তুলসী সহ ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃপাময়ী দেবী কৃপা করিয়া বজুকে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। গ্রাম শুদ্ধ, পাড়া শুদ্ধ এক বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে,—"বজু মন্ত্র লইয়া আজ হইতে এক সাধু বনিয়াছে।" তৎপর হইতে বজু সাধু কেবল সাধু সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। মায়ার সংসার ছাড়িয়া আর এক অভিনব আনন্দ ধামে বসতি করিতে লাগিলেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতেন না।

অশ্রু, কম্প, পুলকাদি তাহার অঙ্গাভরণ ছিল। গৌর লীলা,—কৃষ্ণ লীলার গ্রন্থাদি যেখানে পাঠ হইত বজু সেখানে নিঝুম ভাবে বসিয়া থাকিতেন। পরমার্থ কথা ব্যতীত গ্রাম্য বৈষয়িক কথা মাত্রই কহিতেন না। অতি দীন বেশে দিবা-যামিনী হরি নামামৃত পানে বিভোর থাকিতেন। আহার নিদ্রার চিন্তা মাত্রও ছিল না। সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া হরি নামের তিলক ছাপা পরিতেন। কাঙ্গালের মত পথে ঘাটে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বজু সাধু প্রতিদিন এক লক্ষ হরি নাম করিতেন। নামের মালা সর্ব্বদাই তাঁহার হাতে ও কণ্ঠে—বিলম্বিত থাকিত। তিনি সংকীর্ত্তনে এমন আত্মহারা হইয়া নাচিতেন যে তদ্দর্শনে তেমন পাষণ্ডের চিত্তও গলিয়া যাইত। বজু সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল থাকিতেন। সাধুর কৃপা

প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ের মোহ মেঘ কোথায় যে উড়িয়া গেল কে জানে? বজ্রু সাধু বলিতেন,—"যদি একদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে, তবে কেন যে মানুষ পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিতেছে—হরি ভজন না করিয়া অহঙ্কারাভিমানের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে,—পরোপকার না করিয়া পর পীড়নে ব্রতী হইতেছে, আমি ইহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

বজ্রু সাধু পরলোক প্রাপ্তির—অল্পকাল পূর্ব্বে নিজ বাটীতে একখান সাধারণ কুড়ে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মৃণ্ময় শ্রীবিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ) স্থাপন পূর্ব্বক রীতিমত সেবা পূজা করিতে ছিলেন। সারাদিন ঠাকুর ঘরের দরজায় বসিয়া দৈনিক একলক্ষ হরিনাম জপ সমাধা করিতেন।

বজ্রু সাধুর স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ) এখনও বর্ত্তমান আছেন। বজ্রুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম মাঝি ও তৎপত্নী অতিশয় ভক্তি সহকারে বজ্রুর প্রাণ গৌর-নিত্যানন্দের সেবা করিতেছেন। তাঁহারাও স্বামী স্ত্রী দুইজন পরম সাধু ও সাধ্বী। বজ্রু সাধুর ঠাকুর বাড়ীতে গেলে বোধ হয় যেন,—বজ্রু এখানেই কোথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি যেমন গৌর নিত্যানন্দ ঠাকুরদ্বয়ের পার্শ্বেই উপবিষ্ট। জয় ভক্ত, জয় ভক্ত বৎসল ভগবান।

পতিতের প্রাণোচ্ছ্বাস।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে, দাস।)

(গীতিকা)

—:o:—

আমার সাধন ভজন, হ'ল না জীবনে,—
সুযোগ, সময় হ'ল না হরি।
তুমি, নিজ গুণে, দয়া করি' মোরে,—
চরণ তরী দিলে, তরি।

তুমি নাথ ওহে পতিত পাবন,
তুমি ওহে নাথ, অধম তারণ,
পতিত অধমে দাও হে শরণ,
আমি, তোমারি ভরসা ধরি ॥
সত্য বটে ঘোর পাপের আঁধার,
ছাইয়া ফেলেছে হৃদয় আমার,
করুণার পূর্ণ আলোক আধার—
(তুমি) দাও পাপ তম নাশ করি' ॥
কার্য্য-চক্র মোর বড়ই প্রবল,
পিষ্ট হ'য়ে দেহ হইল দুর্ব্বল,
চিন্তাব্যাধি হরে, মানসের বল,
ত্রিতাপে জ্বলিয়া মরি ॥
বিষয় সেবায় হ'য়েছি দুর্ম্মতি,
কেবল চিনেছি সংসারের নীতি,
বিষয়ের প্রতি বাড়ে শুধু রতি,
শেষের সে দিন না স্মরি ॥
নিজ গুণে মোর মোহের বিকার,
কাটাইয়া দাও, ওহে গুণাধার,—
স্বগুণে, এ দীনে কর হে উদ্ধার,—
নহিলে, উপায় না হেরি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা।

প্রাণের দেবতা হে গৌরসুন্দর !
পরাণের মাঝে এস।
(আমার) আঁধার হৃদয় ক'রে আলোকিত
দীপ্ত আকাশে ব'স॥
(ওগো দীপ্ত আকাশে ব'স।)
বড় আশা ক'রে বহুদিন হ'তে
আছি তৃষিত, শুধু তোমারি তরে।
শশী-সুধা লাগি চকোর যেমতি
অথবা চাতক মেঘ-বারি তরে॥
পাপিতাপি জন ব্যথিত হৃদয়ে
ডাকিয়া ও যদি তোমায়ে না পায়।
পতিত পাবন, হে দীনতারণ!
বলনা কি হ'বে তাদের উপায়॥
(যদি) শুদ্ধ চিতে শুধু (হয়) তব আবির্ভাব
অশুদ্ধ কি তবে পাবে না।
(তবে) অধম তারণ নামটী তোমার
কেনগো হ'য়েছে বলনা।
ডাকিলে তোমারে ব্যাকুল পরাণে
তুমি ত থাকিতে পারনা।
তাই নিবেদন হে প্রাণরমণ!
ব্যাকুলতা প্রাণে দাওনা।
জাগিলে পরাণে তোমার ভাবনা
বাহিরেও তুমি জাগিবে।

অন্তরে বাহিরে শুধু গৌরময়
তখন এ দীন হেরিবে॥
প্রাণে আশা দিয়ে প্রাণের দেবতা
(আর) রে'খনা নিরাশ ক'রে।
প্রকাশি করুণা এ অধম জনে
লও হে আপন ক'রে॥

ভক্ত ও ভগবান।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

—:•:—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যতি গূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥

যিনি এই ঘোর কলিযুগে অতি নিগূঢ় প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সেই অপার কারুণ্য-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

নবদ্বীপ লীলায় কিরূপ নিগূঢ় ভাবে প্রচ্ছন্ন-ভগবান প্রেম ভক্তি আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য লীলায় বেদব্যাস শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাহার নমুনা দেখাইতেছেন।

শতগ্রন্থি, ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত প্রৌঢ় বয়স্ক একটী অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত কণককান্তি পরম সুন্দর একটী ব্রাহ্মণ বালকের বিষম কলহ বাঁধিয়াছে। চপল বালক, কখন বেচারির ছেঁড়া কাপড় খানি আরো ছিঁড়িয়া দিতেছেন, কখনও তাঁহার থোড়, কলা, মূলা ছড়াইয়া ফেলিতেছেন, কখনও বা তাঁহার সুদীর্ঘ শিখাগুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন,—নদীয়ার বাজার শুদ্ধ লোক দূরে থাকিয়া ভক্ত ভগবানের এই অদ্ভুত রঙ্গ দেখিতেছে। বেচারি ব্রাহ্মণ ত একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যতিব্যস্ত হইয়া যত দূর পারিতেছেন সামলাইতেছেন, আর দুর্দ্দান্ত আক্রমণকারীর সহিত একটা আপোষ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ছিন্ন চাদর খানি পাতিয়া দিয়া মিষ্ট

কথায় বলিতেছেন, "ঠাকুর বৈস, ঐরূপ দুরন্তপণা করিওনা," কিন্তু "চোরানা শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" মিষ্ট কথায় উদ্ধত বালকের পাগলামি বরং বাড়িয়া যাইতেছে, তিনি সেই ছেঁড়া চাদর খানি তুলিয়া বলিতেছেন, "বলি শ্রীধর! তোমার এদুর্ম্মতি হইল কেন? বিষহরি না ভজিয়া লক্ষ্মী নারায়ণ সেবা কর্ত্তে তোমায় কে শিখাইয়াছে? অই দেখ যারা বিষহরি পূজা করে তারা কেমন সুখে সচ্ছন্দে আছে, আর লক্ষ্মীকান্তের সেবক হইয়া তোমার এই লক্ষ্মীছাড়া দশা। তোমার ঘরের চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটেও অন্ন নাই। ছি অমন ঠাকুরকে কি ভজিতে হয়।" শ্রীধর নিষ্কিঞ্চন নৈষ্ঠিক ভক্ত, সহজে টলিবার পাত্র নহেন, "বিষ্ণুমায়া তাঁর মন নারে আচ্ছাদিতে" ভোগ সুখে শ্রীধরের আদৌ মন নাই, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রাজা রাজ ভোগ খায় আর প্রাসাদে থাকে, কিন্তু পক্ষী ধান চাল্ কুড়াইয়া খায় আর থাকে বৃক্ষ শাখায়, কিন্তু দিন উভয়েরই সমান যাইতেছে বরং ভোগৈশ্বর্য্যে যাহারা থাকে তাহারা দুর্ব্বাসনার তাড়ণায় সর্ব্বদাই অশান্ত, আর যাহারা প্রভুকে ভুলিয়া বিষয় রসে মজিয়া থাকে, দুঃখী বলিতে হইলে তাদেরই বলিতে হয়, তাদের মতন অভাগিয়া আর কে আছে।" ভক্তের মুখে এই নির্ভর বাণী শুনিয়া ভগবানের আনন্দ আর ধরিতেছে না চোকে মুখে প্রফুল্লতার ঝলক দিতেছে, চপলতার আচরণে তাহা চাপিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি তুমি খুব চতুর তুমি খুব বড় ধনী * নিশ্চয় তোমার বিস্তর ধন লুকান আছে, তুমি কেবল ঢং ধ'রে লোকের চোখে ধুলা দিয়া কাঙ্গাল সেজে বেড়াও, আমার কাছে চালাকী চল্‌বেনা আচ্ছা থাক কিছুকাল, আমি যেদিন তোমার আসল বস্তু ধরিয়া দিব সেই দিন তোমার সব চতুরতা মিটিয়া যাইবে,—

প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুঞি বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥ চৈঃ ভাঃ

সরল শান্ত শিষ্ট শ্রীধর অত ঘুর পেঁচ বুঝিলেন না, চপল ব্রাহ্মণ কুমারের হাত থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কি

* কৃষ্ণপ্রেম যার আছে সেই বড় ধনী।

জানি যেরূপ পাগ্‌লা ঠাকুর তাহাতে বেশী বাড়াবাড়িও বিচিত্র নহে, হয়ত শেষে বা কিল্ চড় আরম্ভ হইবে,—

মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড়।
শেষে জানি আমারে কিলায় পাছে দড়॥

কিন্তু তিনি ছাড়িলে কি হইবে, কম্বলী যে ছাড়িতে চায় না। প্রভুর কৃপা যে আসিতেছেনা। ভক্তি প্রিয় মাধব নিমাই পণ্ডিত সাজিয়া থাকিলে কি হইবে, পুরাণ খেঁড়ুকে পাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব যে জাগিয়া উঠিতেছে। ভক্তের ভক্তি ধন লুণ্ঠন করা ভগবানের স্বভাব। এমন ভক্তের কাছে কিছু আদায় না হইলে শুধু মুখেইবা ঘরে যাইবেন কিরূপে? তাই শ্রীধর যত বলিতেছেন "লক্ষ্মী ঠাকুর বাড়ী যাও, আমার মত লোকের সঙ্গে কলহ করা তোমার সাজেনা," প্রভু ততই আখুটি ধরিয়া বলিতেছেন," "আমি কিছুতেই শুধু মুখে ফিরিবনা, আমায় কি দিবে তা বল" ;—

প্রভু বলে তোমায় না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীধর মহাবিপদেই ঠেকিলেন, হাসিয়া বলিলেন ঠাকুর! আমি খাই এই খোলা বেচিয়া, আমার নাম ত খোলা বেচা শ্রীধর। আমি আবার তোমায় কি দিব? বাস্তবিক কাঙ্গাল শ্রীধর মনে মনেও ভাবিতেছেন প্রত্যেক দিন বিনামূল্যেই বা কেমন ক'রে দিতে পারি, বামুণকে যে কলা মূলাও কিছু হাতে ক'রে দিব এমন সাধ্যও ত আমার নেই। আবার ভাবিতেছেন তবুও বলেছলে যাহা কিছু ব্রাহ্মণ সেবায় লাগে সেও আমার ভাগ্য। আর যেরূপ দুরন্ত ঠাকুর দেখ্‌ছি জোর ক'রে নিলেই বা আমি কি কচ্ছি। তাই বল্লেন" ঠাকুর সম্পত্তি ত আমার এই কলা মূলা থোড়।

"ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞি"

নাছাড় প্রভু তখন রফার প্রস্তাবে কতক রাজি হইলেন। "আচ্ছা তোমার নিজ গুপ্তবিত্ত এখন থাকুক তাহা পরে বুঝিয়া লইব এখন ভাগ চাও যদি তবে ঐ কলা মূলাই দেও আমি কিন্তু দাম দিতে পারিব না।

প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখন, পাইব তাহা পাছে॥

এবে কলা মুলা থোড় দেহ কড়ি বিনে।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমাসনে॥ চৈঃ ভাঃ।

শ্রীধর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন "আচ্ছা গোঁসাই তোমার কড়ি পাতির দায় নাই, আমি প্রত্যহ তোমাকে এক টুক্‌রা থোড় ও কিছু কলা মুলা দিব কিন্তু কথাটা যেন ঠিক্ থাকে, আর কিন্তু কলহ করিতে পারিবে না। প্রভুও তখন পুরা সম্মতি দিলেন;—

প্রভু বলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ নাঞি।
তবে থোড় কলা মুলা যেন ভাল পাই॥ চৈঃ ভাঃ।

একঅধ্যায় হইয়া গেল তবুও কৃপা যে আসিতেছেনা, তাই আজ আর এক-অধ্যায় আরম্ভ হইল। অনন্ত লীলাময়ের অনন্ত লীলা।

পরিহাস রসিক প্রভু পুরাতন ভৃত্যকে পাইয়াছেন সহজে ছাড়িবেন কেন? তাই রসাস্বাদন চলিতেই লাগিল, পাগলের হাত থেকে রেহাই পাইবার জন্য গো-ব্রাহ্মণ সেবী শ্রীধর কিছু কলা মূলা প্রভুর শ্রীকরে দিয়া বিদায় করিতেছেন প্রচ্ছন্ন ভগবান ভক্তের দান সাগ্রহে দুই হাত পাতিয়া লইতেছেন, আর নিজানন্দে অধীর হইতেছেন, বলিহারি রসাস্বাদন! গুপ্তভাবে নিজ জনের চোখে ধুলি দিয়া প্রেমরস আস্বাদনে বুঝি আরো বেশী আনন্দ তাই প্রকাশ্যে এঁটোফল খাইয়াও তৃপ্তি হয় নাই আত্মগোপন করিয়া কলা মূলা কাড়িয়া খাইতেছেন। প্রাণবল্লভ হৃদয়-সর্ব্বস্বধনকে চিনিতে না পারিয়া ভক্ত বিদায় দিতে চাহিতেছেন কিন্তু রসিক শেখর প্রেমভিখারী প্রভু কিছুতেই যাইতেছেন না, রঙ্গ রস আরো বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্তর্যামী প্রভু বুঝিয়াছেন সখা আমায় চিনিতে পারে নাই। সেই কৌতুকী প্রভু সখার সঙ্গে আরো রঙ্গ করিতে লাগিলেন "শ্রীধর, আচ্ছা তুমি বল দেখি আমি কে? তাই বলিলে তবে আমি ঘরে যাইব। বিষ্ণুমায়া-মোহিত শ্রীধর যাহা স্থূল চক্ষে দেখিতেছেন তাহাই বলিলেন "শ্রীধর বলেন তুমি বিপ্র বিষ্ণু অংশ।" হাসিয়া প্রভু অধীর, "অইত তুমি আমারে চিন্‌তে পার নাই; তোমার চোখে ধুলা দিয়ে দেখো দেখি আমি কেমন থোড় মুলা নিয়েছি। চিন্‌লে না আমি যে গোয়ালার ছেলে।"

"প্রভুবলে না জানিলা আমি গোপবংশ।" নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিণী শুনিয়া থাকিলেও প্রতিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের এই দুরন্ত ছেলেটীকে একেবারে

"গোপেন্দ্রনন্দন" বলিয়া স্বীকার করিতে শ্রীধর প্রস্তুত নহেন, ব্রাহ্মণ কুমারের পাগলামি দেখিয়া শ্রীধর হাসি সাম্‌লাইতে পারিলেন না। কৌতুকী প্রভু তাহা দেখিয়া আরো মাত্রা চড়াইলেন। "শ্রীধর আমার কথায় বুঝি তোমার বিশ্বাস হইলনা। বলি তুমি যে গঙ্গাদেবীকে ভক্তি কর, কলামুলা বেচিয়া দৈনিক যাহা কিছু রোজগার কর তাহার অর্দ্ধেক দিয়া প্রত্যহ যে গঙ্গা দেবীর পূজা কর তোমায় সেই গঙ্গা দেবী যে আমরা এই শ্রীচরণ থেকে উদ্ভব হয়েছে।" এই বলিয়া শ্রীচরণ বাড়াইয়া দিলেন। শ্রীধর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চক্ষু কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন সর্ব্বনাশ এই পাগলা ঠাকুর করে কি? চাপল্যের চূড়ান্ত আরম্ভ হ'লো দেখিয়া বলিলেন "বলি ও নিমাই পণ্ডিত লোকে যত বড় হয় ততই শিষ্টশান্ত হয় আর তুমি যত বড় হচ্ছ ততই তোমার পাগলামি বাড়্ছে দেখ্‌ছি ঠাকুর দেবতা বলিয়াও কি তোমার ভয় নেই।" আর বেশী বাড়াবাড়ী ভাল নহে বুঝিয়া চপলনেত্রে গুপ্তহাসি হাসিয়া বিদ্যুদ্দামের মত প্রচ্ছন্ন প্রভু সরিয়া পড়িলেন। সে চপল নয়ন ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীধরের মাথা ঘুরিয়া গেল, সে দিন তাঁর আর বেচা কেনা হইল না বিহ্বল হইয়া রহিলেন, তিনি না চিনাইলে তাঁহাতে কে চিনিবে?

হেন সে উদ্ধত প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাই নবদ্বীপে॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে॥

এই অপূর্ব্ব রসাস্বাদনের মাধুর্য্য আমরা ভক্তিবিহীন জীব কি বুঝিব। বুঝিয়াছিলেন সেই খোলা বেচা শ্রীধর। তাই যখন কৃপা করিয়া ভগবান ভক্তের নিকট আত্মরূপ প্রকাশ করিলেন, বর দিবার জন্য যখন পীড়া পীড়ি আরম্ভ করিলেন তখনই শ্রীধর এই লীলা মাধুর্য্য বুঝিয়াছিলেন, প্রেম গদ গদ কণ্ঠে তাই প্রার্থনা করিলেন—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্মে জন্মে নাথ॥"

দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই মহা সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন—

খোলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটীজন্মে কোটীশ্বরে না পাইবে তাহা॥ চৈঃ ভাঃ।

গৌরলীলাভিনয়ের পট পরিবর্ত্তিত হইল; শুদ্ধা প্রেম-ভক্তির লোভে প্রচ্ছন্ন প্রভু নদিয়া বাসির দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন আবার কিলোভে আজ অন্য ভক্তের নিকট চলিয়াছেন। আজ কিন্তু ভোল অন্য রকম। ভক্তের বাসনানুরূপ প্রভুর ভঙ্গীও ক্ষণে ক্ষণে নূতন হয়। কি ভাব হইয়াছে জানি না অই দেখ উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণ সাজিয়া রাজ পথ দিয়া চলিয়াছেন।

ব্যবহারে রাজ যোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥
অধরে তাম্বুল কোটীচন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন?
ললাটে তিলক উদ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টি মাত্রে পদ্ম নেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥

ভুবন সুন্দর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর আজ মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চপল পড়ুয়ার দলে পরিবেষ্টিত হইয়া পুঁথি বগলে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিয়াছেন। সম্মুখেই দেখেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিত আসিতেছেন। সেই চিরবাঞ্ছিত ভুবনমোহন রূপ দর্শনে শ্রীবাস মোহিত হইলেন। বিদ্যারসে ভোলা নিমাই পণ্ডিতকে কৃষ্ণ সাজিতে দেখিয়া শ্রীবাসের প্রাণ আনন্দে আটখানা হইয়াছে বাস্তবিক ভিতর বাহিরের রূপ যেন মিলিত, নিরীহ নারদ স্বভাব সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবাস পণ্ডিত এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত কিন্তু কোন ধৃষ্টতা করিলেন না বরং সুশীল সুবোধ বালকের ন্যায় ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। অত্যুদার শ্রীবাস প্রাণ খুলিয়া বাহু তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন প্রভু অখিল-ভুবন-পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "চিরায়ুর্ভব"; বুঝি মনে মনে বলিলেন "কৃষ্ণে মতিরস্তু।" পুনরপি হাসিয়া বলিলেন ওই বেশে কোথায় চলিয়াছ—

"কতি চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি।"

প্রভুর কথা নাই কেবল মিটি মিটি হাসিতেছেন আজ সুযোগ পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত প্রচ্ছন্ন প্রভুর হাত খানি ধরিয়া মিষ্ট উপদেশ দিতে লাগিলেন, "দেখো

নিমাই পণ্ডিত আর কতকাল বৃথা বিদ্যারসে মজিয়া থাকিবে, পড়া শুনাতো কৃষ্ণ ভক্তির জন্য, তাহাই যদি না হইলে তবে সে বিদ্যার্জ্জনে ফল কি? জীবের জীবন পদ্মপত্রের জল এই আছে এই নাই, অতএব—

এতেকে সর্ব্বথা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥

সরল ভৃত্যের কামনা ও আর্ত্তি দেখিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভুর আনন্দ আর ধরিতেছে না, হাসিয়া বলিলেন আপনার ন্যায় পরম কৃষ্ণভক্তের আশীর্ব্বাদ হইলে নিশ্চয়ই আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। কৃষ্ণভক্তের আশীর্ব্বাদ কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

হাসি বলে মহাপ্রভু শুনহ পণ্ডিত।
তোমার কৃপায় সেই হইব নিশ্চিত॥ চৈঃ ভঃ।

আজ গুপ্ত-লীলার গুপ্ত-প্রেমাস্বাদনের চূড়ান্ত অভিনয় হইল। নিমাই পণ্ডিত আর সে উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত নাই শিষ্ট বিনীত সেবক হইলেন। ভক্তভূপ শ্রীবাস পণ্ডিতের করঙ্গ ও কাপড় বহিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। শ্রীবাস ভঙ্গী দেখিয়া হাসিলেন কিন্তু বেশী আপত্তি করিলেন না ভাবিলেন "উঁহার ক্রমে সুমতি হউক, কৃষ্ণ করুন নিমাই পণ্ডিত যেন কৃষ্ণভক্ত হয়।" এদিকে ভগবানের যুগযুগান্তরের অপূর্ব্ব মনোসাধ আজ পূর্ণ হইতেছে। ভক্ত পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া ভক্তের হীন সেবা করিতে যে তাঁহার প্রবল লোভ, তাহাতেই যে তাহার অপার আনন্দ। চতুর শেখর ছদ্মবেশে আজ সেই সাধ মিটাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই সাধ পুরাইতেই বুঝি গোকুলচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র হইয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মাধুর্য্য।

হেনমতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতুহলী॥ চৈঃ ভাঃ।

সহজ ধর্ম্ম।

(লেখক।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী।)

—:০:—

আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ, যাহা লইয়া আমারা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত আছি, পশু জীবনেরও উহাই তাৎপর্য্য, উহাই সর্ব্বস্ব। যদি উক্ত পশু-সাধারণ-বিষয়-চতুষ্টয়েই এ জীবন পর্য্যবসিত হইল, তবে মানবে আর পশুতে পার্থক্য থাকিল কি? কিন্তু স্বর্গে নরকে যে পার্থক্য, যে ব্যবধান, মানবের সহিত পশুর তদপেক্ষাও অধিক দূর ব্যবধান, পার্থক্য চিরবিদ্যমান; "দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম" মানব জন্ম দুর্ল্লভ হইতেও অতি দুর্ল্লভ। পশু জন্ম হইতে তার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে। তাহা কি? উহা আর কিছু নহে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় উহা ধর্ম্ম, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

একমাত্র উক্ত ধর্ম্মই পশু হইতে মানবকে পৃথক করিয়া দিয়াছে; উক্ত ধর্ম্ম না থাকিলে মানুষে আর পশুতে পার্থক্য তিরোহিত হইয়া যায়।

এই ধর্ম্ম শব্দটীর তাৎপর্য্য কি? পশুর মধ্যে যেমন পশুত্ব ধর্ম্ম আছে, মানবের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম আছে তবে ধর্ম্মই বিশেষ এ কথার তাৎপর্য্য কি?

ভগবান্ ঋষভদেব তাঁহার ভরতাদি পুত্রগণকে তাই উপদেশ করিতেছেন:—

নায়ং দেহোদেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্‌যস্মাৎ ব্রহ্ম সৌখ্যন্ত্বনন্তম্। (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।৫।১।)

হে আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রগণ! যে পরিণাম ভয়াবহ কামাদি বিষয় উপভোগের জন্য বিষ্ঠা ভোজী জঘন্য প্রাণীর দেহ ধারণ, মানব দেহ ধারণের সেই উদ্দেশ্য নহে, সেই প্রয়োজন নহে। সুদুর্ল্লভ এই মানবদেহ পশু-সুলভ কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি জঘন্য সুখ-সাধনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। এ

মানব জন্ম, দিব্য তপস্যার জন্য, যাহা দ্বারা সত্ত্ব বিশুদ্ধ ও অনন্ত ব্রহ্মানন্দ সুখ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহারই উপলব্ধির জন্য।

ধর্ম্মহীন জীবনের ভয়াবহ পরিণাম, স্মরণ করিতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই যে রোগ শোক পরিতাপ বধ বন্ধনাদি দারুণ দুঃখ, মূলে ধর্ম্মহীনতাই একমাত্র কারণ। ধর্ম্মহীন নরপশু, ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ সুখাশায় মুগ্ধ হইয়া মানব জীবনের সারসর্ব্বস্ব, কামনানলে আহুতি প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে চির অপসৃত হয়; পরলোকেও তার অনন্ত যোনি জন্ম পথে ঘোর তামসী নরক ক্লান্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপথের সম্বল না করিলে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার কিছুমাত্র আশা নাই।

একদিন হস্তিনার পবিত্র ধর্ম্ম-সিংহাসন-মূলে বসিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির, দেবর্ষি শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্, মানবের সনাতন ধর্ম্ম কি? জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের মূলাধার ধর্ম্মের রহস্য, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব আপনার নিকট ভিন্ন আর কাহার নিকটে জানিবার ইচ্ছা করিব? আপনি প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর সাক্ষাৎ আত্মজ। উৎকট তপোযোগ সমাধি বলে তাঁহার অন্যান্য যোগ্য পুত্রগণও আপনার শ্রীচরণমূলে নিত্য প্রণত। প্রভো, মন্বাদি ঋষিগণ ধর্ম্মতত্ত্ব বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি আপনার ন্যায় শান্ত করুণ সাধুর মুখে, নারায়ণপর বিপ্রের মুখে এই ধর্ম্মের গুহ্যাতি গুহ্য রহস্য শুনিবার জন্য আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। প্রভো, আপনার বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের তুলনা হয় না।"

সেই ধর্ম্ম প্রশ্নে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, তুমি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ; প্রকৃত জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্ম রহস্যই সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন; কারণ ধর্ম্ম না বুঝিলে অন্য কোন বিষয়েই জ্ঞাত হওয়া যায় না। তোমার সনাতন ধর্ম্ম প্রশ্নে, যিনি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের দাক্ষায়ণী পত্নীতে নিজ অংশে আবির্ভূত হইয়া লোকমঙ্গল বিধান ইচ্ছায় বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম্ম-সেতু ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তন্মুখ নির্গলিত ধর্ম্ম রহস্য ব্যাখ্যা করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর—

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদ ময়ো হরিঃ'
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি।" (শ্রীমদ্ভাগবত।)

সর্ব্ববেদময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল, ধর্ম্মের প্রমাণ ধর্ম্মের সাক্ষী, এবং সেই বেদার্থ দ্রষ্টা ভগবান ঋষিগণের বাক্য স্মৃতিই ধর্ম্মের শাশ্বতি মূর্ত্তি আর যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয় প্রশান্ত হয় তাহাই ধর্ম্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ।"

জীবের কর্ম্মবশে যখন জীবনতরী সংসার সাগরে ডুবু ডুবু হয়, তখন অনেক সময় এই ধর্ম্মমূল ভগবানকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে না পাওয়া গেলেও অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে ও বাহিরে গুরু মূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত ও অনুভব গোচর হইতে দেখা যায়।

ভগবদ্দর্শন সহজে লাভ হয় না, সুতরাং সেই নিখিল বেদ-কল্পপাদপের অমিয়ফল সান্দ্রানন্দ রসবিগ্রহ ভগবান্‌কে যাঁহারা আস্বাদ করিয়াছেন, সেই সকল মন্বাদি ঋষিগণই ধন্য, আর তাঁহাদের পবিত্র বাক্য যাহাকে শ্রুতি—

"যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্।"

ভব-রোগের মহৌষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে সেই পূর্ণানন্দের অপূর্ব্ব প্রস্রবণ সহস্রধারে ফুটিয়া অনন্তকাল পাপদগ্ধ সংসারের উর্ব্বরতা বিধান করিতেছে সংসার-মরু-দগ্ধের পিপাসিতের সুশীতল মন্দাকিনী, স্খলিতের অবলম্বন যষ্টি পতিতের আশ্রয়ভূমি সেই স্মৃতিকেও ধর্ম্মমূল বলিয়া জানিতে হইবে। মন্বাদি ঋষিগণ সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরির পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য জগতের দ্বারে কৃপা করিয়া বিস্তার করিয়াছেন উহারই নাম স্মৃতি। কুটিল যুগের কঠোর জীবপ্রকৃতিতে আপাত বিরুদ্ধ সেই তিক্ত সুতীব্র যাতনার কারণ হইলেও তাহাতে যথেষ্ট শান্তনা আছে, অভয় আছে। মহৌষধ তাই বলিলেন "যেন চাত্মা প্রসীদতি।" জীবের বাহিরের বৈষয়িক আনন্দ শীঘ্রই অবসাদ আনিয়া দেয়। আত্মার তৃপ্তি, আত্মার আনন্দই প্রকৃত আনন্দ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ভগবান্ নারদ ঋষি যাহা বলিয়াছেন মন্বাদি ঋষির বাক্যেও তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যথা মনুসংহিতায়ঃ—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।

ভগবন্মূর্ত্তি বেদ সকল, বেদজ্ঞ ঋষিগণের বাক্য স্মৃতি, সাধুগণের সদাচার ও আত্মার তুষ্টি তৃপ্তি, ইহাই ধর্ম্মের মূল। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ কথাই বলিয়াছেন :—

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ সস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্ম মূল মিদং স্মৃতম্।

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার আত্মতৃপ্তিই ধর্ম্মের মূল। যাহাতে আত্মার তৃপ্তি শান্তি হয় না, তাহা কখনই সাধুগণের আচরণীয় হয় না। সুতরাং কাল প্রভাবে উক্ত ধর্ম্ম লক্ষণ শ্রুতি স্মৃতি সদাচার লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

কালের প্রভাবে উন্মার্গ প্রধাবিত উন্মত্ত জীবের আত্ম-স্মৃতি-জ্ঞান নষ্ট হইতে বসিয়াছে বলিয়া, ঐ পরমধর্ম্মের সঞ্জীবন রসায়ন পানে তাহারা একান্ত বিমুখ হইয়াছে; যাহাতে আত্মা প্রসন্ন নির্ম্মল হন আত্মার তৃপ্তি আনন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পরম কল্যাণ হয়, জীব অনাদি আত্ম বহির্ম্মুখ বলিয়া আর কিছুতেই তাহা বরণ করিয়া লইতে চায় না; তাই তার এত ত্রিতাপ দুঃখ সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রুতি স্মৃতি সদাকার বাদ দিলে আর ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে না কারণ উহাই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ উহাই ধর্ম্মের প্রমাণ এবং উহাই ভগবানের সর্ব্বস্ব। পরমাত্মার উহাই একমাত্র শান্তনা।

আজ জগতের কি বিপরিবর্ত্তন। ধর্ম্মভ্রষ্ট মানব কামসুখের বহু মান করিয়াছে, আপাত মধুর বৈষয়িক সুখে মুগ্ধ হইয়াছে, লুব্ধ হইয়াছে, প্রকৃত সুখের পথে ধর্ম্মের পথে তাহার মতি নাই গতি নাই রতি নাই; ফলে দুঃখ দারিদ্র হাহাকার বধ বন্ধনে পশুর ন্যায় নিষ্পীড়িত। বেদ স্মৃতি সদাচার ভুলিয়া দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে তবু জীবের চৈতন্য নাই। এইত বর্ত্তমানে ধর্ম্মের অবস্থা।

আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচার্য্য ব্রাহ্মণের এই যে শোচনীয় অধঃপতন ইহারও মূল একমাত্র এই আচার ত্যাগরূপ ধর্ম্মহীনতা—

শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি
অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। মনুঃ।

বেদাধ্যায়ন বিরহিত হইয়া, স্মৃতি সদাচার পরিত্যাগ করিয়া, যে দিন বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, কদাচারে রত হইয়াছেন সেইদিন হইতেই তাঁহার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে আর তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। ধর্ম্মবল বড় বল।

দেবর্ষি নারদ, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "মহারাজ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি স্মৃতি সদাকার মূলে মানবগণের সাধারণ ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এইবার বিশেষ রূপে বলিতেছি শ্রবণ কর :—

সত্য বাক্য, দয়া, একাদশী ব্রতাদি তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্তাযুক্ত বিবেক, মনঃ সংযম বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দান যথোচিত জপ, সরলতা, দৈবলব্ধ বিষয়ে সন্তোষ, সমদর্শী মহৎসেবা, সংসার প্রবর্ত্তক কর্ম্ম নিবৃত্তি, ভোগত্যাগ, মনুষ্যকৃত কর্ম্মের নিষ্ফলতা জ্ঞান, বৃথা বাক্যত্যাগ, আত্ম বিকার না যথোচিতরূপে ভূতগণে অন্নাদি বিভাগ, সর্ব্বভূতে আত্ম দেবতা বুদ্ধি, বিশেষরূপে মানবে আত্মার বিশিষ্ট প্রকাশ জ্ঞান, ভগবানের নাম লীলা গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ, তাঁহার সেবা পূজা প্রণাম দাস্য সখ্য এবং তচ্চরণে আত্মনিবেদন, এই ত্রিংশলক্ষণ পরম ধর্ম্ম সকল মানবগণের নিঃশ্রেয়ো জন্য কথিত হইয়াছে। যথাসাধ্য এই সকলের অনুষ্ঠানে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।" কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপক লক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সহজ সাধ্য নহে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রশ্নে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সংক্ষেপ লক্ষণ নির্দ্দেশক উত্তর দিয়াছেন যথা—

অহিংসা সত্য মস্তেয়মকাম ক্রোধ লোভতা
ভূত প্রিয় হিতেহা চ ধর্ম্মোহয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত।)

অহিংসা, সত্যবাক্য, অচৌর্য্য, কাম ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ এবং প্রাণিগণের হিতকর প্রিয় সাধনে চেষ্টা, ইহাই সকল বর্ণের ধর্ম্ম।

কিন্তু হায়, আমরা সমগ্র জীবনে উহার একটী ভাবও ধারণ করিতে পারিলাম না। একমাত্র হিংসা লক্ষণ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেও এ জীবনে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইত, কিন্তু তাহা পারিলাম কি? মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা শরীরের দ্বারা কত পাপ করিতেছি তাহার সংখ্যা হয় না। অতকথা ছাড়িয়া দিয়া যদি উক্ত একটী অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতাম তাহা হইলেও পরম

ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু তাহা পারিলাম না। উক্ত হিংসা লক্ষণ অধর্ম্মেই জীবন পশুত্বে পরিণত হইল কিন্তু তবু আমাদের গর্ব্বের অবধি নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন—মানব, যদি পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও; কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতে হিংসা পরিত্যাগ কর, উহাতেই তোমার সব পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।

নৈতাদৃশঃ পরোধর্ম্মো নৃণাং সদ্ধর্ম্মমিচ্ছতাং
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্‌কায়জস্য তু। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হিংসার মত আর পাপ নাই। কিন্তু হিংসা ত্যাগ করিতে পারিলাম কি? মূর্ত্তিমান কলি উক্ত দ্বার দিয়া এ দেহ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আমাদের কি আর উদ্ধার আছে? আবার এই জীবনে ভগবৎ প্রীতি লাভের জন্য আমাদের এত সাধ, কি দুরাশা।

আমরা ভ্রান্ত উন্মার্গ ধাবিত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞানে যতকিছু অনুষ্ঠান করিতেছি তাহাতে আমাদের দিন দিন অধর্ম্মই বিস্তার হইতেছে। স্বভাব বিহিত ধর্ম্মই সকলের আনন্দের কারণ হইয়া থাকে গীতায় উক্ত হইয়াছে—

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

আবার ;—স্বভাব বিহিতো ধর্ম্ম কস্য নেষ্ট প্রশান্তয়ে? (ভাগবতম্ ।)

কিন্তু আমরা মোটেই সে পথে যাইতে চাই না। ভয়াবহ পরধর্ম্মেই আমাদের শ্রদ্ধা অধিক। আমরা সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মশাখা বিধর্ম্মে আশক্ত পরধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ধর্ম্মাভাসে লালায়িত, উপধর্ম্মে লোলুপ, ছলধর্ম্মে ভক্তিমান কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন—

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোহধর্ম্মবৎত্যজেৎ।
ধর্ম্ম বাধো বিধর্ম্মঃস্যাৎ পরধর্ম্মোহন্যচোদিতঃ
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ
যস্তিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসোহ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।

কিন্তু আমাদের ঐ সকল অধর্ম্মেই বিশেষ ধর্ম্ম বুদ্ধি, যুগ প্রভাবে এই সকল অধর্ম্ম শাখাই ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় এখন আর স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ নহেন, স্ব স্ব বর্ণ বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলেই পশ্চাচার পরায়ণ, অন্যধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্। এইত দেশের অবস্থা।

প্রেমময় প্রভো, তোমার পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের স্পর্শ সুখ, এ জীবনে এ পাপ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলাম না। নিত্য অধর্ম্মে আশক্ত হইয়া এ দুর্ল্লভ নরজন্ম হেলায় কাটাইয়া দিলাম; মহতের পাদরজঃস্পর্শেও মহাপাতকীর জীবন অমৃতময় হয়, কিন্তু দম্ভে অভিমানে এ জীবনে তাহারও আশা সুদূর পরাহত। আমাদের গতি কি হইবে? আর কোনই আশা নাই ভরসা নাই—

একমাত্র ভরসা, পরম মঙ্গল শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। তুমি, কলির পতিত দুর্গত জনের অবস্থা বুঝিয়া এই সহজ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আজ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অধম জীবের দ্বারে দ্বারে আবির্ভূত হইয়াছে, তাই আসমুদ্র হিমাচল এই সহজ ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

ঐ যে ভারতের কোটী কোটী অধম সন্তান তোমার ভুবন মঙ্গল নাম সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়াছে, করতাল মৃদঙ্গের পবিত্র ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে নামে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সকলে দেহ গেহ আত্ম বুদ্ধি ভুলিয়া সজল নয়নে ভূমি লুণ্ঠিত হইতেছে উঁহারাই ধন্য উঁহারাই কৃতার্থ। আজ সকলে বুঝিয়াছে—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন—
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।

তাই অন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি।

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সতত পরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু কাপিনোসন্
যদ্দত্ত শ্রীহরিরস সুধাস্বাদ মত্তোঃ প্রনৃত্য
ত্যুচৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমিতং কঞ্চিদীশম্

নাম প্রভাব।

—:০:—

পরমার্চ্চনীয়,—

শ্রীযুক্ত 'ভক্তি' সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীচরণ কমলেষু,—

মহাশয়,

নিম্নে শ্রীশ্রীহরিনামের অন্যতম আনুসঙ্গিক গৌণ মহিমার পরিচায়ক একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা আপনার সুবিখ্যাত 'ভক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া নাম-কীর্ত্তনের মহাত্ম্য প্রচার করতঃ সাধারণের উপকার সাধন করিবেন। নিবেদন ইতি ১৫।৩।১৭ প্রণত শ্রীসত্য চরণ চন্দ্র। খিদিরপুর।

(শ্রীশ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের অন্যতম আনুসঙ্গিক গৌণ প্রভাব।)

'ভক্তি' পত্রিকার পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে খিদিরপুর, কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ দিকবর্ত্তী একটী উপনগর। এখানে একটী হরিসভা ত্রিশবৎসরেরও অধিককাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, উক্ত সভার সম্পাদক এক জন প্রাচীন গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সেন ভোগী কর্ম্মচারী, নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মালীপাড়া গ্রামে।

খিদিরপুরে মনসাতলায় তাঁহার একটী বাসাবাটী আছে। তথায় উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের পুত্রগণ কর্ম্মোপলক্ষে পরিজনাদি সহিত বাসকরেন। সম্পাদক মহাশয় কখনও স্বদেশে কখনও বাসা বাটীতে থাকেন। ঘটনার সময় তিনি দেশেই ছিলেন।

সেটা রবিবার। গত ১৩২৩ সালের ২২শে মাঘ বেলা ২টার সময় অকস্মাৎ সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত বাসাবাটীতে ইট পড়িতে লাগিল। বাসার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কারণ অন্বেষণ করিয়া কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না।

ইহার পূর্ব্ব তারিখে উক্ত বাটীর ছাদের উপরে ফুলের সুবাস অনুভূত হয়। উক্ত সুবাস এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল যে, উক্ত বাটীর ও

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের বালকগণ অনেকেই উক্ত সুবাস আঘ্রাণ করিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছিল।

এক্ষণে উক্ত ইট পড়িবার কোন কারণ কেহ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, শুনিয়া ও দেখিয়া প্রতিবাসী সহৃদয় ব্যক্তিগণ উপদ্রব নিবারণ জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। আলিপুর জজ আদালতের অনেক উকীল উক্ত হরিসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তদীয় কর্ম্মস্থল ও হাইকোর্ট হইতে দুইজন 'হিপ্‌নটীষ্ট' আনাইলেন, তাঁহারা বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই উপদ্রব হ্রাস হইল না।

উক্ত সতীশ বাবু ও বর্ত্তমান লেখক এবং আলিপুর জজ কোর্টের অন্য এক-জন হিপ্‌নটীজম্ বিদ্যাভিজ্ঞ উকীল বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় স্বচক্ষে উপদ্রব লক্ষ্য করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ একটী ছোট চুমকী ঘটি পড়িল। আর কিছুক্ষণ পরে একটী জামা পড়িল। পরে উক্ত হিপ্‌নটীষ্ট উকীল মহাশয় কিঞ্চিত জল মন্ত্রপূত করতঃ বাটীর গৃহিণী ও দুইটী বধূর গাত্রে ছড়াইয়া দিলেন। তার পরেই সেখানে থুতু পড়িতে দেখা গেল।

তখন উক্ত গৃহিণী ও বধূদ্বয়কে গৃহের মধ্যে যাইয়া বসিতে বলা হইল। তাঁহারা গৃহমধ্যে যাইবার পর একটী মিছরীর কৌটা পতিত হইল। কিছুক্ষণ পরে একটী ঝিনুক তক্তপোষ হইতে ঘরের মেজেতে আসিয়া পড়িল। তারপর সেই মন্ত্রপূত জলের গেলাশের ভিতর থুতু পরিতেছে তাহা সকলে উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াও ধরিতে পারিলেন না।

কেহ কেহ মনে করিলেন বাড়ীর বৌ দুইটীকে স্থানান্তরীত করিলে উপদ্রব শান্ত হইবে। তদনুযায়ী তাঁহাদিগকে পাড়ার এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে রাখিয়া আসা হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বাড়ীতেও উপদ্রব আরম্ভ হইল। সে বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ গৃহদ্রব্যাদি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বৌদুটীকে তাঁহাদের আপন বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

উপদ্রব বন্ধ হইল না। একটী গাড়ু পতিত হইয়া টোল খাইয়া গেল। একটী নারীকেল তেলের বোতল একস্থান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া পতিত হইল। কিন্তু একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল না কেবল মাত্র গলাটী ছাড়িয়া গেল। এমন কি ভিতরে যে নারীকেল তেল শীতে জমাট বাঁধিয়া ছিল তাহাও পূর্ব্ববৎ মমবাতীর আকারে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাঙ্গিল না। দ্রব্যাদি যখন যাহা পড়ে কাহারও গায়ের উপর পড়ে না। কিম্বা স্থানান্তরিত হইবার সময়ে কেহ কিছুই দেখিতে পাননা। যখন ভূমিতে পতিত হয় তখন সেই শব্দ পাওয়া যায় ও কি পড়িল তাহা দেখা যায়।

সময়ে সময়ে যে দ্রব্য ঘরের ভিতরে চাবি বন্ধ আছে তাহাও আসিয়া দাওয়ায় পড়ে। কেহ বলিলেন ঐ দ্রব্য দাওয়াতেই ছিল। সে জন্য দাওয়ায় কি কি দ্রব্য আছে যত্ন পূর্ব্বক দেখা হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যাহা সেখানে ছিলনা ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ ছিল তাহাই আসিয়া দাওয়ায় পতিত হইল।

এইরূপে তিন দিন কাটিয়া গেল, ২৫ এ মাঘ বুধবার প্রাতে একজন শুভা-কাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী বিপন্ন ব্রাহ্মণ কন্যাগণের ভয় ও ক্লেশ দেখিয়া একটী নাগপুরী রোজা ডাকিয়া আনিলেন। সে বলিল ৫।৬ টাকা দিলে আমি ডাব, সিন্দুর, নেবু, কাপড়, মদ প্রভৃতি ক্রয় করতঃ তাল বেতালের পূজা করিয়া এই ভৌতিক ব্যাপার শান্ত করিতে পারি। এবং এই ভূতকে একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি। বোতলটী এত ভারি হইবে যে, আপনারা কেহই তাহা উত্তোলন করিতে পারিবেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া উক্ত হরিসভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন এই পূজা তামসিক ব্যাপার, আমরা প্রথমে সাত্ত্বিক ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়া দেখিব, হরিনামে শমন ভয় নিবারিত হয়, ভূত প্রেতাদিতো অতি অল্প কথা। পরে অন্যমত দেখা যাইবে।

তদনুযায়ী আবশ্যক হইলে সংবাদ দেওয়া যাইবে বলিয়া সেদিনকার মত সেই রোজাটীকে বিদায় দেওয়া হইল। পরদিন বৃহস্পতিবার প্রাতে উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। বাটীর গৃহিণীর পদে একটী কাষ্ঠ খণ্ড অকস্মাৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিত আহত করিল। ভয়ে কেহ রন্ধনাদি করিতে সাহস করেন না। ইতি পূর্ব্বে, পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালে নাগপুর রেল আফিস হইতে

একজন প্রসিদ্ধ হিপ্‌নটীষ্ট' আসিয়া 'ঐ ভূত দেখা যাইতেছে' বলিয়া চীৎকার করায় বাটীর মহিলাগণ অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে গৃহিণীর পদে আঘাত লাগায় সকলেই সাতিশয় সন্ত্রস্তা হইলেন।

সেইদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে খিদিরপুর পদ্মপুকুর ষ্ট্রীটের ৩৯নং ভবনে শ্রীযুক্ত হীরালাল পড়েল মহাশয়ের অনুষ্ঠিত একটী হরিসভা হয়। তথায় খিদিরপুর হরিসভার পণ্ডিত শালিখা নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ভাগবতভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহাকে লইয়া বিপন্ন বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করাইবার জন্য খিদিরপুর হরিসভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় সায়ংকালেই উক্ত ৩৯ নং ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহৃদয় হীরালাল বাবু নিজ বাটীতে পাঠ বন্ধ রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় সহ ঘটনাস্থলে গমন করিলেন।

তথায় "পুতনা মোক্ষন" লীলা পাঠ হইল। এবং পাঠান্তে স্বনাম প্রসিদ্ধ নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ দাস মহাশয় উচ্চ কণ্ঠে সুমধুর ভক্তিপুত স্বরে মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে অন্যূন এক ঘণ্টাকাল ধরিয়া তারকব্রহ্ম নাম গান করিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টার সময়গান সমাপ্ত হইল।

অতিশয় আনন্দের বিষয় পরদিন প্রাতে একবার মাত্র সেই গলাভাঙ্গা নারীকেল তেলের বোতলটী কিয়দ্দূরে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে অর্থাৎ বেলা ৯টার পর হইতে সকল উপদ্রব শান্ত হইয়াছে।

ঐ দিবস বেলা ১৷৽ টার পর কনিষ্ঠা বৌটীকে কর্ম্মাটারে তাঁহার ভ্রাতৃ ভবনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেখানেও আর কোনও উপদ্রব হয় নাই। আর ঘটনাস্থলেও সকল উপদ্রব বন্ধ হইয়াছে। অলমিতি।

আমরা ঘটনাটি অবিকল প্রকাশ করিলাম এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করুণ এসব ব্যাপার কি? আর নাম বলে যে অসম্ভবও সম্ভব হয় তাহাও বুঝুন।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা।

—:•:—

কলিকাতা "ভাগবত-ধর্ম্ম-মণ্ডলের" ব্যস্থাপক আচার্য্যগণ দ্বারা বিশেষরূপে পরিদর্শিত হইয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সন ১৩২৪ সাল ৪৩২ চৈতন্যাব্দের বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা প্রকাশ হইয়াছে, আমরা সাধারণের অবগতির জন্য ব্রত তালিকাটী নিম্নে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম। ভাগবতধর্ম্ম মণ্ডলের সম্পাদক মহাশয় এই "নানামুনির নানামত" প্রচার রূপ যথার্থ ধর্ম্ম কর্ম্মের বিভ্রাট সময়ে এরূপ ব্যবস্থা সংগ্রহে পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বসাধারণের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি যথার্থই ধন্যবাদার্হ। আমরা শ্রী শ্রীগৌর-ভগবানের নিকট তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। (ভঃ সঃ)

বৈশাখ।

একাদশী	৫ই বুধবার।
অক্ষয়তৃতীয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা	১১ই মঙ্গলবার।
জহ্নু সপ্তমী (শ্রীজাহ্নবী পূজা)	১৫ই শনিবার।
একাদশী	২০শে বৃহস্পতিবার।
নৃসিংহ চতুর্দ্দশীব্রত	২৩শে রবিবার।
শ্রী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল যাত্রা	২৪শে সোমবার।

জ্যৈষ্ঠ।

একাদশী	৩রা বৃহস্পতিবার।
একাদশী	১৮ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	২২শে মঙ্গলবার।

আষাঢ়।

একাদশী	১লা শুক্রবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা	৭ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা	১৬ই শনিবার।

শয়নৈকাদশী (রাত্রির প্রথমযামে শ্রীশ্রীহরির শয়ন) চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ	১৭ই রবিবার।
একাদশী	৩১শে রবিবার।

শ্রাবণ।

একাদশী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ) (১)	১৪ই সোমবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ	১৫ই মঙ্গলবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন (রাখী পূর্ণিমা)	১৮ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত	২৫শে শুক্রবার।
একাদশী	২৮শে সোমবার।

ভাদ্র।

একাদশী	১৩ই বুধবার।
একাদশী	২৭শে বুধবার।

আশ্বিন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত	৮ই সোমবার।
পার্শ্বৈকাদশী (বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ) শ্রবণাদ্বাদশী (সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন)	১১ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীবামনদেবের জন্ম (পূজাদি অন্তে পারণ)	১২ই শুক্রবার।
একাদশী	২৫শে বৃহস্পতিবার।

কার্ত্তিক।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব	৮ই বৃহস্পতিবার।
একাদশী	৯ই শুক্রবার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা	১২ই সোমবার।
একাদশী	২৪শে শনিবার।
গোবর্দ্ধনযাত্রা ও অন্নকূট	২৯শে বৃহস্পতিবার।

অগ্রহায়ণ।

গোপাষ্টমী (গোপূজাদি)	৬ই বৃহস্পতিবার।
উত্থানৈকাদশী (ভীষ্মপঞ্চক) চাতুর্ম্মাস্য ব্রত সমাপ্ত; অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীহরির উত্থান, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা	৯ই রবিবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা (ভীষ্মপঞ্চক সমাপ্ত)	১২ই বুধবার।
একাদশী	২৪ শে সোমবার।

পৌষ।

একাদশী	৯ই সোমবার।
একাদশী	২৫শে বুধবার।

মাঘ।

একাদশী	১০ই বুধবার।
পুষ্যাভিষেক	১৪ই রবিবার।
একাদশী	২৫শে বৃহস্পতিবার।

ফাল্গুন।

বসন্ত পঞ্চমী শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন	৩রা শুক্রবার।
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব (মাকরী সপ্তমী)	৫ই রবিবার।
ভৈমী একাদশী	৯ই বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব	১১ই শনিবার।
একাদশী	২৫শে শনিবার।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত (২)	২৮শে মঙ্গলবার।

চৈত্র।

একাদশী	৯ই শনিবার।
আমর্দ্দকী ব্রত (শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চন)	১০ই রবিবার।
শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা	১৩ই বুধবার।

(এই দিবসে ৪৩৩ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ।)

একাদশী	২৪শে রবিবার।

দ্রষ্টব্য :—(১) "শ্রাবণে শুক্ল পক্ষেতু একাদশ্যাদি পঞ্চকে, হিন্দোলোৎসবনং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গ মভীপ্সুনা।" ইত্যাদিবচনানুসারে গন্ধর্ব্বাচরিত পূর্ব্বাহ্ন প্রাপ্ত তিথি ধরিয়া লিখিত হইল। এতদ্দেশে ইহাই প্রচলিত।

(২) শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্ধা না হওয়ায় শিবরাত্রি ব্রত ২৭শে সোমবার হইবে।

বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিতা (যতি ধর্ম্ম পরায়ণা) বিধবা দ্বিজ পত্নীগণের এই বিধানে উপবাস করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রেম-প্রচার।

(লেখক।—পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।)

—:•:—

(১)

মরি কি মধুর নাম!
কলিজীবকুল-পাবন কোটী ভকত শান্তিধাম।
সেধে-কেঁদে সুধা বিলাইছে দেশে কৃষ্ণাগ্রজ রাম।
ভুবন ভাসাল প্রেমের যে ঢেউ,
সে গোপত প্রেম জানিত কি কেউ?
গোলোকে-ভূলোকে-চির-অগত নিতাই বিলাল' নাম;
নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি দেশ, প্রতি গ্রাম।

(২)

ছুটিছে প্রেমের বান।
নিতাই-কণ্ঠে মুরজ-মন্দ্রে উঠিছে মধুর তান।
সংকীর্ত্তনানন্দ-মগন পুলকিত শত প্রাণ।
সে অমিয়া-পানে ভুবন তুষ্ট,
ভকত-চকোর পরম পুষ্ট,
সকলি হৃষ্ট, কেবলি রুষ্ট পরম কঠোর প্রাণ
জগাই-মাধাই জাগ্রত পাপ—জগতে মুর্ত্তিমান্।

(৩)

মল্ল মাধাই ওই!
ঝলক-স্বরে ভলক-করে হাঁকিছে—"জগাই কই!"
হস্তে দণ্ড অতি পাষণ্ড মল্ল মাধাই ওই।
নীরব পাখীর শাখী-শাখে গান,
ছুটে না হর্ষ পরশি' বিমান,

নীরব সকলি নদীয়া-নগরে জগাই-মাধাই বই।
নীরব নদীয়া নীরবে কহিছে—"জগাই-মাধাই ওই।"

(৪)

কঠিন কঠোর প্রাণ

যমের দোসর জগাই-মাধাই নাহি মানে ভগবান্।
দম্পতী ভীতি কম্পিত-শত ভক্ত-ভজন গান।

সভয়ে কাতরে কাঁপিল ধমনী,
নীরবে প্রকৃতি কাঁদিল অমনি,

নীরব তুর্য্য, নীরবে সূর্য্য অস্ত অচলে যান্।
কঠিন—কঠিন মাধাই রে তোর বজ্রকঠিন প্রাণ।

(৫)

উঠে না আর গো রোল ;—

মুরলী কণ্ঠে মধু মৃদঙ্গে মধুমাখা হরিবোল।
নীরব আজিরে মন্দিরে মধু-মন্দিরা বীণা খোল।

শুধু সে দয়াল হরিনাম গায়,
যাচিয়া সাধিয়া করুণা বিলায়,

পাতকী মাধাই করিছে প্রহার, নিতাই দিতেছে কোল।
মার খায় আর করুণা বিলায়, মুখে বলে—"হরি বোল।"

(৬)

রক্ত-মাখানো গা'।

মারিছে মাধাই,—ধরিছে নিতাই জড়ায়ে তা'দের পা।
বলে—"ও মাধাই! দয়া ক'রে ভাই, একবার 'নাম' গা'।"

ফুকারে নিতাই—"মারিবি রে মার্—
মুখে 'নাম' শুধু বল্ একবার,

ব'লে বিনা-মূলে কিনে নে রে মোরে, একবার ফিরে চা'।"
(তবু) ষণ্ড দু'জনা দণ্ড লইয়া পৃষ্ঠে মারিছে ঘা।

(৭)

জগাই দাপে জগৎ কাঁপে, হেথায় প্রভু দরদী
নিতাই তরে উচ্ছ্বাসভরে উঠিল মরি কাঁদিয়া।
আসিল তবে তথায় যবে পাবক প্রেমপয়োধি,
তখনো প্রেম বিলাতে ছিল নিতাই তারে সাধিয়া।

(৮)

আইল নিমাই, ভাই-দুইজন পাইল দিব্যশিক্ষা;
ফুটিল চক্ষু, দুটি বুভুক্ষু, পে'ল প্রেমসুধা ভিক্ষা।
লভিল দীক্ষা, প্রেম, তিতিক্ষা, দুইটি পাতকী ভাই;
ঈশ্বরে করে বিশ্বাস, নমি' বিশ্বপতির পায়।

(৯)

বিস্মিত হেন দৃশ্য দেখিয়া—মাধাই ধরিল পা'
—গৌরবরণ "গৌর" অঙ্গে লেগেছে যতেক ঘা।
—গৌড়দেশের গৌরবরবি ভাতিল নদীয়া গায়!
ভক্ত তখন মুক্তকণ্ঠে 'নামের' মহিমা গায়।

(১০)

মরি কি অদ্ভুত তব প্রেম-পরচার!
হে দয়াল! নিতাই সুন্দর!
মার খেয়ে প্রেমধন বিলাইলে হায়!
উদ্ধারিলে কত নারী নর!
প্রেম সে পরশমণি পরশি বারেক
কত লোহা হ'য়ে গেল সোনা!
জগাই-মাধাই পাপী ভাই দু'জনার
ঘুচাইলে ভবে আনাগোনা।
আমরি করুণা তব করুণাবতার!
কীর্ত্তি তব রহিবে অক্ষয়।
স্মরি' এ অপূর্ব্ব তব 'প্রেমের প্রচার'
বিশ্বভরি' গাবে তব জয়!

কাম ও প্রেম।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার সরকার।)

—:•:—

কাম ও প্রেম নামে যে দুইটী বিষয় আছে তাহার অর্থ ভিন্ন হইলেও আজ কাল অধিকাংশ স্থলে একমাত্র রমণ, ব্যাভিচার পূর্ণ অশ্লীলতায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু প্রেম শব্দের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেমের অভ্যন্তরে যে এক মধুর স্বাদ যুক্ত রস নিহিত আছে তাহা আনুধাবন করিতে পারিলে সেই রসে চিত্ত দ্রবিভূত হইয়া সমস্ত প্রকার ভেদ, ভ্রম, দূরিভূত হইয়া যায়। আর কাম—কাম প্রেম হইতে এক স্বতন্ত্র বস্তু। মায়িক জগতে ইহাই ব্যভিচার। ইহাই রতি অর্থে আজ কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু। ইহার মধ্যে কামই সর্ব্বপ্রধান। এই কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। কামনার আতিশয্যে লোভ, এই দুর্দমনীয় কাম হইতে জ্ঞান আবরিত হইলেই দেহি বা মানব মোহ জালে আচ্ছন্ন হয়। ইহারই প্রাবল্যে জীব মদগর্ব্বে গর্ব্বিত বা উন্মত্ত হইয়া পড়ে। মদ হইতে মাৎসর্য্য ভাব বা পরশ্রীকাতরতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দুর্জ্জয় কামই ইন্দ্রিয়ের নেতা আর মানব ইহা হইতেই ধ্বংশের পথে অগ্রসর হয়।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভব।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহ বৈরিণম॥" (গীতা ৩।৩৭)

"এই কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, ইহা কিছুতেই পূরণ হয় না, ইহা অতিশয় উগ্র (মহাপাপ) ইহাকেই এ সংসারের পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।" এই কাম ও ক্রোধের প্ররোচনায় জীব যাবতীয় পাপ কার্য্য করিয়া থাকে, ক্রোধ, কাম হইতে পৃথক নহে, কারণ কাম বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ রূপে পরিণত হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। জগতে যত বস্তু আছে সমস্ত পাইলেও কামনার উদর কিছুতেই পূর্ণ হয় না—ইহা দুষ্পূরণীয় ও মহাপাপ

স্বরূপ। যখন আমার কিছুই ছিলনা যখন দারিদ্রের ভীষণ কষাঘাতে—ক্ষত বিক্ষত দেহে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম—তখন মনে করিতাম যদি কোন প্রকারে পঁচিশটী টাকা আয় হয় তাহা হইলে একরূপ চলিতে পারে কিন্তু যেমন পঁচিশটী টাকা আয় হইল, অমনি বাসনার লেলিহান শিখা ইন্ধনের অন্য ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল। আবার তখন মনে হইল যদি আর পাঁচ টাকা বৃদ্ধি হয় তবে বেশ চলে, যদি তাহাও হইল—আরও পাঁচ টাকা—হায়! ক্রমেই আশা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে লক্ষপতি কোটীপতি হইবার বাসনা—কামনার নিবৃত্তি কিছুতেই নাই—সদাই অভাব। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন না হইলে ক্রোধের উদয় হয়। কামনার অনল প্রবল হইয়া উঠে।

এখানে কাম কি—তাহাই ধারণা করা কর্ত্তব্য। বিষয় ভোগের ইচ্ছা কামনা। জীবের মধ্যে যে সঙ্কল্প বিকল্প উঠে সে সঙ্কল্প বিকল্প বৃত্তিই মন। মনের গতি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আবার ভেদে আধেয়ের পরিবর্ত্তন হয়। মনের নিকটে যখন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আসে তখন মন রূপ ভেদে আকার ধারণ করে। মনের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়াকে বৃত্তি বলে; ইহাই কাম। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদির ভোগের ইচ্ছা কামনা; আবার নিজের দেহকে সুন্দর রাখা, ফিট্ ফাট্ রাখা, স্রক্ চন্দন, বনিতা বিলাসে রাখা ইহাও কামনা। জীবের যে এ ইচ্ছা হয় ইহার মূলে একটা অজ্ঞান বা অবিদ্যা থাকে। এ অজ্ঞানের প্রভাব স্বরূপতঃ সুন্দর, যাহা স্বভাবতঃ রমণীয় দর্শন—অজ্ঞান তাহাকে ভুলাইয়া দেয়, যাহা সুন্দর নহে তাহাকে সুন্দর করিয়া চক্ষুর সম্মুখে ধরে তাই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি এত সুন্দর দেখায়। অজ্ঞানান্ধ জীবের ভোগের যে ইচ্ছা তাহাই কাম বা কামনা। কামনা মনের ধর্ম্ম, বহু প্রকারে মন বিষয়াকারে রূপান্তরিত হয়। অনবরত বিষয় চিন্তা করিলে বিষয়ে আশক্তি জন্মিবে, এই বিষয়াশক্তি বড়ই মধুর বড়ই প্রীতিপ্রদ। এই আশক্তি হইতে তৃষ্ণা জন্মে—এই তৃষ্ণার নাম কাম বা কামনা। প্রতিহত হইলে যে জ্বালা হয় সেই জ্বালাই ক্রোধ। ক্রোধ জন্মিলেই মনুষ্য কার্য্যাকার্য্য বিচার শূণ্য হয় ইহাই মোহ; মোহ হইলে বুদ্ধি ভ্রংশ হয়—তখন বিষয় ভোগ রূপ সংসারে পতন হয়।

"ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং।" (গীতা ৩।৩৮)

"যেমন বহ্নি ধূম দ্বারা, মল দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয় তদ্রূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।"

মন বিষয় ভোগ রূপ সংসারে গিয়া পড়িলে বিষয়াদি অনুকূল হয়, তখন অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ যে বস্তুর উপর জন্মায় তাহাকে লইয়া মনে মনে নানা রূপ কল্পনা জল্পনা চলিতে থাকে—বুদ্ধি তখন বিষয় মদে কলুষিত হইয়া নিশ্চয় করিয়াছিল—বিষয় সেবা করা কর্ত্তব্য; জীব এই রূপে বিষয় কামনা করিল—আমার জায়া, আমার চিত্ত, আমার প্রাসাদ হউক। এই তীব্র অভিলাষ যেতু যে চিত্ত বৃত্তি তাহাই কাম। কাম মনের ধর্ম্ম—কাম সঙ্কল্প মূলক।

প্রথমে সঙ্কল্প পরে কাম। ইষ্ট সাধনের বাসনারূপ অজ্ঞান সম্ভূত সঙ্কল্প হইতে কাম বা ইচ্ছা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিত্ত বৃত্তি তাহাই কাম। এই কাম হইতে রজ, ক্রোধ হইতে তম গুণের উৎপত্তি। কাম কর্ম্মের কারণ এই জন্য কামের প্রাধান্য।

তুমি পরমা সুন্দরী কোন রমণীকে দেখিলে—তাহার রূপ, যৌবন, বিলোল কটাক্ষ, হাব, ভাব, বিলাস, বিভ্রম তোমার চক্ষে পড়িল; তখনি তোমার ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। প্রথম দর্শনে আত্মহারা হইলে—ক্রমে নিরন্তর তাহাকে চিন্তা করিতে লাগিলে কিম্বা মধ্যে মধ্যে আবার তাহাকে দেখিতে পাইলে, ফলে রূপজ মোহের সৃষ্টি হইল; তখন তুমি পতঙ্গের মত সেই রূপাগ্নিতে ঝাঁপ দিলে। এই মন সংকল্প যোগ—এই মনসিজ যোগ বৃত্তির নাম কাম। আমাদের পুরাণে কাম দেবতার একটী নাম মনসিজ। এই কামের বাস্তবিক বস্তু তন্ত্রতা নাই, আমাদের বক্তব্য বিষয় ভুত ষড়রিপুর মধ্যে অন্যতম বলবান। সংস্কৃত চন্দ্রোদয় নাটকে মোহের পক্ষে কামই প্রধান সেনাপতি।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখ মানব! তোমার এই কামের পরিপূরণের জন্য কত আগ্রহ, কত যত্ন! পরিণামের লাভালাভ বিচার কর, বর্ত্তমানের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা কর; যে বস্তুর জন্য তুমি লালায়িত সেই বস্তুর তন্ন তন্ন রূপে বিচার কর, দেখিবে কাম থাকিবে না—মন-সলিল হইতে উত্থিত বুদ্ বুদ্

মন-সলিলে মিলাইয়া যাইবে। এই কাম বর্ত্তমানে নানারূপ উৎকণ্ঠার জনক বহুবিধ যন্ত্রণার কারণ; তাহা দুঃখ কর ত' বটেই পরিণামে অনুতপ্ত, যন্ত্রণাপ্রদ ও বিপদ জনক। অসুন্দরকে সুন্দর ভাবা, দুঃখকে সুখ ভাবা, অজ্ঞানের কার্য্য; এই কাম অজ্ঞান সম্ভূত। এই অজ্ঞান সম্ভূত কামের উচ্ছেদই মানবের দেবত্ব। কামই মানবকে ক্রমে নিচের দিকে টানিয়া লইয়া যায়—নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে।

কামই যখন প্রবল ভাব ধারণ করে, তখন কুম্ভিরাদি সমাকীর্ণ কল্লোল-মালাময় নদ—তখন ইহা কি ভয়ঙ্কর! আবার ইহা যখন অপ্রবল ক্ষুদ্র তখন ইহা পঙ্কিল পল্বল মাত্র। আবার এই কামকে যথাশাস্ত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে সংযত ভাবে পরিচালিত করিলে পর ইহা সংশোধিত বিষের মত মানব জাতির তথা জগতের উপকারক বস্তু হইয়া থাকে। এই কাম আছে তাই সৃষ্টি প্রবাহ নষ্ট হয় না—কাম না থাকিলে জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গাদি জন্মিত না—জীব না থাকিলে সৃষ্টি ধারা থাকিত না—জগতে প্রলয়ের বিষান বাজিত। এই যথাশাস্ত্র সংযত ভাবে সেব্য সম্যক প্রযুক্ত কাম হেয় নহে। এই কামই আবার চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অন্যতম।

কামের প্রাবল্য এতই অধিক যে, মানব কামকে আপনার আয়ত্তে আনিতে পারে না বরং কামের আয়ত্তে আইসে, কামকে অত্যজ্য নেশার মত করিয়া বসে। কামের আস্বাদ লবণাক্ত কিন্তু লবণ জগৎ শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রেম স্বচ্ছতোয়া তটিনী! প্রেম-তটিনীতে কল্লোলের ভীষণ গর্জ্জন নাই হাঙ্গর কুম্ভীরের গমনাগমন নাই, ইহা নীরবে হৃদয়ে বহে, হৃদয়ের অভ্যন্তরকে সরস-কোমল দ্রবীভূত করিয়া দেয়। মালিন্য পাপ ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া তুলে; সেই পরিষ্কৃত দ্রবীভূত হৃদয়ে সহজেই পরমার্থ-জ্যোতি বা ভগবৎ কৃপা পতিত হয়। কাম যেমন উৎকণ্ঠা-কঠোর-সংকল্প কুচিন্তার প্রকৃতির জনক বলিয়া বর্ত্তমানে দুঃখ কর, পরিণামে নানা যাতনা ও কত বিপদের হেতু হইয়া থাকে, প্রেম কিন্তু কি বর্ত্তমানে কি পরিণামে সকল সময়েই মধুরতাময়—দুঃখ যন্ত্রনাময় কোন অবস্থাতেই নাই, প্রেম নিরাবিল আনন্দ, অখণ্ড শান্তি।

তবে 'পিরীত দুঃখের কারণ' বলিয়া কবিরা বলেন—তাহা আসল প্রেম নহে। সংসারিক প্রেম মাত্রেই কাম মিশ্রিত। অল্প হউক বেশী হউক সম্পূর্ণ কাম বর্জ্জিত প্রেম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মানব নিষ্কাম না হইলে তাহার প্রেম নিষ্কাম হইবে কি রূপে ? আর নিষ্কাম না হইলে সে প্রেম কাম মিশ্রিত।

কাম মানুষকে স্বার্থপর করে। প্রেম স্বার্থত্যাগী করে যে প্রেম, প্রেমপাত্রকে চক্ষুর আড়াল করিতে চায় না, প্রেম আরও দূরে থাকিলে জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ প্রতীত করায়, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম নহে। সে প্রেমে কাম-খাদ মিশ্রিত আছে। কাম যখন প্রেমের আসনে বসে আর আমরা কামের সেবক, সেই কামকে প্রেম বলিয়া সুখ্যাতি করি! কি অন্ধ ভ্রম—কি বিশ্বাস! তবে কদাচিৎ কাম-অঙ্গার স্তূপের মধ্যে প্রেম-হীরকও পাওয়া গিয়া থাকে।

প্রেম ভোগ চায় না। নিজেকে ভুলিয়া নিজের দুঃখ, সুখ, হিত, অহিত, ভুলিয়া যে প্রেম তাহাই আসল প্রেম। গোপিকাদের প্রেমই প্রেমের চরমোৎকর্ষ। সেই প্রেমের কোন ব্যবধান নাই, লজ্জা, ঘৃণা, নারীত্ব কর্ত্তব্য জ্ঞান সমস্তই প্রেম-খাতে পড়িয়া গিয়াছে। এ প্রেমে কামের পুতি গন্ধ নাই জ্বালাময়ী তৃষা নাই—কেবল স্নিগ্ধ, চন্দ্রকরের ন্যায় নির্ম্মল ও মধুর। দাম্পত্য প্রেম সাধারণতঃ খাঁটী প্রেম নহে। তবে আদর্শ সতী সাধ্বী কখন কখন যথার্থ প্রেমের উচ্চাসন দাবী করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত পুরাণে বিরল নহে। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ; তাই পত্নী গান্ধারী আপনার চক্ষু জন্মের মত আবদ্ধ করিয়া জন্মান্ধ হইয়া রহিলেন। প্রেম সম্বন্ধে ভাগবতে, পুরাণে, বৈষ্ণ সাহিত্যে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। আমার ন্যায় দীন লেখক এই কঠি বিষয় অধিক আর কি বুঝাইতে পারিবে! প্রেম যে কি তাহা বুঝান যায়না, অনুভবের জিনিষ। প্রেমরস যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহা কত মধুর, কত সুন্দর!! এই প্রেমফল যিনি লাভ করিয়াছেন তিনিই ধন্য—তাহার জন্ম সার্থক। আমরা কেবল কামের সেবা করিতেছি, প্রেমের মাহাত্ম্য কি বুঝি? আর কি বা বুঝাইব।

ভারতে ধর্ম্ম-বিপ্লব ও শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভাব।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র সরকার।)

—:০:—

আর্য্য ঋষিগণ বেদের বহু দেবতার মধ্যে বিষ্ণুকেই পরম দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বিষ্ণুকে পাইবার জন্য তাঁহারা উপাসনা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন :—

তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাং সঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

সামবেদ ২১০২৩

বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞ মূর্ত্তি এবং যজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়েবেনং। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

শাস্ত্র হইতে আরও অবগত হওয়া যায়—"স্বর্গ কামো যজেত"

অর্থাৎ সুখময় স্বর্গধাম পাইবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর। ইহার দ্বারা অনুমান হয় যে বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ যাজ্ঞিক বা বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গও ঈশ্বর প্রাপ্ত হইতেন। যজুর্ব্বেদীয় একটী মন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সে সময় অহিংসক মত প্রচলিত ছিল, তজ্জন্য যজ্ঞাদিতে পশুবধ প্রচলিত থাকা সম্ভব পর মনে হয় না :—

"মা হিংসী পুরুষং জগৎ।"

এবং মাষ ভক্ষনও নিষিদ্ধ হইয়াছিল :—

ন মাষাণাম অশ্নীয়াদ্ অযজ্ঞিয়া বৈমাষাঃ। (মৈত্রায়ণী সং (যজু)

ন মাষাণাম্ অশ্নীয়াদ্ অমেধ্যা বৈ মাষাঃ। (কঠাসং (যজু)

মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায় যে প্রসিদ্ধ ভারত যুদ্ধের পর সমাজে কলি প্রবেশ লাভ করে। মহাযুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এজগতে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি যতদিন স্বীয় পাদ পদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন ততদিন কলি ধরাতলকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—

যাবৎ স পাদ পদ্মাভ্যাং স্পর্শে আং বসুন্ধরাম্
তাবৎ পৃথ্বী পরিষঙ্গে সমর্থোনাভবং কলিঃ॥ (বিষ্ণু পুরাণ)

যে দিন ভগবান স্বর্গে গমন করেন সেই দিনই কলি আসিয়া উপস্থিত হয়।

যস্মিন কৃষ্ণোদিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যা নিবোধ মে॥
(বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৪।৪০)

এই কলির প্রভাবে বিষ্ণু ভক্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিপথ গামী হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে সমাজ অবৈদিক কার্য্যাদি এবং যজ্ঞাদিতে পশু হনন ইত্যাদি হিংসা প্রচলিত হয়। উহা নিবারণার্থে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সমাজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক দল জীব হিংসার সাপক্ষে এবং অপর দল উহার বিপক্ষে দাঁড়ায়। এই উভয় দলে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যোগ ছিল। মহাভারত ও বিষ্ণু পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুবংশের পর কোশলে ইক্ষাকুগণ, উত্তর ভারত ও মগধে শিশুনাগগণ রাজত্ব স্থাপন করেন। ইহার পর ব্রাহ্মণী ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি লোপ পাইয়া তৎ পরিবর্ত্তে পশুবধ ও হিংসাদি কার্য্য বৃদ্ধি পায় এবং বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠিত হয়। এমন সময় অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতা মাতা বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ স্বমত প্রচার করিয়া তপ জপ যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি নিবারণ করেন। বুদ্ধের সম সাময়িক মহাবীর জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কিয়দ পরিমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পোষকতা করেন। প্রায় ছয় শত বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনী প্রভাবে বৈদিক ও ব্রাহ্মণী ধর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ব্রাহ্মণগণ বড়ই নিরিহ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আক্রোশ প্রকাশের অবসর পাইলেন। শিশু নাগ বংশের পতন হইবার পর নন্দবংশের নয়জন রাজা প্রায় শতবৎসর রাজত্ব করেন তদনন্তর মৌর্য্যবংশের আবিভাব হয়। মৌর্য্যবংশের প্রথম নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত ৩৬৭ খৃঃ পুঃ সিংহাসনারূঢ় হন এবং প্রায় ২৪বৎসর মগধে রাজত্ব করেন তাঁহার সময়ে দেশের সর্ব্বত্র শিব ও বিষ্ণু মন্দির বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত নয়জন

মৌর্য্য নৃপতি ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। মৌর্য্য সম্রাট অশোক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তথাপি ব্রাহ্মণী ধর্ম্মের নেতা ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ "দণ্ড সমতা" ও "ব্যবহার সমতা" প্রচার ও জীব হিংসা রহিত করিয়াছিলেন। বলি প্রিয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ পূজাদিতে জীব হিংসা করিতে পাইতেন না তজ্জন্য তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের জন্য বদ্ধ পরিকর হন, কিন্তু অশোকের সময় তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটে নাই। অশোকের মৃত্যুর পর যখন মৌর্য্য নৃপতিগণ হীন বল হইয়া পড়িলেন তখন ব্রাহ্মণগণ প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের লোভ দেখাইয়া রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদ্বেষী ও পরম ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন, তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া অহিংসা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় সমাজ, ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারের নেতা হইলেন। শুঙ্গগণ ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। শেষ শুঙ্গাধিপ দেবভূতি তাঁহার মন্ত্রী কাণ্ব বাসুদেব কর্ত্তৃক নিহত হন।

কাণ্ববংশ। দেবভূতিকে হত্যা করিয়া বাসুদেব সিংহাসনে বসেন ও কাণ্ব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবভূতির হত্যাকাণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইলেও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল।

শকবংশ ও আন্ধ্র নৃপতিগণ সাম্যবাদী ছিলেন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কেই সমাদর করিতেন।

নাগবংশ। শক সম্রাট কনিষ্কের যত্নে "মহাযান" ধর্ম্মের সূত্রপাত হয় এবং নাগার্জ্জুনের যত্নে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠা হয়। সাতবাহন রাজা নাগার্জ্জুনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহাযান ধর্ম্মে গীতা ও উপনিষদের তত্ত্ব প্রচার থাকাতে আব্রাহ্মণ সাধারণ উহার আশ্রয় করেন। অহিংসা ও পুণ্যবাদ এই ধর্ম্মের মূল মন্ত্র।

গুপ্তবংশ। এই বংশের নৃপতিগণ ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। ৩১৯-২০ খৃঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে রাজস্ব বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্ম-

চারীগণ বৈদিক বিপ্রগণের পন্থাবলম্বন করেন। সমুদ্র গুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণী ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্তগণ বিষ্ণু উপাসক ছিলেন ইহাদিগের মধ্যে বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, যশোধর্ম্মই চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ছিলেন। ইনি শৈব হইলেও সকল ধর্ম্মের প্রতি সম সম্মান প্রকাশ করিতেন। গুপ্ত নৃপতিগণের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইতে থাকে এবং তখন রাজপুত নৃপতিবৃন্দ বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন তজ্জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল এমন সময়ে ৭৮০ খৃঃঅব্দে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। প্রায় ছয়শত বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত থাকায় ও নানা ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হওয়াতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রায়ই লোপ হইয়া আসিয়াছিল তজ্জন্য শঙ্কর বেদান্তমত প্রচার দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক মত খণ্ডন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের যত্ন করেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্ব হইলেও বৈষ্ণব ধর্ম্ম তখন প্রবল হয় নাই। তাঁহার সময়ে এদেশে সাধারণতঃ ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন এই ছয় সম্প্রদায় বৈষ্ণব ছিলেন :—

ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ ধর্ম্মহীনাঃ ষড়্বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥ (শঙ্কর দিগ্বিজয়।)

কিন্তু বৌদ্ধ ও শঙ্কর প্রভাবে এই সব বৈষ্ণব দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হয় নাই। শঙ্কর দ্বারা বেদ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার প্রভাবে শৈব মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তদনন্তর দ্বাদশ শতাব্দিতে রামানুজ স্বামীর আবির্ভাবে ভক্তি শাস্ত্র ও বৈষ্ণব মত বহুল ভাবে প্রচার হয় কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতিদিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় ও বহুকাল যাবৎ হিন্দুগণ বৌদ্ধ শূন্যবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতির সংস্পর্শে থাকাতে সাধারণের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির প্রভাব স্ফুরিত হইতে পারে নাই। অবশেষে প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চ নীচ সকলকে প্রেম ও ভক্তি বিতরণ করিয়া জগতকে মাতাইয়া তুলেন।

শ্রীশ্রীগৌর-ভগবান যে সময় আবির্ভূত হন তখন সাংসারিক লোক বিষয়-মদে মত্ত থাকিয়া তান্ত্রিক আচার ও উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন :—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ কৃপা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

তখন বঙ্গদেশে ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল :—

রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোকে সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণনাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে নাম মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে কন্যা পুত্রের বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থকাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
* * * *॥
না বাখানে যুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না কহে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেই নাহিক হরিধ্বনি॥
অতিবড় সুবুদ্ধি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চরায়॥
গীতা ভাগবত যে জন জানে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুলে করেন ব্যাখ্যান॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতার লইবার কারণ পাষণ্ড-দলন ও ভক্তি প্রচার :—

"পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥" চৈঃ চঃ মৃঃ।

পাষণ্ডী শব্দ বৌদ্ধ ও অনাচারীদিগের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে বৌদ্ধদিগের অবনতিকালে অশিক্ষিত ভিক্ষুক পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ বিস্মরণ হইয়া ধর্ম্মের অপলাপ করিতে থাকেন :—

"The faith had grown corrupt in the hands of illiterate priests. By the majority of the clergy and laity the ethics of Buddha's teaching had been forgotten. The simple story of his life had been so surrounded by legends and miraculous tales, that its significance was *obscured*. The divine honours paid to his relics, and the mysterious powers attributed to them and to his image were idolatrous practises utterly at variance with the true doctrine. In short, to all but a few the spirit of the faith was dead, and Buddhism, like Vedic Hinduism before it, had become a mere husk of religion."

DE LA FOSSE'S HISTORY OF INDIA.

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ গীতা।

বহু ধর্ম্ম বিপ্লবে হিন্দুদিগের মধ্যে জাতি বিচার বর্ণ বিচার ও ধর্ম্ম বিচার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল এমন কি লোক মধ্যে পরলোক ও ঈশ্বর বিশ্বাসও কম হইয়া পড়ে, প্রকৃত হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস হইয়া বৌদ্ধ ও যবন ভাবাপন্ন হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এ ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের ক্রিয়া কলাপাদি সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব ছিল তজ্জন্য শ্রীশ্রীগৌর-ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিলেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

পূর্ব্বে আজ্ঞা বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ চৈঃ চঃ মৃঃ।

এই বিশাল জগত কর্ম্মক্ষেত্র হইলেও এবং বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কাণ্ডই প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও, সে সময় লোক সমূহ কর্ম্মহীন হইয়া ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং শ্রীভগবানের অমৃত বাণী :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥" গীতা ১৮।৬৬।

বিস্মরণ হইয়া বহু ধর্ম্মের ও উপধর্ম্মের সেবা পরায়ণ হইয়াছিল। ভৃত্য যেমন প্রভুর জন্য কর্ম্মকরে সেইরূপ ভৃত্য মনুষ্যদিগকে ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা উচিৎ, কিন্তু সে সময় ভক্তি ও বিশ্বাস হীন ব্যক্তির হৃদয়ে এভাব কি প্রকার উদয় হইতে পারে তজ্জন্য ভগবান সর্ব্বকর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ম্মফল) ত্যাগের অনুমতি দিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া।"

অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সাধুসঙ্গের ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস :—

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥" চৈঃ চঃ মৃঃ।

শ্রীশঙ্করের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হইলেও তাঁহার শিক্ষায় পরমমাধুর্য্যময় প্রেমময় সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের বিশাল মূর্ত্তি মনুষ্য হৃদয়ে

অঙ্কিত হইতে পারে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ত্রিতাপ হারিণী মূর্ত্তি সাধারণকে দেখাইবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলকে ভক্তি সাধনের অধিকারী করিলেন। ভক্তি শব্দের অর্থ :—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" শাণ্ডিল্য।

অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তিই ভক্তি নামে অভিহিত। যদি শ্রীভগবান নবদ্বীপে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে আজ হয়ত হিন্দুধর্ম্ম শত ভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতে প্রভূত হিন্দুর সংখ্যা কম হইয়া পড়িত। এবং নাস্তিকতার প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কেবল ৪৮ বৎসর মর্ত্তধামে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ২৪ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে, ১৮ বৎসর নীলাচলে, এবং ৬ বৎসর গমনাগমনে অতিবাহিত করেন। তাহার প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিস্তার, কৃষ্ণ প্রেম প্রচার এবং বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার হইয়াছিল :—

"আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুই শাখায় প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাঁরা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্র দৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার॥

যমুনার দক্ষিণ তটে মথুরা বা মধুপুরী অবস্থিত। ইহা অবিমুক্ত ধাম :—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা সিদ্ধি দায়িকা॥"

বাল্মিকীর রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে দেবাদিদেব মহাদেব মধুদৈত্যের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক অজেয় শূলাস্ত্র প্রদান করেন। মধুদৈত্য মহাদেবের বরে অজেয় হইয়া এই পুরীতে বাস করিতে থাকেন, এবং সময়ে উহা মধুপুরী বা মথুরা নামে প্রসিদ্ধ হয়। শত্রুঘ্ন, মধুর পুত্র লবণাসুরকে বধ করিয়া মথুরা এবং তৎ সন্নিহিত স্থান সমূহে আর্য্য নিবাস স্থাপন করেন।

এবং মধুবরং লব্ধা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
ভবং ভবং সোহসুর শ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্॥

উত্তর কাণ্ড ৭৪।১৫

প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্।
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নির্ম্মিতা॥
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মেহস্তু বরঃ পরঃ।
তং দেবাঃ প্রীত মনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্।
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা সুরসেনা ন সংশয়ঃ।
তে তথোক্ত্বা মহাত্মানো দিবমারু রুহস্তদা॥

উত্তর কাণ্ড ৮৩ অঃ।

আর্য্য শূরসেন জাতি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করায় মধুপুরীর নাম শূরসেনা হয় কিন্তু মহাভারতের সময় হইতে "মধুরা" 'মথুরা" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন মথুরা শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসাদিত হইয়া "মধুবনে" পরিণত হয় কিন্তু কৃষ্ণভক্ত শূরসেনাধ্য যাদবগণের সময় ঐ শেষ প্রধান স্থান বিষ্ণু ভক্তিতে প্লাবিত হয়। সম্রাট অশোকের সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে এবং শাকরাজ বৌদ্ধ কনিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবে মথুরার অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় হীনবল হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা হিয়ান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তৎকালে ব্রজ মণ্ডলে ২০টী সঙ্ঘারাম ও তিন সহস্র বৌদ্ধ ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রজ মণ্ডলে বৌদ্ধ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ৭ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হুএন্ ৎ-সাঙ তথায় বৌদ্ধ প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন। ৮ম শতাব্দীতে কাণ্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার দ্বারা তথাকার বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং সে সময় প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতিগণের সাহায্যে ব্রজধাম পুনরায় স্বর্গধামে পরিণত হয় কিন্তু এ অবস্থা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই দুর্ভাগ্য ক্রমে অর্থ পিশাচ লুব্ধ সুলতান মহম্মদ গাজনী ১০১৭ খৃ মথুরা আক্রমণ করেন এবং প্রায় কুড়িদিন যাবৎ মন্দির এবং দেবমূর্ত্তি ধ্বংশ অগ্নি সংযোগে গৃহ পল্লী দগ্ধ করণ, নরহত্যা এবং লুণ্ঠন কার্য্য চলিতে থাকে। তদনন্তর ১৫০০ খৃ সুলতান সিকেন্দার লোদী মথুরাকে জনশূন্য ও ভগ্ন রাখিতে

পরিণত করেন। মথুরা আবার মধুবনে পরিণত হইল। ব্রজবাসীগণ সর্ব্বদা যবন ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময়ে দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপন হইলেও ব্রজবাসীদিগের হৃদয় হইতে ম্লেচ্ছ ভয় বিদূরিত হয় নাই,—

অন্নকূট নাম-গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥
একজন আসি রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পলাহ গ্রামে না রহ একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ্‌ আসিবে কাল যবন॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল॥
বিপ্র গৃহে গোপালের নিভৃত সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ম্লেচ্ছ ভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥

* * *

ম্লেচ্ছ ভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা।

সুলতান মহম্মদের অত্যাচারে বহু হিন্দু তীর্থ নষ্ট হইয়া যায় উহার মধ্যে সোমনাথ ও মথুরা প্রধান। সোমনাথ লুণ্ঠন সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠকগণ সমস্ত অবগত আছেন। এবং মহাপ্রভু স্বচক্ষে ভগ্ন চিহ্ন সকল দেখিয়া বিশেষ পরিতাপ করিয়াছিলেন :—

প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে যাই।
ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌঁছাই॥
নাহিক পূর্ব্বের শোভা নাহি সে মন্দির।
দুঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বহে নীর॥

ঢিবি ঢাবা ভাঙ্গা চিহ্ন আছে সেইখানে।
দেখিয়া আঘাত বড় লাগিল পরাণে॥
মন্দির বাড়ীর শোভা গিয়াছে চলিয়া।
ইহা দেখি প্রভু মোর আকুল কাঁদিয়া॥
কান্দিয়া আমার প্রভু বলিতে লাগিল।
দুরাত্মা যবন আসি কি দশা করিল॥
কোথা লুকাইলে প্রভো যবনের ভয়ে।
একবার দেখা দিয়া জুড়াও হৃদয়ে॥
হায় হায় ইহ দুঃখ কহনে না যায়।
সোমনাথে উদ্দেশিয়া কান্দে গোরারায়॥

গোবিন্দ দাসের করচা।

মথুরা দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে প্রায়ই মুসলমান অত্যাচারের অধীন হইত তথাপি এখানে বৈষ্ণব প্রভাব কখনও নিস্প্রভ হয় নাই। মহম্মদের লুণ্ঠনের পর মথুরা আবার প্রধান বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রাম নিবাসী গীত গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী বৃন্দাবন দর্শনে আগমন করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গ, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়া মথুরা পুরীকে মহা তীর্থে পরিণত করেন। তাঁহার আগমনে মধু পুরীর লোক সমূহ, বৃক্ষ লতা, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী আনন্দে বিভোর হইয়াছিল :—

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধু পুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষ সঙ্খ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু। বোল হরি হরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান॥

স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘ বিষ্ণু, ভুতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিল সকল॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেইত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি লৈল॥
মধুবন তাল-কুমুদ-বহুলা-বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
পথে গাবীঘটা চরে—প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি হুঙ্কার করিয়া॥
গাবী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাবী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডূয়ন।
প্রভু সঙ্গে চলে,—নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগী পাল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে॥
(অঙ্গের সৌরভে মৃগ-মৃগী শৃঙ্গ উঠে।
কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে॥)
পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ।
অঙ্কুর পুলক, মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত-বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥
তা-সভার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সভাসনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥

প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
"কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল" বোলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥

চৈঃ চঃ মৃঃ মধ্যলীলা।

এই প্রেমের অবতার সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিয়া ব্রজবাসীগণ উন্মত্ত হইয়া মধুর হরিনামে ব্রজ মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রজধাম স্বীয় প্রভাব চিন্তায় তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীকে দীক্ষা প্রদান করিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ করেন। তদন্তর তিনি অগ্রপে (আগ্রা) ও কাশী ধামে যাত্রা করেন, এবং কাশী হইতে সনাতন গোস্বামীকে মথুরা প্রেরণ করেন :—

নীলাম্বর দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বল ভদ্র কেন তাঁরে মথুরা-বাহির।
গঙ্গাতীর পথে লৈয়া প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ আসিয়া প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥
শ্রীরূপের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারানসী আগমন॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুইমাস রহি তাঁর করাইল শিক্ষণ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তি বল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেল নীলাচল॥

চৈঃ চঃ মৃ মধ্যলীলা।

শ্রীরূপ বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ফতেয়া বাদের অধিবাসী মুকুন্দের মধ্যম পুত্র সনাতন শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ এবং বল্লভ কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ১৪৮৮ খৃ

সনাতনের ও ১৪৮৯ খৃ শ্রীরূপের জন্ম হয়। শ্রীরূপ ও সনাতন গৌড়াধিপ হুসেন সাহের রাজ সরকারে উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন :—

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর।
উজীর আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎসার॥
দবীর খাস নাম আর সাকর মল্লিক।
খেতাব দোঁহার সর্ব্বখেতাবে অধিক॥

ভক্তমাল

শ্রীরূপ অল্পদিনই রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বৈরাগ্যের উদয়ে তিনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ব্রজ মণ্ডলে গমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন। তিনি গোবিন্দদেবের বিগ্রহ ও বৃন্দাদেবীর মন্দির উদ্ধার করেন। ভক্তি রত্নাকরে উল্লেখ আছে ;—

লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে।
শ্রীরূপ গোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে॥

শ্রীরূপ জগৎ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য মিঞা তানসেনের দীক্ষা গুরু ছিলেন। সম্রাট আকবর প্রায়ই শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য বৃন্দাবন গমন করিতেন এবং তাঁহার উপদেশের সারাংশ লইয়া "তোহেদে এলেহি" নামক এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীরূপের পর সনাতন রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। ভক্তমালে উক্ত হইয়াছে :—

প্রথমে শ্রীরূপ গেল বিষয় ছাড়িয়া।
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥
শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন॥
রাজ কর্ম্মে নাহি জান বিরলেতে বসি।
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥
পাৎসা ডাকিবারে লোক পাঠাইলে কহে।
কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥

পীড়া শুনি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
বৈদ্য আসি পরখিয়া সুস্থ দেখি গেলা॥
সুস্থ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া।
আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া।
বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া॥
রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ তুমি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হৈয়া গেলা।
তুমিহ তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হইতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥
দৈবাৎ চলিলা রাজা দক্ষিণ দেশেতে।
কোন প্রতিযোগি সনে বিগ্রহ করিতে॥
হেথা বন্দিখানার যে প্রধান যবন।
তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন॥
আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈনু।
তার প্রত্যুপকার মোর কিছু কর অনু॥
মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ।
গোসাঞি তরাবে তব বাপদাদা সহ॥
আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ।
ধর্ম্ম অর্থ লাভ হবে যদ্যপি করহ।
জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি।
কিন্তু যে তস্কর হৈলে প্রাণে পাছে মরি॥
তেঁহ কহে ভয় কি যুকতি আছে ভাল।
রাজারে কহিবে তেঁহ জলে প্রবেশিল॥

গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে।
ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে ॥
এ দেশে না রব মুণ্ডি হৈয়া দরবেশ।
দেশান্তরে যাব রাজা না পাবে উদ্দেশ ॥
তথাচ যবন-মন প্রসন্ন নহিল।
তবে আর কিছু মনে যুকতি করিল ॥
সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে।
ধরিলা যবন সেই মুদ্রা অনুরাগে ॥
খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা।
ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিলা ॥

সনাতন শ্রীরূপের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ॥
তুমিহ করিহ ভক্তি রসের বিচার। (প্রচার)
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি-স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥

চৈঃ চঃ মৃঃ মধ্যলীলা

সনাতন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বহু লুপ্ত তীর্থ ও বিগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন :—

মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে ॥
"মথুরা মাহাত্ম্য" শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ॥

চৈঃ চঃ মৃঃ মধ্যলীলা

সনাতন মদন মোহনের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মুলতান দেশীয় বণিক কৃষ্ণদাস দ্বারা এই বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-

দেব প্রেরিত রূপ, সনাতন, ও লোকনাথ গোস্বামী ব্রজ মণ্ডলে প্রায় সমস্ত লুপ্ত তীর্থ ও বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। ব্রজ মণ্ডলে যে সকল বন আছে তন্মধ্যে ১২টী বন প্রধান :— •

প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ।
ভদ্র শ্রীলোহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদীরকাঃ॥
বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
দ্বাদশৈতা বন সংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে॥

(পদ্ম পুঃ পাতাল ৩৮।)

এ সকল বন সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচিত্র মৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ুর ভ্রমরং কূজৎ কোকিল শাবকম্॥

অধুনা এসব বন প্রকৃত পক্ষেই মহারণ্যে পরিণত এবং পুরাণ বর্ণিত কাব্য রাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বহু বন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে ৩৩৩টী বন উদ্ধার করিয়া উহাদের স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। ব্রজ মণ্ডলে বৌদ্ধ, জৈন, শৌর, শাক্ত, শৈব প্রভাবের পরও মুসলমান অত্যাচারে বহু হিন্দু কীর্ত্তি লোপ পায় কিন্তু গ্রাউস সাহেবের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রভাবে ব্রজ মণ্ডল আবার শ্রীযুক্ত হইয়াছে।

"The first named community (Bengali or Gauriya Vaishnavas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founded of the Sect, whose immediate disciples were its first temple builders." Page 183, Mathura a district Memoir by F. S. Growse, B. C. S. 1880."

মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্মের পৃষ্ঠ পোষক হইলেও তিনি সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি উদারভাব ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। নাম সাধনই তাঁহার উপদেশের মূল মন্ত্র। তিনি—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল নামামৃত বিতরণ করিয়া জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই নাম প্রভাবে বহু শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, যবন প্রভৃতি তাঁহার পদানত হইয়াছিল এমন কি দস্যু, তস্কর, লম্পট, কপটও ছিল। দাক্ষিণাত্য তিনি যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। এক পান্থভীল নামক দস্যুপতিকে আর স্থলে এক চোনন্দী বনে গিয়া নারোজীকে মধুর হরিনামে উন্মত্ত করেন :—

পাপ কর্ম্ম ছাড়ি পায় প্রভুর কৃপায়।
হরিনাম করি সদা নাচিয়া বেড়ায়॥
লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি।
আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্ন্যাসী॥
যত দস্যু ছিল বনে সকলে মিলিয়া।
হরি হরি ধ্বনি করে কুকর্ম্ম ছাড়িয়া॥
সবে মিলি সেই বনে আনন্দে মাতিল।
প্রভু লাগি পাপ কর্ম্ম সকলে ছাড়িল॥
পান্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া।
চলে মোর ধর্ম্ম বীর আনন্দে ভাসিয়া॥

* * *

নারোজী কহিলা সব তীর্থ দেখাইব।
তীর্থে তীর্থে আপনার পেছনে যাইব॥
এতদিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তি ধূমে।
আজি হৈতে অস্ত্র ফেলিলাম ভূমে॥
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি।
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি॥
আর না রহিব মুই ডাকাতের পতি।
কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি॥
জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া।
পাপে দেহ জর জর না দেখি ভাবিয়া॥

ক্রমশঃ।

(ভক্তি, পঞ্চদশবর্ষ, ১২শ সংখ্যা, শ্রাবণ মাস, ১৩২৪।

"বর্ষশেষে বক্তব্য।"

"ভাবুক কবি গাহিয়াছেন;—"দিন যাবে, রবেনা।
সুখে দুঃখে যাবে দিন, রবে মাত্র ঘোষণা॥"

সময় হু হু করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ব্যথিতের কাকুতি মিনতি, ধনীর প্রভূত অর্থ ব্যয়, ভীম-পরাক্রমশালীর আস্ফালন এ সব কিছুতেই সময়কে ধরিয়া রাখা যায় না, কেহ তাহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, কেহ তাহার সৎ ব্যবহার করুক আর নাই করুক, সে যে একটানা স্রোতে চলিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। যাঁ'র হুকুমে সময় এমনি করিয়া চলিয়াছে তাঁ'র হুকুমে, তাঁ'র অপরিসীম করুণাবলেই তাঁ'র শ্রীচরণাশ্রিতা "ভক্তি" আজ নানারূপ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আর একটী বর্ষ পূর্ণ করিয়া ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এখন আর "ভক্তি" নাবালিকা নয়, পূর্ণ বয়স্কা। যদিও সেরূপ হাবভাব, সেরূপ বেশ পরিপাটী সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তজ্জন্য সর্ব্বদাই তিনি দুঃখিত। এবং তাঁহার সেবকবৃন্দকে সর্ব্বদাই তজ্জন্য উৎপীড়ন করিতেছেন। আর তাহা হওয়াও উচিত।

কিন্তু করিলে হইবে কি, তাঁর সেবকবৃন্দ যে চিরকাঙ্গাল। শ্রীগুরুদেবের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম "ভক্তি সর্ব্ব-সম্পদ-দায়িনী।" এ সর্ব্ব-সম্পদ অর্থে অন্যে যাহাই বুঝুন, যাহাই বলুন, আমি কিন্তু বুঝি সর্ব্ব-সম্পদাধার শ্রীমতী লক্ষ্মী সেবীত, ব্রহ্মাদি দেব বাঞ্ছিত সেই ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চরণ দু'খানি। ভক্তি-দেবীর সেবা করিয়া যদি এই সম্পদ পাওয়া যায় তবে আর অন্য সম্পদ বাঞ্ছা করে কে?

আর এককথা;—নিজে ভজন সাধন করিয়া উন্নত হইব সে আশাতো নাই-ই, তবে পাঁচজনের প্রাণের ভাব লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া যদি কিছু হয় সেই ভরসায় অতিশয় অযোগ্য দীনাতিদীন হইয়াও দুর্ব্বল প্রাণে ভক্তি দেবীর চরণ

প্রান্তে পড়িয়া আছি। পাঁচজনে ভালবাসিয়া, পাঁচজনে দয়া করিয়া যাহা দেন তাহা লইয়া যদি অবিরত ঠেলা পাড়া করা যায় নিশ্চয়ই কিছু হইবে এই ভরসাও যে প্রাণে নাই তাহা নহে। তবে মধ্যে মধ্যে ভক্তির যথার্থ উপযুক্ত সেবকগণকে কৃপাদানে কৃপণ দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাই, তাই মধ্যে মধ্যে হতাশ হইয়া পড়ি।

যাউক, যাহা হইবার হইবে, এখন দু'টো কথা যা বলিবার জন্য উপস্থিত তাই বলিয়া আপনাদিগকে অবসর দিতে পারিলেই যথেষ্ট। দৈন্য করিয়া বা লোকের মনরক্ষার জন্য বলা নয়, প্রকৃত পক্ষেই আমরা দীন—কাঙ্গাল। তার উপর আবার বর্ত্তমান বৎসরে যুদ্ধ বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির দুর্ম্মূল্যতার জন্য, ইচ্ছা থাকিলেও মনের মতন করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য অন্যান্য অনেক কাগজের ন্যায় একেবারে তুলিয়া না দিয়া তবুও যে চিহ্ন মাত্রও প্রকট রাখিতে পারিয়াছি ইহাই শ্রীভগবানের অপরিসীম দয়া এবং ভক্ত গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টি। আশা করি এরূপ কৃপা বিতরণ করিতে ভক্ত গ্রাহকগণ কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। তারপর ১৫শ বর্ষ হইতে ভক্তির মূল্য বৃদ্ধির কথা।

আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, ভক্তি যতদিন চলিবে মূল্য বৃদ্ধি করিব না, কিন্তু যখন দেখিলাম কাগজের মূল্য তিন গুণেরও বেশী হইল, যে কাগজের দর পূর্ব্বে ২৸০ আনা ছিল তাহা যখন ৮৲ টাকা ৮৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিল তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। কয়েক জন ভক্তির গ্রাহককে জিজ্ঞাসাও করিলাম যে, "আরতো পারিনা সুতরাং এবারে ভক্তি বন্ধ করিয়া দিব কি না?' তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"কখনই না, আপনি ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি করুন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু ভক্তি বন্ধ করিতে পারিবেন না।" এইরূপ উৎসাহ পূর্ণ বাক্যে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া আমরা ১৲ এক টাকা স্থলে ১৷৷০ দেড় টাকা বাৎসরিক মূল্য ধার্য্য, করিয়াছি। এমন কি অনেক সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দ আপনাপন বন্ধুগণের মধ্যে বর্দ্ধিত মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকাতে গ্রাহক সংগ্রহও করিয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেন।

অবশ্য অন্য সময় হইলে এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি বোধ হয় হইত না। আর যদিও হইত তবে অন্ততঃ আর ২ফর্ম্মা ভক্তির আকার বৃদ্ধি করিয়া লইতে

পারিতাম, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ বিভ্রাট যতদিন না মিটিয়া যায়, যত দিন না আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুলভে কাগজ ও অন্যান্য মুদ্রণ সরঞ্জামাদি পাওয়া যায় ততদিন ইচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারিতেছিনা। তবে যখনই সুবিধা হইবে তখন হইতেই যে আমরা আকার বাড়াইয়া "ভক্তি" প্রকাশ করিতে পারিব এ আশা যথেষ্ট আছে।

পূর্ব্বে যে খরচে একমাসের কাগজ ছাপা হইত এক্ষণে কোন কোন মাস তাহার তিনগুণ খরচ দিয়াও ছাপিতে হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সকল সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, আমরা কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া গ্রাহকগণকে কাগজ দিয়া থাকি।

যদিও এ বৎসর ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি আশা করি আমাদের অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তির পাঠকগণ ভক্তিকে রক্ষা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। আশা করি সকলেই আপনাপন দেয় আগামী ১৬শ বর্ষের সাহায্য অগ্রীম পাঠাইয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন। আর যদি কাহারও টাকা পাঠাইতে অসুবিধা বোধ হয় তবে আমাদিগকে জানাইলে আমরা যথাক্রমে যথানিয়মে ভিঃ পিতে পত্রিকা পাঠাইতে পারি। যদি আপত্তি থাকে তিনি ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক এই দুঃখের সময় আর ক্ষতি গ্রস্থ করিবেন না। আমরা ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যদি টাকা বা নিষেধ সূচক কোন পত্রাদি না পাই তাহা হইলে বুঝিব কোন আপত্তি নাই এবং ১১ই হইতে ভিঃ পি করিতে আরম্ভ করিব গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সর্ব্বশেষে গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন তাঁহারা যেরূপ ভাবে এতদিন ভক্তিকে ভালবাসিয়া আসিতেছেন, যেমন ভাবে সাহায্য করিতেছেন আগামী বর্ষেও যেন তাঁহাদের ভালবাসা হইতে ভক্তি বঞ্চিতা না হন। বর্ষশেষে সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট আমাদের ইহাই বক্তব্য। অলমিতি।

বিনীত—বৈষ্ণব দাসানুদাস

ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতে ধর্ম্মবিপ্লব ও শ্রীগৌরাঙ্গ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

এত বলি দস্যুপতি সব তেয়াগিয়া।
চলিল প্রভুর সঙ্গে কৌপীন পরিয়া॥

(গোবিন্দ দাসের করচা।)

চণ্ডপুর ছাড়িয়া প্রভু যখন দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে একটী ব্যাঘ্র জল পান করিতেছিল, উহা দেখিয়া গোবিন্দ দাস বলিতেছেন :—

ইঙ্গিত করিয়া ব্যাঘ্র প্রভুরে দেখাই।
ভাল মন্দ প্রভু মুখে শুনিতে না পাই॥
জল পান করিতেছে ব্যাঘ্র সেই স্থানে।
প্রভু পার্শ্বে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে॥
চলিলা ডাইনে গোরা ব্যাঘ্র রাখি বামে।
আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরি নামে॥
ফিরে না চাহিল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি।
পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি॥
মোর ভাবগতি দেখি ঈষৎ হাসিয়া।
বলে প্রভু ভয় কর কিসের লাগিয়া॥
হরিনাম বলিলে নাহি রহে যমভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়॥

প্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন তখনকার কথা :—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥

নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডারশূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করি আছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে—"কহ কৃষ্ণ" ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান।
মত্ত-হস্তি যুথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জল কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
"কৃষ্ণ কহ" বলি প্রভু জল ফেলি যাইলা॥
সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার গায়।
সেই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায়॥"

চৈতন্য চরিতামৃত।

এইরূপ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আর কত বলিব ইহাই তাঁহার প্রভাব এই প্রভাবে আজ সমস্ত জগৎ মুগ্ধ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ।

(শ্রীনবদ্বীপ-লীলা।)

লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী।

—:•:—

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের তিরোভাবের কথা কিছু বিশেষ করিয়া বর্ণনা করেন নাই। কারণ ইহা বিশেষ দুঃখের কথা। লিখিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ—

দুঃখ রস এ সকল বিস্তারি কহিতে।
দুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে॥

তিনি সংক্ষেপে এই দুঃখ কাহিনী তিনটি শ্লোকে লিখিয়া গিয়াছেন যথা :—

হেন মতে কথো দিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্ধান হৈল নিত্য সিদ্ধ কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিল বিস্তর।
দশরথ বিজয়ে যে হেন রঘুবর॥
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর * জীবন॥

পিতৃবিয়োগে প্রভু বিস্তর কাঁদিলেন। প্রভুর দুঃখ বর্ণনা করিতে কাহার সাধ হয়? তাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এই দুঃখ কাহিনী বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিলেন না।

ঠাকুর লোচনদাস প্রভুর পিতৃবিয়োগ কাহিনী কিছু বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। কলিহতজীবের হৃদয় বড় কঠিন। তাহাদের কঠিন হৃদয় দ্রব করাইয়া শ্রীগৌর-ভগবানের অপূর্ব্ব লীলারস-সমুদ্র মধ্যে তাহাদের মন ডুবাইবার জন্যই ঠাকুর লোচন দাসের এই চেষ্টা। লীলা লেখকগণ (ক) সর্ব্বদা লীলা সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের সকল লীলারই সমভাবে স্ফূর্ত্তি হয়। প্রভুর দুঃখময় লীলাস্বাদনে তাহাদের মনে দুঃখের উদয় হইলেও লীলার উদ্দেশ্যে সে দুঃখও সুখ বলিয়া বোধ হয়। প্রেমাশ্রু পতন

* আইর—শ্রীগৌরাঙ্গ জননী শচীদেবীর।

(ক) অধুনা অধিকাংশ লেখকই আপন আপন কল্পনাবলে লীলাবিবৃত করিতেছেন ইহাদিগকেও অবশ্য লীলালেখক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে সাধনের ফলে লীলা স্ফূর্ত্তি হওয়া সম্ভব পর তাহা লোকোত্তর জ্ঞান সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রেম-লক্ষণা মহাসমাধির ফলে ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্য লাভ করা অতীব দুর্ঘট। বর্ত্তমান সময়ে লীলা লেখায় অনেক কল্পনার সমাবেশ দেখিয়া, পাঠকগণের সততই অত্যন্ত ক্লেশের কারণ হয়। লেখকগণের উহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। (ভক্তিঃ সঃ)

সুখের ন্যায় লীলা রসাস্বাদনে সমানন্দভব হয়। তাহা না হইলে এ সকল লীলা মহাজনগণ কখনও লিখিতে পারিতেন না। প্রভুর লীলা কাহিনী সুখ দুঃখ পূর্ণ। সুধুই সুখময় লীলা পাঠ বা শ্রবণ করিব দুঃখ কাহিনী শুনিবনা বা লিখিব না এ কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। করুণরস পূর্ণ লীলারস কাহিনী যত ভক্তি উদ্দীপক ও ভাবোদ্দীপক, অন্যকথা তত নহে। প্রভুর সন্ন্যাস কাহিনীতে জীবের হৃদয় যত দ্রব হয়, তত আর কিছুতেই হয় না।

নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রভুর উপনয়ন সংস্কার হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট হন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন নিতান্ত বাল স্বভাব, সংসারে কিছুই বুঝেন না।

শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র জ্বর রোগে দেহত্যাগ করেন। পতি দেবতার বিষম জ্বর দেখিয়া শচীমাতা বড় ভীতা হইলেন। তিনি কান্দিতে লাগিলেন। জননীর ক্রন্দন দেখিয়া নিমাই চাঁদ কান্দিলেন না। কারণ এ সময় তিনি কান্দিলে জননীর শোক ও দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে; তিনি জননীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বালক নিমাইচাঁদ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় জননীকে সর্ব্বপ্রাণী কালতত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি পিতার নিকটে বসিয়া জননীকে কহিলেন :—

মরণ সভার মাতা আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্ব্বত হিমালয়॥
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি কালে সর্ব্ব নাশে।
মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে॥ (চৈতন্য মঙ্গল।)

বালক নিমাইচাঁদের কথা শুনিয়া শচীমাতা বিস্মিত হইলেন। নিমাই চাঁদের মুখে তত্ত্ব কথা তিনি অনেক বার শুনিয়াছেন। কিন্তু এই বিপদ সময়ে বালকের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া শচী মাতা অবাক্ হইলেন।

দিন দিন মিশ্র পুরন্দরের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কবিরাজ বৈদ্যগণ বলিলেন তাঁহার জীবন সংশয়। শচীমাতা এ কথা শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার মস্তক ঘুর্ণিত হইল। তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। প্রভু নিকটে বসিয়া মাতৃসেবা করিয়া জননীর মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। শচীমাতা স্বামীর অবস্থা দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু দৃঢ়ভাবে শোকাবেগ সংযম

করিয়া জননীকে তৎকালোচিত উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন।
সভেমিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ॥
বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।
স্মরণ করায় প্রভু দেব যাদুমনি॥

শচীমাতা বালক নিমাইচাঁদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। দুঃখে শোকে তিনি অভিভূতা হইলেও তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত হয় নাই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রতিবেশী কুটুম্বগণকে ডাকিলেন। তাঁহারা সকলেই আসিয়া মিশ্র ভবনে উপস্থিত হইলেন। মিশ্র পুরন্দরকে সকলে ঘেরিয়া বসিলেন। সকলেরই বদন শুষ্ক। (খ) মিশ্র পুরন্দরের আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া একে অন্যের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বাহিরে আসিয়া গঙ্গা তীরস্থ করিবার যুক্তি করিতে লাগিলেন।

পরিণত যত যত বৃদ্ধগণ ছিল।
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুকতি করিল॥ (চৈতন্য মঙ্গল।)

নিমাইচাঁদ সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার আর বুঝিতে বাঁকি রহিলনা। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া জননীকে বলিলেন "মা! এসময়ে শোক করিলে চলিবে না। ইষ্ট কুটুম্বের কাজের এই উপযুক্ত সময়।"

বিশ্বম্ভর বোলে আর না কর বিলম্ব।
এই ক্ষণে চাহিতে ইষ্ট কুটুম্ব॥

এই বলিয়া পুত্র ও জননীতে মিশ্র পুরন্দরকে ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন। (গ)

(খ) সকলেরই যে বদন শুষ্ক ছিল একথা বলাযায় না, কেননা বঙ্গে তখনও অশ্রু একেবারে শুষ্ক হয় নাই, মৃত্যুশয্যায় আত্মীয়ের শেষ বিদায় দিতে যাইয়া অতি বড় পাষাণ হৃদয়েরও নয়নজলে গণ্ড পরিষিক্ত হইয়া থাকে। (ভঃ সঃ)

(গ) বৃদ্ধা শচী মাতা ও তাঁহার শিশু পুত্রের পক্ষে এ গুরুতর ভার বহন অসম্ভব। অপরন্তু কুটুম্বগণই বা বহনে যোগদান করেন না কেন? (ভঃ সঃ)

ইহা বলি মায়ে পোয়ে ধরিলেন তারে।
পিতার সহিত গেলেন জাহ্নবীর তীরে॥

এত আত্মীয় স্বজন কুটুম্ববর্গ উপস্থিত থাকিতে প্রভু ও শচীমাতা কেন এই কার্য্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিলেন, ইহার একটু তাৎপর্য্য আছে। আত্মীয় স্বজনের অন্তিম কালের কার্য্য নিজ জনের স্বয়ং করা কর্ত্তব্য। ইহাতে হৃদয়ে একটা সুখানুভূতি হয়। পুত্রের কর্ত্তব্য নিমাইচাঁদ করিলেন, পত্নীর কর্ত্তব্য শচীমাতা স্বয়ং করিয়া লোক শিক্ষা দিলেন। গঙ্গার উপরে মিশ্র পুরন্দরের গৃহ ছিল। (ঘ) সেখান হইতে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা বড় পরিশ্রমের কার্য্য নহে। গঙ্গাতীরে যাইবার সময় মিশ্র পুরন্দরের সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে। তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর বদন চন্দ্রের প্রতি যেন বিদ্ধ রহিয়াছে বোধ হইল। আত্মীয় কুটুম্বগণ হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। গঙ্গাতীরে পিতাকে গঙ্গাতীরস্থ করিয়া প্রভু তাঁহার চরণতলে বসিলেন। তখন তাঁহার বিশাল কমল লোচনদ্বয়ে বারি ধারা লক্ষিত হইল। আর তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না—

পিতার চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে কণ্ঠ গদ গদ স্বর॥

প্রভুর বদনে শোকচিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি তখন ধৈর্য্য হারাইলেন। পিতৃ-শোকাভিভূত হইয়া বিকম্প হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি।
বাপ বোল ডাক্ আর নাহি দিব আমি॥
আজি হৈতে শূন্য হৈল এঘর আমার।
আর না দেখিব দুই চরণ তোমার॥
আজি দশ দিক শূন্য অন্ধকার ঘোরে।
না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ কোরে॥

মিশ্র পুরন্দর তখনও সম্পূর্ণ স্বজ্ঞান। তিনি পুত্রের ঈদৃশ বিলাপ ধ্বনি শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই আসন্ন কালেও তাঁহার চিত্তবিকারের

(ঘ) এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না। (ঙ) তিনি নিমাই চাঁদের পদ্ম হস্ত বক্ষে ধারণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন "বাপ বিশ্বম্ভর! এখন তোমাকে আর অন্তরের কথা কি বলিব? রঘুনাথের চরণে আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম বাপ! তুমি যেন আমাকে কোন কালে ভুলিও না।"

গদ্ গদ্ স্বরে বোলে শুন বিশ্বম্ভর।
কহন না যায় মোর যে হয় অন্তর॥
রঘুনাথ চরণে সঁপিলুঁ আমি তোমা।
তুমি পাছে কোন কালে পাসরিবে আমা॥ (চৈঃ মঃ)

পিতা পুত্রের নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। প্রভুর বদন চন্দ্রের উপর মিশ্র পুরন্দরের নয়ন বদ্ধ হইয়াই যেন হরিস্মরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ বায়ু নির্গত হইবে। এই সময়ে সকলে হরি হরি ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা জলে নামাইলেন। তুলসীর দাম গলদেশে দেওয়া হইল। চতুর্দ্দিকে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ পুত্ররূপী শ্রীগৌর ভগবানের সুধামধুর বদন চন্দ্র দর্শন করিতে করিতে, এবং মধুর হরিনাম করিতে করিতে শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন।

ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ।
গঙ্গা জলে নামাইলা সকল ব্রাহ্মণ॥
গলায় তুলিয়া দিলা তুলসীর দাম।
চৌদিকে ভকত সব লয় হরিনাম॥
চতুর্দ্দিকে হয় হরিনাম সংকীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন॥ (চৈঃ মঃ)

শচীমাতার আকুল ক্রন্দনেতে ধরণী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি গঙ্গাতীরে পড়িয়া অঙ্গ আছাড়িয়া শোকাবেগে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পতিদেবতার পদ ধারণ করিয়া পাষাণ ভেদী কত কণ্ঠে বিলাপ

(ঙ) "স্থির থাকিতে পারিলেন না" "চিত্তবিকারের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না" আবার "বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন" ইত্যাদি অত্যন্ত অসামঞ্জস্য পূর্ণ উক্তি। লেখক মাত্রেরই এই সকল দোষের উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। (ভঃ সঃ)

করিতে লাগিলেন। শচীমাতার হৃদয় বিদারক রোদন ধ্বনি শুনিয়া পশু পক্ষী তৃণ লতা পর্য্যন্ত শোকে অভিভূত হইল। ঠাকুর লোচন দাসের ভাষায় সে বিলাপ কাহিনী শুনুন।

পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া॥
এতদিন ধরি তোর সেবা কৈলুঁ মুঞি।
বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি আমি আছি ভুঞি॥
শয়নে ভোজনে মুঞি সেবা কৈলুঁ তোর।
আজি দশদিক শূন্য অন্ধকার মোর॥
অনাথিনী হৈলুঁ তোর ছোঁড়পুত লঞা।
নিমাই থাকিবে কোথা কত দুঃখ পাঞা॥
জগত দুর্লভ তোর তনয় নিমাই।
সকল পাসরি যাহ আমার গোসাঞি।

জননীর সকরুণ বিলাপধ্বনি শুনিয়া বালক নিমাইচাঁদের পিতৃশোক-সিন্ধু একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার দুই নয়নে দর দরিত ধারা বহিতে লাগিল নয়ন জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল।

মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
কান্দয়ে শচীর সুত অঝোর নয়ন॥
গজমতি হার যেন গাঁথিল সুতায়।
নয়নে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায়॥

আত্মীয় স্বজনের হাহাকারে, জননীর রোদনে প্রভু ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ক্রন্দনে যে জগত সংসার কান্দিতেছে বলিয়া বোধ হইল।

"প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসার।"

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আত্মীয় প্রতিবেশিনীগণ তাঁহার নয়ন মুছাইয়া দিয়া শচীমাতার নিকট লইয়া গেলেন। শচীমাতা পুত্র মুখ দেখিয়া সকল শোক সংবরণ করিলেন।

"গোরা চান্দের মুখ দেখি সব পাসরিল।"

প্রভু তখন আত্মশোক সংবরণ করিয়া জননীকে প্রবোধ দিতে বসিলেন। জননীকে শান্ত করিয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। চঞ্চল নিমাই-চাঁদ এক্ষণে পরম শান্ত সুধীর বালক। কোন চপলতাই নাই।

আপনে সুধীর প্রভু মর্ম্ম সমাধিয়া।
কাল যথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া॥

তাহার পর গঙ্গাতীর হইতে জননীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। শূন্য গৃহ দেখিয়া শচীমাতা শোক সিন্ধু পুনরায় উথলিয়া উঠিল। নিমাই চাঁদ জননীর কোলে গিয়া বসিলেন। বসনাঞ্চলে জননীর মুখ মুছাইয়া দিয়া তাহার শোক নিবারণ করিলেন। পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া শচীমাও পতিশোক সংবরণ করিলেন। প্রভু যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া কুটুম্ব ভোজন করাইলেন। যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে তৈজস পত্রাদি দান কার্য্য সমাধা করিলেন।

তবে বেদবিধি মতে যে ছিল উচিত।
করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ব সহিত॥
পিতৃভক্ত প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল॥
তোয়াধার ভোজনাদি দ্রব্য যত যত।
ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-ভকত॥

প্রভু পিতৃহীন হইলেন। শচীমাতার অকূলের ধন নিমাই চাঁদ পিতৃহীন হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্যারসে তিনি মত্ত হইলেন। শচীমাতা ভাবিলেন যদি বিদ্যারসে পুত্র তাঁহার পিতৃশোক ভুলিয়া সংসারে কর্ম্মাদি করে সেই-ই পরম মঙ্গল।

বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার।
তবে মনোসুখে পুত্র গোঙায় আমার॥

প্রভুর পিতৃবিয়োগ লীলার ফল শ্রুতি ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন :—

শ্রদ্ধাকৃত জন যদি এই কথা শুনে॥
বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গার মরণে॥

পিতৃশোক প্রভুর অনেক দিন পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল। তাঁহার প্রথম বিবাহের সময় একবার এই শোক সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল তাহা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রভুর শুভ বিবাহের অধিবাসের দিন যখন প্রতিবেশিনী কুলনারী বৃন্দ প্রভুর অঙ্গনে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন শচীমাতা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দীনভাবে দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন :—

পতিহীন মুঞিছার পুত্র পিতাহীন।
তো তবার সেবা কি করিব মুঞি দীন॥

এই কথা বলিতে বলিতে শচীমাতার দুটি নয়নে নীর ধারা প্রবাহিত হইল, মুখে আর কথা বাহির হইল না। জননীর চক্ষে জল দেখিয়া নিমাই চাঁদ মস্তক নত করিলেন। তাঁহার চক্ষেও জল আসিল। তাঁহার মনে পিতৃশোক স্মৃতির উদয় হইল। তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। পুত্রের চক্ষুতে জল দেখিয়া শচীমাতার চৈতন্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

কেনে কেনে বাছা হেন বিরস বদন।
এ হেন মঙ্গল কার্য্যে কান্দ কি কারণ॥
সকল সংসারে মাত্র তুমি মোর ধন।
তুমি বিমারস প্রাণ ছাড়িব এখন॥

এ হেন শুভদিনে শুভক্ষণে শচীমাতা পুত্রের নয়নে নীরধারা দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া এই কথা বলিলেন। নিমাই চাঁদ কিছু সুস্থির হইয়া এবং শোকাবেগ সংবরণ করিয়া জননীকে গম্ভীর ভাবে কহিলেন :—

মায়েরে কহিলা প্রভু শুন মোর কথা।
কি লাগিয়া এত দূর তোর মন ব্যথা॥
কিবা ধন নাহি মোর কিবা পাইলে দুঃখ।
দীন একাকিনী হেন কহ অতি রূখ॥
পিতা অদর্শন মোর সোঙরাইলে তুমি।
যেমন দগিছে হিয়া কি বলিব আমি॥

এই বলিয়া প্রভু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পুনরায় নবীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দে জননীকে কহিলেন :—

এক জনে দু'বার দেহ গুবাক্ চন্দন।
যথেষ্ঠ করিয়া দেহ যত লয় মন॥

সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সভার সুগন্ধি চন্দনে।
যথেষ্ট করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে॥
পৃথিবীতে কেহো যাহা নাহি করে লোকে।
ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে॥

প্রভু জননীর দীনভাব দেখিয়া এইরূপ কহিলেন। এস্থলে তিনি জননীর নিকট ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডপতির মত কথা কহিলেন।

শচীমাতা পুত্রের ভাব দর্শনে ও তাহার কথা শ্রবণে পুলকিত হইয়া মধুর বচনে নিমাই চাঁদকে শান্ত করিলেন। পুত্রের কথা মত সকল কার্য্য করিলেন। কিছুরই অনাটন হইল না। শচীমাতার পুত্রের কল্যাণে অক্ষয় ভাণ্ডার হইল। (চ)

প্রভুর লীলা কথার অন্ত নাই। প্রভুর নবদ্বীপ লীলা দুগ্ধাব্ধি সম। যাঁহার যেরূপ তৃষ্ণা, সে তৃষ্ণানুরূপ গৌরলীলা দুগ্ধাব্ধি হইতে দুগ্ধ উত্তোলন করিয়া পান করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করেন।

চৈতন্যলীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলা নিত্য নূতন। শুনিতে শুনিতে প্রাণ শীতল হয়, শ্রবণ জুড়ায়। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন :—

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুইয়া করোঁ মুঞি পানে॥

এত দৈন্য কেহ কোথায়ও দেখিয়াছ কি? কবিরাজ গোস্বামীর পাদ পদ্ম স্মরণ করিয়া আত্ম শোধনের জন্য প্রভুর লীলা অনুশীলন করিয়া যে আনন্দ পাই তাহা নিজে ভোগ করিয়া সুখ হয় না। তাই আমার হৃদয়ের ধন গৌর-ভক্তবৃন্দের চরণে নিবেদন করি। ইহাতেই আমার সুখ। জয় গৌর।

(চ) পিতৃবিয়োগ প্রবন্ধে এই বিবাহের অংশটী অপ্রাসঙ্গিক। পিতৃ ভক্ত পুত্রের পিতার কথা আজীবন আধিস্মরণীয়। (ভক্তি সম্পাদক।)

প্রাণের উচ্ছ্বাস।

[পূজ্যপাদ দাদা দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের রচিত "উপাসনাসঙ্গীত" পাঠে।]

——:•:——

কুসুম ঝরিয়া গেছে; সৌরভ তাহার—
এখনো চৌদিক্ ওই করে আমোদিত।
ছিড়ে গেছে সুধাধার বীণার সে তার;—
এখনো ঝঙ্কার তার, তথা মুখরিত।
নাই দাদা "দীনবন্ধু", দীনের আশ্রয়—
নিত্যধামে, নিত্য লীলা সাগরে মগন।
যে গীতি ধ্বনিল কণ্ঠে, এখনো অভয়—
ভয়ার্ত্ত সংসারী জনে, দেয় অণুক্ষণ।
"ভাগবতে" মহাকীর্ত্তি যাঁহার প্রকাশ —
"ভক্তি" যাঁর অন্তরের অপরূপ ধন।
"দম্পতি দর্পণ" যাঁর প্রেমের আভাস,
পবিত্র "প্রার্থনা" যাঁর, ভাবে অতুলন।
তাঁহারই বিমল চিত্ত হইতে উত্থিত—
ভগবত ভাবে ভরা মধুর এ "গীত" ॥

দীন — শ্রীরসিক লাল দে।

———

* "ভক্তি"র পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, ভক্তকবি শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে মহাশয় "উপাসনা সংগীত পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া, তাঁহার পবিত্র "প্রাণের উচ্ছ্বাস" পাঠাইয়া দিয়াছেন; আমরা অতি আনন্দ পূর্ণ চিত্তে, ভক্তের দান গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিলাম।—

"ভক্তি" সম্পাদক।

অপূর্ব্ব রামধনু।

(গীতিকা)

[ব্রজের রাখাল ভাবধারী প্রিয় শিশু গোপাল বিয়োগে,
এবং নিত্য গোপালের অমৃতময় সংযোগে
হৃদয়াকাশে অপূর্ব্ব রামধনুর
বিকাশ।]

——ঃ০ঃ——

তীব্র বিরহে, তপ্ত পরাণ বিষাদ জলদ ঘোর।
দেখিতে, দেখিতে, ছাইল সমগ্র হৃদয় গগন মোর
ঝর্ ঝর্ ঝর্, ঝরে আঁখি জল, কি সন্তাপ! কি যাতনা!
সন্ সন্ সন্, বহে প্রভঞ্জন, কিবা তার উন্মাদনা॥
গুড়্ গুড়্ গুড়্, মেঘের গর্জ্জন্, হবে কি অশনি পাত্।
সংসার সাগরে, জীবন তরণী, ডুবিবে কি অকস্মাৎ?
না, না, ডুবিল না, প্রভুর ছলনা ও কি ও পশ্চাতে হেরি।
বিচিত্র বরণে, কি চিত্র শোভন, কি সুন্দর মরি, মরি।
প্রেমের প্রোজ্জ্বল কিরণ সম্পাতে, অশ্রুর বর্ষণ' পরে।
কি এ অপরূপ্ সৌন্দর্য্য অনুপ, মাধুর্য্যে মানস হরে॥
এ যে রে প্রেমের পরম সুন্দর অপরূপ ইন্দ্র ধনু।
সপত কিরণে কিবা শোভা পায়, চিন্ময় ভাবের তনু॥
ভাবনেত্র মেলি, হেরিনুরে আজ হিয়া মাঝে পরকাশ।
গোপাল বিয়োগে, নিত্য গোপালের এ বুঝি বাহ্য আভাস॥
এই বুঝি বিষামৃত গোরা প্রেম, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ।
ধরি ধরি করি, পুনঃ ছাড়ি ছাড়ি, সুখ ও দুঃখের কি মিলন॥
বাক্য অগোচর, ভাবের গোচর, অনুভবে আস্বাদন।
গোপাল বিয়োগে, নিত্য গোপালের এ বুঝিরে জাগরণ॥

দীনহীন—রসিক লাল দে দাস।

কলিকালের মাহাত্ম্য।

(লেখক—শ্রীযুক্ত ভবানীচন্দ্র সাহা।)

—:•:—

কঠিন সে কলিকাল করহ শ্রবণ।
পৃথিবীর সব লোক পাপ-পরায়ণ।
কলি-মল-কলুষিত ধরম হইল।
সাধু-শাস্ত্র সমুদায় বিলোপ পাইল।
কল্পিত অনেক পথ দাম্ভিকেরগণ।
নিজমতি অনুসারে করিল সৃজন।
লোক মোহবসে লোভে গ্রাসে শুভকর্ম্ম।
শুন হরিভক্ত কহি কিছু কাল-ধর্ম্ম।
নাহিক আশ্রম চারি ধরম বরণ।
নাহি করে কেহ শ্রুতি-পথে বিচরণ।
নিগম বঞ্চক দ্বিজ ভূপ প্রজাগণ!
কেহ নাহি করে মান্য শ্রুতির শাসন।
তার সেই পথ যার যাহা মনোনীত।
বাচালে সকলে কহে জ্ঞানী সুপণ্ডিত।
মিথ্যারম্ভর দম্ভ রত হয় যেই জন।
তাহারে সকলে কহে সাধু মহাজন।
সে বড় চতুর যেই পরধনহারী।
যে করিতে পারে দম্ভ সে বড় আচারি।
বহু মিথ্যা কপটতা করিতে যে পারে।
কলিযুগে কহে সবে গুণবান তারে।
আচার বিহীন যেই শ্রুতি-পথ ত্যাগী।
কলিযুগ মাঝে সেই বিজ্ঞান বিরাগী।

জটাজুটে শিরে যার বিশাল নখর।
কলিযুগ মাঝে সেই তাপস প্রবর।
করিয়া অশুভ বেশ ভূষণ ধারণ।
ভক্ষাভক্ষ নাহি মানে করয়ে ভোজন।
পূজনীয় কলিযুগ মাঝে সেই হয়।
তারে সিদ্ধ যোগীবর সকলেই কয়।
সব নর কামী লোভী অভিমানী ক্রোধি।
দেব বিপ্র গুরু সাধুগণের বিরোধি।
গুণের মন্দির পতি করিয়া বর্জ্জন।
অভাগিনী করে পরপুরুষ ভজন।
ভূষন বিহিনা রহে রমণী সধবা।
বিভূষণে বিভূষিতা অভাগি বিধবা।
গুরু অন্ধ শিষ্য বধির দোঁহেতে সমান।
একের নাহিক আঁখি অপরের কাণ।
গুরু শিষ্য ধন হরে শোক নাহি করে।
দারুণ নরক মাঝে সেই গুরু পড়ে।
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নর নাহি কহে আন।
কপর্দ্দক হেতু বধে বিপ্র গুরু প্রাণ।
বিপ্রসনে বিসম্বাদ করে শূদ্রগণ।
মোদের হইতে বড় কিসে হে ব্রাহ্মণ?
পরস্ত্রী লম্পট দুষ্ট খল দুরাশয়।
বিমোহ মমতা দেহ মনে অতিশয়।
আপনি হইয়া নষ্ট নাশে অন্য নরে।
যদ্যপি বেদের পথ কেহ অনুসারে।
কল্পে কল্পে এক এক নরকে সে পড়ে।
তর্ক করি বেদ পথ যে দূষিত করে।
রমণী ভবন ভূমি সম্পদ বিনাশী।
মস্তক মুণ্ডন করি সে হয় সন্ন্যাসী।

করায় ব্রাহ্মণ দ্বারা চরণ পূজন।
নিজকরে দুই লোক করে বিনাশন।
শূদ্র করে জপ তপ যজ্ঞ ব্রত দান।
বরাসনে বসি করে পুরাণ বাখান।
কল্পিত অনেক পথ করিয়া সৃজন।
মোহবশে করে নর তাহাতে ভ্রমণ।

চন্দ্রশেখর প্রতিবাদের আলোচনা।*

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর।)

—:০:—

"ভক্তি" সম্পাদক প্রিয় ভক্তিনিধি ঠাকুর !

ময়মনসিংহ, সেরপুর টাউন হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দাস মহাশয়ের প্রেরিত পত্রখানি গত পৌষের (১৩২৩) সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। ভালই হইল—এতদুপলক্ষে আমি অধম গুটিকতক কথা বলিবার সুবিধা পাইলাম। গুটিকতক কথা এই :—

১। আপনাকে ধন্যবাদ দেই আপনার দ্বিতীয় টিপ্পনী এক প্রকার যথেষ্ঠ।

২। লেখার আভাসে আমার বিশ্বাস, প্রতিবাদক দাস মহাশয় ভজন নিষ্ঠ বৈষ্ণব। ভজনের অতি উচ্চাসন হইতে ওরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অত দূর উঠিয়াও চকোর হন নাই।

৩। "কথা নিয়া নাড়া চাড়ার অভ্যাস বা সময় আমার নাই"—ইহা সত্য হইতে পারে কিন্তু নিন্দা কম করেন নাই। "নাড়া চাড়ার অভ্যাস" বস্তুতঃ কম হইলে প্রাচীন নবীন উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত।

---

* "কি আনন্দ চন্দ্রশেখরে" প্রবন্ধের প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া প্রবন্ধ লেখক আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সাধারণের অবগতির জন্য অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম। (ভঃ সঃ)

৪। দাস মহাশয় বিধির ফুলবাগানের এমারতে বাস করেন। দীঘির জল টলমল। তাহাতে তিনি নিত্যস্নায়ী। "ভক্তিসাগর" মরুভূমির ক্ষুদ্র জীব সতত দগ্ধ, কিন্তু বালুর তলে তিনি এক অফুরন্ত উৎস পাইয়াছেন। তাই নিয়া তার এত বড়াই।

৫। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়"—একথায় যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া সুখী হউন্।

৬। "শ্রীএকাদশী দিবসে মহোৎসব কোন্ বিধি অনুসারে হইল?"—প্রতিবাদক মহাশয় সম্ভবতঃ সকলগুলি কথায় প্রণিধান করিবার সময় পান নাই। ওইটি শ্রীমান প্যারী মোহনের জন্য অনুরাগের চিত্র। প্যারীমোহন তো বুঝিলনা, উপদেশ মানিল না।—কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর মুখব্যাদান করিবার আমরা কে? যাহারা সেদিনের জন্য প্যারীমোহনকে দেখিল তাহারা বুঝিল এর উপর বিধি নাই। যাহারা না দেখিয়াছে তাহারা দূরে থাকিয়া বিধির বন্দনা গাহিতে পারেন—দশটা গালিও দিতে পারেন। কিন্তু আমার গোরা তা বুঝিল কৈ? মহোৎসবের বিধি আছে, কিন্তু মহামহোৎসবের বিধি দেখিনা। কতিপয় বৎসর মধ্যে আমার গৌরনিত্যানন্দের যেসব সাক্ষাৎ মহিমা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে ও সব দিনকাণা বিধির কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

৭। নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না এমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব না থাকিলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব হওয়া মুখের কথা নয়। কারণ সকলের দুঃখের গৌরনিতাই নাম প্রতিবাদক মহাশয়েরও ভাল লাগে নাই। যথা সিদ্ধচরণ দাস বাবার মুখের "গৌরনিতাই" শুনিয়া তিনি কাণে হাত দিয়াছেন। বস্তুতঃ সহস্র সহস্র লোক গৌরনামে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, কেবল দুই চারিটি বেশ ভূষার অথচ নিরক্ষর বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তির প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। যাহার স্বার্থ আছে, ব্যবসা আছে, হিংসা, মহোৎসবে চুরি করিয়া ঝুলনা ভরে, যাহার আছে সব, নাই কাছা—সে হেন বৈষ্ণবের পক্ষ-সমর্থন করিয়া চরণ দাস বাবার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন মর্য্যাদার ব্যাঘাত।

৮। "ভক্তরূপী ভগবান্" এ মন্ত্র যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি চরণদাসের চরণ ছাড়িবেন কেন?

৯। অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তনের যে প্রণালী তদনুযায়ীই উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিবাস কুঞ্জ ভাঙ্গাদিও হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস দাস মহাশয় নিজে মূল প্রবন্ধটী পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই।

১০। অরুণাচলের কীর্ত্তন কীদৃশ জানিনা। কারণ শ্রীহট্টকাছাড়ের কোনও উৎসবে আদৌ যাই নাই। ত্রিপুরা ও ঢাকা জিলার বহুস্থানে "প্রাণগৌর নিত্যানন্দ" নাম কীর্ত্তিত হইতে শুনিয়াছি। বোধ হয় দাস মহাশয় উহাকেই জারি গান বলিয়া কদর্থ করিয়াছেন। দোষ কি?—ঐ নাম কীর্ত্তনীয়াগণের প্রাণের আকুলতা এরূপ দেখি যে বাস্তবিক গৌরনিত্যানন্দ তাহাদের প্রাণই বটে। এমন মহাভাগ্যের নিন্দা কেন? তাঁহারা প্রাণগৌর বলিবার যথার্থ অধিকারী। গৌর যত দিন প্রাণ না হন, ততদিন এ তর্ক উঠিবে বালি। আমরা দেখি এঁদের গুণেই দশবিশজনে গৌর চিনেছে, ধরেছে। ইহা গৌরেরই ইচ্ছা। দাস মহাশয় ভজনানন্দ, নিরিবিলি কাল কাটান ইহাও গৌরের ইচ্ছা। দুঃখের বিষয় তিনি "প্রাণগৌরনিত্যানন্দ" নাম গান অসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি উচৈঃস্বরে নাম গাহিবার মহিমা যাহা শ্রীহরিদাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি তাহারও বিদ্রুপ করিয়াছেন; তাঁহার ভাব কেহ নাম গাহিও না—গৌর লীলাকাণ্ড উঠিয়া যাউক্। কেমনে নাম গাহিবে? যেমনে গাও তেমনে দোষ লাগা। কিন্তু জানি যাহাকে প্রাণগৌর জারিয়াছে সেই জারি গায়।

১১। নামে বিচার দেখিনা, নাই সুখের বিষয়; কিন্তু মালা গাঁথা নামে বড় কলহ। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গীত নাম ভাল চরণদাস ববাজি মহাশয়ের গীত নাম ভাল নয়, এ বিচারের তাৎপর্য্য বুঝিনা। যদি ভাবুকের ভাব প্রবাহেই নাম গুলি বাহির হয়, তাহার বিচার কি, তাহাই উত্তম। যদি ভাবই উহার ভিত্তি না হয়, তবে দর্শন যুক্তিই ভিত্তি। তবে দর্শন যুক্তির উপর আঁকিয়া দেখা যাউক্ :—ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপা দর্শন।

১২। "নিতাইগৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম।"—"হরা" স্থলে "হরে" প্রয়োগ আছে এবং "রাম" "কৃষ্ণ" প্রভৃতি অকারান্ত শব্দে বিসর্গ নাই। এতদ্বারা উপমিত হয় যে এই নাম সকল সম্বোধন পদ। সুতরাং, ভক্তিনিধি মহাশয়, আপনি "ভজ" "জপ" যোগ দিয়া যে আপোষ মীমাংসা করিয়াছেন

তাহা সমীচীন হয় নাই। সম্বোধন পদের পুর্ব্বে "হে", "অয়ি" প্রভৃতি অব্যয়ের মাত্র প্রয়োগ হইতে পারে। "জপ হরে কৃষ্ণ" দ্বারা অর্থ এই হয় যে, হে হরে-কৃষ্ণ, তোমরা জপ (জপ কর)। দ্বিতীয়তঃ ধরুন্—"জপ" প্রয়োগ দ্বারা কেবল মনকে বা জীবকে উপদেশ দেওয়া হইল। সুতরাং তাহা কেবল একবার বলিলেই যথেষ্ট—"হে মন, তুমি হরেকৃষ্ণ নাম জপ।" কিন্তু তা নয়, এ যে অহর্নিশ মুহুর্ম্মুহু নিজেই গাহিবে। অর্থাৎ হরিকে যে ডাকা হইতেছে "হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাধে, হে শ্যাম ইত্যাদি।" এই নামগুলি কেবল হরির সম্বোধন সূচক। এই সব মূলনাম ধরিয়া কেবল হরিকে ডাকিতে হইবে।

১৩। নিতাইগৌর রাধেশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরে রাম।—

নিতাইর কৃপায় গৌর পাওয়া যায়। গৌর ও রাধাশ্যাম অভেদ পরতত্ত্ব। ইনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বলিয়া কৃষ্ণ এবং চিত্তে রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া রাম বা আত্মারাম। সুতরাং এই নামমালিকার ক্রম-পর্য্যায় অতি সুন্দর ও তত্ত্ব ব্যঞ্জক এবং সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত। তবু ছন্দবেশে যদি একান্তই দোষ দর্শন করেন, তবে প্রতিবাদক মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তিত "জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরাঙ্গ" উল্লেখ করিয়া ভাল করেন নাই। কারণ দাসমহাশয় ভাবুকের ভাবোক্তি সব সত্য—সুন্দর একথা স্বীকার করেন নাই। ঐ সব নামমালা ভাবসূত্রে রচিত স্বীকার না করিলে দার্শনিক তত্ত্ববিচারের উপর এবং লীলা সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দরূপ আসনে উপবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীঅদ্বৈত মস্তকে করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে নামাইয়াছেন। তাহা হইলে "নিত্যানন্দ" ও গৌরাঙ্গ এই দুই পদের মধ্যে "অদ্বৈত" পদ কেমনে স্থাপিত হইতে পারে? মহাজন বাক্যেও যখন এসব ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তখন ওসব রচনা ভাবমূলক মানিয়া সর্ব্বথা নির্দ্দোষ মনে করাই সঙ্গত, নচেৎ নামের সকল পিঠ সমান নয় মনে করিয়া ধর্ম্মজগতে গ্লানি উপস্থিত করা নিতান্ত অবৈধ।

১৪। "বহু কাগজে নূতন নূতন বহু প্রকারে কথাই বাহির হইতেছে।"—সেসব দাস মহাশয় এতকাল সহ্য করিয়া আসিয়াছেন "কিন্তু" (ভক্তিনিধি মহাশয়, আপনার মত ভাল লোকের) "আপনার কাগজেও এইরূপ স্বেচ্ছাচারী প্রবন্ধ দেখিয়া" দাস মহাশয়ের কিছুতেই সহ্য হইল না। ভক্তিনিধি ভ্রাতৃপ্রবর প্রতিবাদক মহাশয় তোমাকে কতই ফুলাইয়াছেন। দেবতাও স্তুতির বশ, তুমি

তাই একটা প্রতিবাদ ঘোর আপত্তিসত্ত্বেও বাহির না করিয়া থাকিতে পারিলে না। ভাবিয়া দেখিও দাস মহাশয় তাঁহার নিজকে কতবড় এক উচ্চাসনে বসাইয়া সকলকেই অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন। *

১৫। বর্ষাকালে শেষরাত্রে নিশান্ত লীলা কুঞ্জ ভঙ্গাদি অষ্টকালীন সমগ্র লীলা গান আরম্ভ করতঃ অহোরাত্র কীর্ত্তন করিয়া———"——এখানে তাহার অর্থ ভক্তিনিধি ভায়া কি বুঝিয়াছেন জানিনা। "আরম্ভ" কথা দ্বারা বুঝা গেল সমগ্রলীলা এক মুহূর্ত্তে গাহিয়া অহোরাত্র কীর্ত্তন আরম্ভের ভিতর একটা বা সবই থাকিল। পরে কি উল্লেখ নাই।

১৬। "বাবু সন্ন্যাসী" প্রভৃতি কথা লিখিতে ভক্তিনিধির যেন একটু রস উথলিয়াছে কিন্তু আমার বিশ্বাস ভক্তিনিধি ভায়ার স্তাবক দাস মহাশয় এ পর্য্যন্ত কোনও সমাজে বাহির হন নাই। তবে "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" আমরা এমনি অধম যে অটল দাস, বিটলদাস নিটোলদাস প্রভৃতি নাম স্মৃতির সঙ্গেই আমাদের মনে নেড়ী, দাড়ী ও উদরী (মোটা পেট) দাঁড়ায়। ইতি

"সাধুনিন্দা মহাপাপ।"

——:০:——

শাস্ত্র বলিয়াছেন;—"সৎসঙ্গ সন্নিধানোঽপিক্ষণার্দ্ধমপি শষ্যতে।" আবার সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়;—"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" সবই ঠিক, কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবিয়া দেখি যে, প্রকৃত সাধুসঙ্গ কি, আর প্রকৃত সাধুই বা কে? সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা সকল শাস্ত্রেই কীর্ত্তিত

---

*শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ও শ্রীভক্তি দেবীর অপরিসীম দয়াবলে আজ ১৬ বৎসর ধরিয়া কত ভাবের কতলোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হইল। প্রতিবাদক মহাশয় যেভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন সম্পূর্ণ সে ভাব না বুঝিলেও উহার ভিতরে যে কিছু গোলমাল আছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। তথাপি, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম নাম লইয়া চতুর্দ্দিকে যখন আলোচনা হইতেছে তখন আরও কিছু হউক এই ইচ্ছাতেই প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দেখি কি হয়।

হইয়াছে। যদি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বলে কাহারও ভাগ্যে ক্ষণকালের জন্যও প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় তবে তিনিই বুঝিতে পারেন যে, সাধুসঙ্গের কি অসীম ক্ষমতা, কি অমোঘ ফল। শাস্ত্র বলেন ;—"সাধু সঙ্গস্ত দুর্লভোহগম্যোহমোঘশ্চ।" অর্থাৎ, সাধু ব্যক্তির দর্শন, মহতের কৃপা যথার্থই সুদুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ।

"নশক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঃক চাতকঃ।
জ্ঞাত্বাতুতং বারিধর স্তোষয়েত্যেব চাতকম্‌॥"

অর্থাৎ, চাতক বারি প্রার্থনা না করিলেও মেঘ যেমন আপন উদার স্বভাবের গুণে চাতককে বারি বর্ষণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, মহৎ ব্যক্তি ও তদ্রূপ অব্যক্ত মনোগত ভাব বুঝিয়া প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আশ্রিত জনের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

ক্ষণকাল সাধু সঙ্গ দ্বারা যে কি প্রকার অমানুষিকভাবে কত মহৎ কার্য্য সাধিত হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

রত্নাকর দস্যুছিল, একমাত্র সাধু সঙ্গের গুণে বাল্মীকি নাম ধারণ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বেশী দিনের কথা নয় ৪৩২ বৎসর হইল পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়ায় যে প্রেমলীলা করিয়াছিলেন, তাঁহার পারিষদগণের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা সংশাধিত হইয়াছে যাহা পাঠ করিতে করিতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইতে হয়, আমরা উপসংহারে এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে সাধুগণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

সর্ব্বশাস্ত্রসার পঞ্চম বেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, সাধু দর্শনতো দূরের কথা তাঁহাদিগের গুণাবলি আলোচনা দ্বারাও শত শত জন্মেরপাপ দূরিভূত হয়। যখন সাধুদিগের গুণ-কীর্ত্তনে এত ফল না জানি দর্শনে কত ফল। কিন্তু দর্শনোপযোগী চক্ষু চাই।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবীক ও আধিভৌতীক এই ত্রিতাপ তাপে তাপিত মানবের একমাত্র শান্তি স্থল "ভগবৎ প্রাপ্তি" সেই ভগবৎ প্রাপ্তির এক মাত্র

উপায় "ভক্তি" আর এই ভক্তি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় "সাধুসঙ্গ।" সাধু ভক্তের সেবায় শ্রীভগবানের সেবা করা হয়। শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন ;

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ নমেভক্তাশ্চ যেজনাঃ।
মদ্‌ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তেমেভক্তোত্তমামতা॥"

অর্থাৎ, হে পার্থ! যে আমাকে ভক্তি করে সে আমার তত প্রিয় নয়, কিন্তু যে আমার ভক্তকে ভক্তি করে সে আমার ততোধিক প্রিয়। আরও বলিয়াছেন ;

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়স্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥"

অর্থাৎ, সাধুগণ আমার হৃদয় আমিও সাধুগণের হৃদয় ; ভক্তগণও যেমন আমাকে ভিন্ন অন্য কিছু চায় না আমিও সেইরূপ ভক্তগণ ভিন্ন অন্য কিছুই চাই না। "অহং ভক্ত পরাধীন" আমি সম্পূর্ণ ভক্তের অধীন, ভক্ত আমাকে যখন যে ভাবে যেখানে রাখিবে আমি ভক্তের নিকট সেইভাবে সেইখানেই থাকিতে বাধ্য, ভক্তের নিকট আমার কোনই স্বাধীনতা খাটে না।—

"ভক্তের হাতে প্রেমের ডোরি।
যেদিক ফিরায় সেদিক ফিরি॥"

ভক্ত ভগবানে যে কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ, কি অপূর্ব্ব প্রেমের বন্ধন, কি মধুরতর ভাব তাহা ভাবিবার, বুঝিবার এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার।

সাধু ভক্তগণ যখন ভগবানের এত প্রিয়পাত্র তখন সেই ভক্তের নিন্দাবাদ করা যে কতদূর গর্হিত, কতদূর পাপজনক তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল অপরাধের কথা উল্লেখ দেখিতে পাই তন্মধ্যে সাধুনিন্দাকেই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অপরাধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সাধুনিন্দা বলিতে যে কেবল নিজের দ্বারা কোন প্রকারে নিন্দা করা বুঝাইবে তাহা নহে। শাস্ত্র বলেন :—"নকেবলং যো মহতোবভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি সোহপি পাপ ভাক্।" (কুমার সম্ভব।) নিন্দা করাতো অপরাধই অধিকন্তু অপরের দ্বারা মহতের নিন্দাবাদ শ্রবণ করাও অপরাধ।

যে ব্যক্তি ভগবৎ নিন্দা অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুণ্যহীন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

৩৬

যাহাতে কোনও প্রকারে উক্ত নিন্দা কর্ণগোচর না হয় সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিবে।

শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা সাধু নিন্দার বিষময় ফল বিশেষভাবে দেখাইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত পরম ভক্ত হরিদাসের নিন্দা করিয়া হরিনদী গ্রাম নিবাসী কোন দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহাই পাঠকবর্গের অবগতীর জন্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ;—

"হরিনদী গ্রামে এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন ॥
সে বিপ্রাধমে কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥
হরিদাস ঠাকুরের করিলেক যেন।
কৃষ্ণ তাঁহার শাস্তি করিলেক তেন॥"

ভক্ত কুল চুড়ামণি হরিদাস চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের ঘরে থাকিবার সময় একদিন হিরণ্য গোবর্দ্ধণ মজুমদারের সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার নাম মাহাত্ম্য লইয়া তর্ক বিতর্ক হয়। হরিদাস বলিলেন নামাভাসে মুক্তি হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন তাহা কখনই হয় না। এইরূপ বহু তর্ক বিতর্কের পর ব্রাহ্মণ বলিলেন ;—

"বিপ্রকহে নামাভাষে যদি মুক্তি হয়।
তবে আমার নাক কাটা করহ নিশ্চয় ॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাট এই সুনিশ্চয়॥"

সভাসদ্‌গণ উভয়ের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন, মজুমদার মহাশয় বিপ্রকে বহু তিরস্কার করিয়া বলিলেন তুমি হরিদাসকে অপমান করিলে তোমার নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ হইবে।

এদিকে হরিদাস ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিয়া চলিলে মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হরিদাস, মজুমদার

মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই যে ব্যাপার সংঘটিত হইল ইহাতে তোমাদের বা ঐ তার্কিক ব্রাহ্মণের কোনও দোষ নাই দোষ কেবল ঐ ব্রাহ্মণের তর্কনিষ্ঠা মনের। নামের মহিমা যে তর্কের গোচরি ভূত নয়। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" এই মহাজন বাক্য যে অভ্রান্ত সত্য তাহা ঐ ব্রাহ্মণ কোথা হইতে জানিবে।

হরিদাস এইরূপে উঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া তথা হইতে প্রাস্থান করিলেন মজুমদার মহাশয় সাধু নিন্দা, নাম মহাত্ম্যে অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিলেন। ক্রমে—

"তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হইল।
অতিউচ্চ নাশাস্তার গলিয়া পড়িল॥
দেখিয়া সকল লোক হইল চমৎকার।
হরি দাসে প্রশংসি সবে করে নমস্কার॥"

এখানে যদিও হরিদাস ব্রাহ্মণকে কোনও প্রকার অভিসম্পাত করেন নাই তথাপি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া হাতে হাতে প্রতিফল দেখাইয়া দিলেন। সুতরাং সকলেরই যাহাতে কোনও প্রকারে ভগবদ্ভক্তের নিন্দাবাদ না করা হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

ভক্তকে নিন্দা করিলে কেহই যে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না তাহা দেখাইয়া বৃহৎ পাষণ্ড দলন গ্রন্থে বলিয়াছেন ;—

"বৈষ্ণব হেলন পাপ তরিতে নারিল।
মহামুনি দুর্ব্বাসারে চক্রেতে দহিল॥
ক্ষুদ্রজীব হ'য়ে করে বৈষ্ণব হেলন।
কার শক্তি আছে তারে রক্ষে কোনজন॥"

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥"

অর্থাৎ, যে মূঢ় মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে সে পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। কেবল বাক্য দ্বারা নিন্দা করিলেই যে অপরাধ হয় অন্য কিছুতে হয় না তাহা নহে। শাস্ত্র বলেন ;—

"আয়ুশ্রেয়ান্ যশোধর্ম্মং লোকানাশিষমেব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রম॥"

অর্থাৎ, মহৎ ব্যক্তির মর্য্যাদার হানিকর কোন কর্ম্ম করিলে আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্মও ইহ পরকালের গতি নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরত বলিয়াছেন ;—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
নচেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসানৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ
র্বিনা মহৎ পাদরজোভিষেকম্।

অর্থাৎ, গার্হস্থ বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম দ্বারা কিম্বা সূর্য্যাদি দেবগণের পূজার দ্বারা যাহা লাভ করা যায় না কেবল মাত্র ভক্ত পদরজ বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারিলে তাহা অনায়াসে লাভ হয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ আপন পিতাকে বলিয়াছেন ;—

"নৈষাং মতিস্তাব দুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

অর্থাৎ, হে পিত! মানবগণ যে পর্য্যন্ত অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদরজে লুণ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের মন কখনও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শের উপযোগী হয় না। এইরূপ বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় আর উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা।

অবশেষে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, কেহ যেন মহতের নিন্দা করিয়া অপরাধি না হন। আসুন, সকলে মিলিয়া আমরা শ্রীভগবানের নিকট শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করি।—ভাগবতের সহিত সুর মিলাইয়া বলি ;—

"যাবত্তে মায়য়া পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভি।
তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নোভবেভবে॥
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং না পুনর্ভবম্।
ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

অর্থাৎ হে ভগবন! যে পর্য্যন্ত তোমার অঘটন ঘটন শালিনী এই মায়াময় সংসারে থাকিয়া প্রাক্তন কর্ম্মফলে এই জগতে ভ্রমণ করিব ততদিন যেন তোমার প্রিয়ভক্তগণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত না হই, ইহাই প্রার্থনা।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—দুঃখী।